ইভান ইয়েফ্রেমভ • গল্প-সংকলন

И. ЕФРЕМОВ

РАССКАЗЫ

Издательство литературы
на иностранных языках
Москва
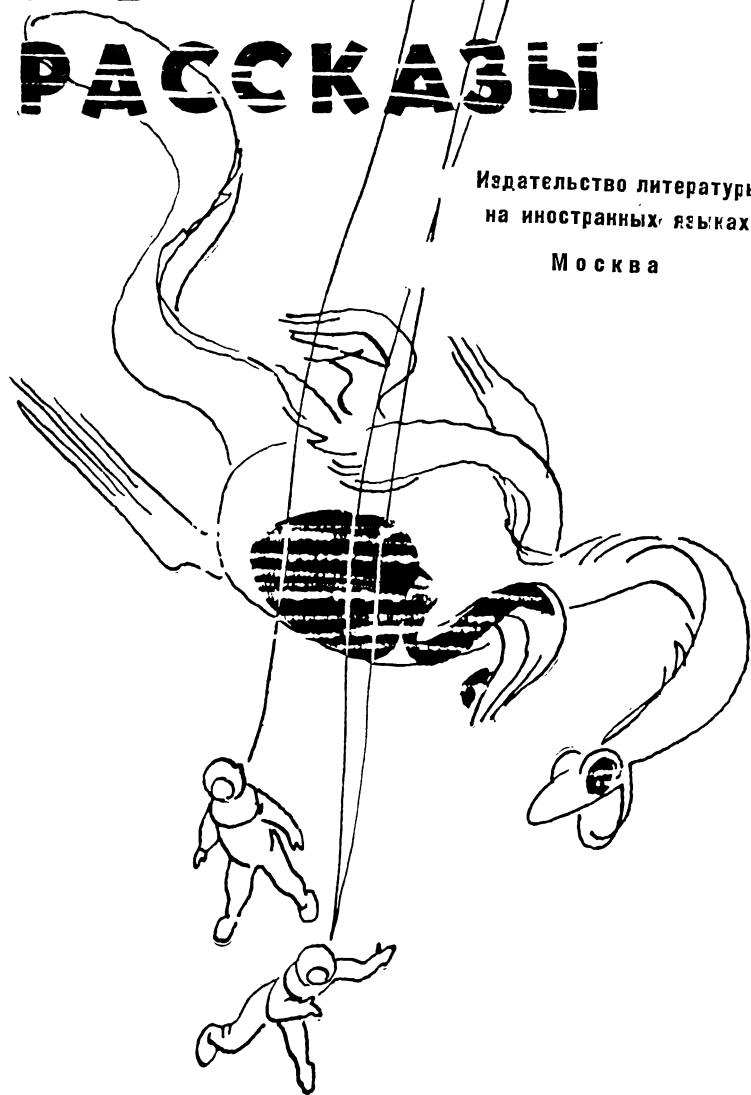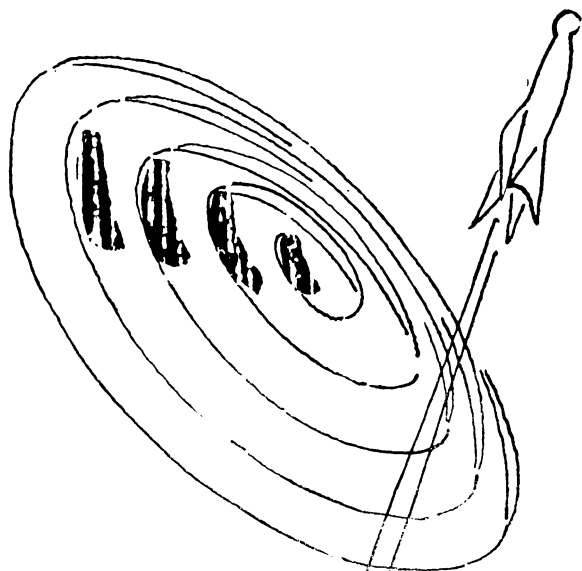
ইভান ইয়েফ্রেমভ

গল্প-সংকলন

বিদেশী ভাষায় সাহিত্য
প্রকাশালয়
মস্কো

অনুবাদ: শুভময় ঘোষ

প্রচ্ছদপট ও মুদ্রণ পরিকল্পনা: নিকলাই গ্রিশিন

সূচী

লেখকের ভূমিকা ৭
অতীতের ছায়া ১৩
নূর-ই-দেশ্‌ৎ মানমন্দির ৬৫
টাসকারোরার অতল তল ৯৫
চাঁদের পাহাড় ১২৬
দেনি-দের ১৫৫
ওলগই-খরখই ১৭৫
সাদা শিং ১৯৪
তারার জাহাজ ২২০

লেখকের ভূমিকা

ছেলেবেলায় ভ্রমণ আর এড্‌ভেঞ্চারের বই আমার খুবই প্রিয় ছিল। তখন খালি খুঁজে বেড়াতাম বিজ্ঞানের রহস্য। সেই সঙ্গে দূর দেশের প্রতিও ছিল প্রবল টান।

জীবনে দুঃখকষ্টের যে কঠোরতা ভোগ করেছি, তা না থাকলে হয়ত আজও আমি বইয়ের পোকা হয়েই থাকতাম। ঘরে বসে স্বপ্ন দেখতাম খালি এড্‌ভেঞ্চারের। শৈশব যখন পার হল, উক্রেনে তখন চলছে গৃহযুদ্ধ। বাবার কাছ থেকে পেয়েছি অত্যন্ত সুস্থ সবল শক্তিশালী শরীর। তাই দেশের এই বিপদের সময় আর বাড়িতে বসে থাকতে পারিনি।

ষষ্ঠ আর্মির এক মেকানাইজড্‌ কম্পানিতে যোগ দিয়ে গৃহযুদ্ধের একটা অংশ কাটাই আজভ আর কৃষ্ণ সাগরের তীরে। শেষকালে বৃটিশ কামানজাহাজের গোলার ঘায়ে হল সাংঘাতিক ব্রেন কংকাশন। অল্প কিছু দিনের জন্য বোবা হয়ে রইলাম, তখন আবার ফিরে এলাম বইয়ের রাজ্যে।

গৃহযুদ্ধ শেষ হবার কিছু পরেই চলে যাই লেনিনগ্রাদে। এক নৌচালন বিদ্যালয়ে পত্রযোগে পড়াশুনো সুরু করি। সেই সঙ্গে কাজ নিই লরী ড্রাইভারের সহকারীর।

সেই সময়েই, ১৯২২ সালের "প্রিরদা"র ("প্রকৃতি") একটি সংখ্যায় আমাদের বিশিষ্ট জীবাশ্মবিদ আকাদেমিশিয়ন প. প. সুশ্‌কিনের একটি প্রবন্ধ চোখে পড়ে। কৎলাস সহরের কাছে, উত্তর দ্‌ভিনা নদীতীরের পের্মীয় স্তরসমষ্টিতে পাথরে পরিণত জীবজন্তুদের যে সঞ্চয় খুঁড়ে বের করা হয়, তার বর্ণনা তাতে ছিল।

কুড়ি লক্ষ শতাব্দী আগে যে বিরাট নদী সেখান দিয়ে বয়ে গিয়েছিল তার বর্ণনায় সুশ্‌কিন গভীর বৈজ্ঞানিক অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দেন, নদীতীরের অদ্ভুত জীবজন্তুদের জগৎকে নতুন করে বাঁচিয়ে তোলেন, পাঠকদের চোখের সামনে মেলে দেন পৃথিবীর অতীত ইতিহাস, সেইসঙ্গে তুলে ধরেন নানা রোমাঞ্চকর সমস্যা আর বৈজ্ঞানিক ধাঁধা।

এবিষয়ে আমার নবজাগ্রত কৌতূহলের কথা চিঠিতে জানাতে সুশ্‌কিন আমার মত জীবনের পথ খুঁজে ফেরা আনাড়ি ছোকরার প্রতিও বিশেষ উৎসাহ দেখান। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেন, বই পড়তে দেন, তাঁর মিউজিয়মেও যত্রতত্র ঘুরে বেড়াবার সুযোগ মেলে। সেইখানেই, সুশ্‌কিনের পরিচালনায়, আমি পৃথিবী আর প্রাণের ইতিহাস নিয়ে কাজ করতে থাকি।

নৌচালন বিদ্যালয় থেকে পাশ করে বেরলে পর আমায় শিক্ষানবীশ নাবিক হিসেবে প্রথমে পাঠিয়ে দেওয়া হয় দূরপ্রাচ্যে, তারপর কাস্পিয়ান সাগরে। কিন্তু জ্ঞানতৃষ্ণা আবার আমায় ফিরিয়ে আনে লেনিনগ্রাদে। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই। শীতের পাঠোপবেশনের পর গ্রীষ্মকালে যেই আসত নৌচালনার সময় অমনি আমি পাঠ্যপুস্তক তুলে রেখে ভেসে পড়তাম জলের বুকে। সে সময়ে এটা খুবই সাধারণ ব্যাপার ছিল: নাবিকরা, রেলকর্মীরা, বাড়ি তৈরীর কাজ যারা করত তারা সবাই কাজের সঙ্গে সঙ্গে পড়াশুনো করে চলত। সারা দেশ তখন শিক্ষিত হয়ে উঠছে।

বহুদিন ধরে কোন কাজ গ্রহণ করব — সমুদ্র না বিজ্ঞান, তাই নিয়ে অনেক ইতস্তত করতে হল। তখন আমি কাস্পিয়ানে বহাল হয়েছি। একদিন মোটর বোটে চড়ে বাকুতে ফিরছি। দিনটা অস্বাভাবিক রকম শান্ত আর গরম। সমুদ্রটা পড়ে আছে অস্বচ্ছ ধূসর-সবুজ কাচের মতো। আকাশে প্রচণ্ড সূর্য। নৌকোর সামনে উপুড় হয়ে শুয়ে জলের দিকে চেয়ে আছি: সূর্যের আলো জল ভেদ করে অনেক নিচে নেমেছে, একেক জায়গায় প্রায় ত্রিশ ফুট নিচে।

হঠাৎ মনে হল চেয়ে আছি এক নিমজ্জিত সহরের ধ্বংসাবশেষের দিকে, তার প্রাচীর আর স্তম্ভগুলো মোটর বোটের তলে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যাচ্ছে। সহরের বাড়িঘরদোর রাস্তার আবছা চেহারাটা যখন ধরতে সুরু করেছি এমন সময় হঠাৎ হাওয়ায় জলের বুক দুলে উঠল, ছবিটাও গেল মিলিয়ে।

কিন্তু মনে রয়ে গেল তার গভীর ছাপ, বিজ্ঞানের প্রতি এক দুর্বার আকর্ষণ অনুভব করলাম। ভীষণ ইচ্ছে হল, পৃথিবীর ইতিহাস জানার, তার বদল আর বিকাশের খবর নেওয়ার।

বাকুতে এসে সুশ্‌কিনের একটা টেলিগ্রাম পেলাম। তাতে তিনি বিজ্ঞান আকাদমীতে আমায় একটা কাজ নিতে বলছেন। কাজটা যদিও খুবই সামান্য, বৈজ্ঞানিক ল্যাবরেটরী কর্মীর টেকনিকাল সহকারীর পদ, সঙ্গে সঙ্গে মনস্থির করে ফেললাম। বাঁধা হয়ে গেল বিজ্ঞানের সঙ্গে আমার জীবনের গাঁটছড়া।

সারা শীতকাল ল্যাবরেটরীতে কাজ করি, গ্রীষ্মে সোভিয়েত দেশের সর্বত্র ঘুরে বেড়াই জীবজন্তুর জীবাশ্মের খোঁজে। সত্যিকার জীবাশ্ম অনুসন্ধানী হয়ে উঠে সে কাজে বেশ সাফল্য অর্জন করলাম। উত্তরের বন আর জলায়, উরাল অঞ্চলের অন্ধকার, নিস্তব্ধ প্রাচীন খনিতে, মধ্য এশিয়ার গরম স্তেপ আর পাহাড়ে কতগুলো অত্যন্ত কৌতূহলজনক জিনিস খুঁজে বের করলাম।

যৌবন যখন পার হল, তখন পিছনে ফেলে এসেছি অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় এক জীবন। সোভিয়েত জনগণ তখন উন্নত যন্ত্রশিল্প গড়ে তোলার জন্য প্রচণ্ড সংগ্রাম করে চলেছে। তার ফলে দেশের প্রতি আমার কর্তব্যবোধ হয়ে উঠেছে আরো তীব্র। শিল্পায়নের এই কাজে ভূবিদ্যার ভূমিকাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ঠিক করলাম ভূবিদ্যা নিয়ে পড়াশুনো করব। লেনিনগ্রাদের উচ্চ খনি বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে প্রধানত সাইবেরিয়া, ইয়াকুতিয়া আর দূর প্রাচ্যে ভূবৈজ্ঞানিক অভিযানে বেরিয়ে পড়লাম।

কাজটা খুবই কঠিন, কিন্তু জীবনের পাঠ গ্রহণের পক্ষে খুবই ভাল। গোড়ায় ঠিক করেছিলাম, কাজ করব এয়ারোজিনি আর উভচরদের যুগের দেশগঠন, আর তার প্রাণীদের নিয়ে। কিন্তু আল্‌দান নদীতীরের ক্যাম্‌ব্রিয়াজ সঞ্চয়, পূর্ব সাইবেরিয়ার নীস্‌, দূর প্রাচ্যের মেসোজোইক স্তর আর কয়লার খনি, সোনার খনির সঙ্গে সে কাজের আকাশ পাতাল তফাৎ। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভূবৈজ্ঞানিক কাজের ফলে আমার জ্ঞানের পরিধি অনেক বাড়ল। ভ্রমণের অভিজ্ঞতাও পরে অনেক কাজে আসে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার পর দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের অনুসন্ধানে সোভিয়েত ভূবিদ্যা অনেক দূর এগিয়ে গেল। দেখা দিল হাজার হাজার ভূবিজ্ঞানী। আমি আবার ফিরে এলাম আমার জীবাশ্মবিদ্যার কাজে। ভার

নিলাম একটা ল্যাবরেটরীর। সেখানে গবেষণা চলল অত্যন্ত প্রাচীন জীবজন্তু আর পুরাজীবীয় যুগে, তার মানে পৃথিবীর একেবারে শৈশবাবস্থায়, গঠিত সঞ্চয় নিয়ে। আমার গুরু সুশ্‌কিন তখন পরলোকগত। তাঁর কাজের ভার দিয়ে গেছেন আমার উপর, তাঁর ক্ষমতা আর জ্ঞান যার আয়ত্তের বাইরে।

তারপর সুরু হল এক জায়গায় বসে কাজ করার দীর্ঘ পর্ব। যাযাবর জীবন ফুরল। স্বভাবতই প্রথম প্রথম অবস্থাটা সহজে মেনে নিতে পারিনি, থেকে থেকেই ইচ্ছে হত বেরিয়ে পড়ার। তখন মনে হল হয়ত লিখলে পর এই উগ্র বাসনা তৃপ্ত হবে। লেখা মানে আরো কতগুলো বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ নয়, গল্প। যার বিষয় হবে সক্রিয় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষের কঠোর সংগ্রাম।

ভ্রমণকাহিনী জাতীয় জিনিস লেখার অনেক চেষ্টা করলাম। বহু কাগজ জড় হল বাজে কাগজের ঝুড়িতে, কিন্তু তৃপ্তি পেলাম না: যে সব শব্দ ব্যবহার করেছি তাদের মনে হল অপর্যাপ্ত, প্রকৃতির বর্ণনাগুলো ঠেকল জোলো। হতাশ হয়ে লেখার চেষ্টা একেবারেই ছেড়ে দিলাম। অবশ্য আমার বৈজ্ঞানিক কাজও লেখার কাজে বাধার সৃষ্টি করেছিল। গল্পের নায়ক আর তাদের কাজকর্মকে দূর থেকে, শিল্পীর দৃষ্টিতে দেখা সম্ভব হচ্ছিল না। তাছাড়া ধীরেসুস্থে গভীর চিন্তা করার সময়ও ছিল না।

বহু পরে আবার লেখনী তুলে নিলাম। মহান স্বদেশী যুদ্ধের সময় গুরুতর অসুখের ফলে প্রায় অথর্ব হয়ে পড়ে আছি। দেশের ঐ দুর্যোগের কালে কিছুই করতে পারছি না, দীর্ঘকাল ধরে ভাল হয়ে ওঠার আশায় শয্যাশায়ী আমি। মনের অবস্থা তাই তখন খুবই খারাপ। অবশেষে মনে হল, সমুদ্রের রহস্য, আমাদের বিরাট দেশের প্রকৃতির রূপ, সেই সঙ্গে তার অত্যাশ্চর্য সব জাহাজী, ভ্রমণকারী, বিজ্ঞানী আর জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁদের অপূর্ব কাজের কথা যদি জনগণকে জানাই তাহলেও আমার কর্তব্য কিছুটা করা হয়।

আমার প্রথম গল্পগুচ্ছ ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত হয়ে পাঠকদের সাদর অভ্যর্থনা পায়। সেই উৎসাহে সেরে উঠে আমার বৈজ্ঞানিক কাজ সুরু করার পরেও আরো লিখে চলি। ১৯৪৫-৪৮ সালে আরো গল্প বেরয়, তার কোন কোনটা এই বইয়ের অন্তর্ভুক্ত। ১৯৪৯ সালে বেরয় আমার সবচেয়ে বড় বই

"ফেনার রাজ্য"। বইটি হচ্ছে প্রাচীন মিশর আর গ্রীসকে নিয়ে লেখা ঐতিহাসিক উপন্যাস। ১৯৫৩ সালে আরেকটি ঐতিহাসিক উপন্যাস বেরয় "বাউরজেদের ভ্রমণকথা"। ১৯৫৬ সালে "বায়ুপথ" নামে একটি ভ্রমণকাহিনী বেরয়। তাতে গোবি মরুভূমিতে জীবাশ্মবিদ্যাগত অভিযানের কথা বলা হয়েছে। ১৯৫৮ সালে বেরয় আমার সবচেয়ে বড় রচনা — মানবজাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে একটি বৈজ্ঞানিক কল্পকথা — "আন্দ্রোমেদা নীহারিকাপুঞ্জ"।

ছেলেবেলায় "দূর দেশের" যে স্বপ্ন দেখতাম, তার ছাপ বোধহয় আমার সব গল্পেই পড়েছে। এইসব দেশের বিজ্ঞানসম্মত সুপ্রতিষ্ঠিত ইতিহাস হয়ত আছে, হয়ত বা নেইও। কখনো কখনো ডুব দিতে হয়েছে ধারণাতীত কালের রহস্যে ঘেরা গভীরতায়। আমার "দূর দেশ" হচ্ছে নতুন সব পথও, কোন মানুষের পা যেখানে এখনো পড়েনি। ভবিষ্যতের স্বল্প আলোয় কেবল দেখা যাচ্ছে অল্প কয়েকটা মাইলস্টোন। আমার মতে বৈজ্ঞানিক কাহিনীর কাজ হল, যে রহস্যময় পর্দায় পথগুলো ঢাকা রয়েছে, সে পর্দা সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করা, যেসব বৈজ্ঞানিক কীর্তি এখনো বাস্তবে রূপ নেয়নি তাদের কথা বলা, এইভাবে বিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় ঘটিয়ে দেওয়া। সোভিয়েত বৈজ্ঞানিক কাহিনীর কিন্তু আরো কাজ রয়েছে। তার মূল তত্ত্ব হল জনগণের কল্পনাশক্তি আর সৃষ্টিশক্তির বিকাশ ঘটান, সমাজ জীবনকে ভাল করে জানার জন্য তা প্রয়োজনীয়। তার মূল লক্ষ্য হল নতুনের সন্ধান, সেই সন্ধানের ভিতর দিয়ে ভবিষ্যতের মর্মে পৌঁছন।

আমি ভাল করেই জানি আমার বর্ণনারীতি নিখুঁৎ নয়, আমার গল্পের নায়করাও সবাই বড় একধরনের, তাদের মনস্তত্ত্বের ধারা যথেষ্ট বিকশিত হয়নি। আশা আছে, এসব ত্রুটি আমার পরের লেখায় আর থাকবে না।

কিন্তু আমার লেখার বিষয় হবে, আগের মতোই বৈজ্ঞানিক গবেষণা, আবিষ্কার, ভ্রমণ। এদেশ আর অন্য নানা দেশের কয়েকটি ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে আমার কিছু লেখার ইচ্ছে আছে। সেই সঙ্গে আমাদের প্রাগৈতিহাসিক পূর্বপুরুষ, আর এশিয়া ও আফ্রিকায় বিদেশী উপনিবেশের লোকজনদের নিয়েও।

ইভান ইয়েফ্রেমভ

অতীতের ছায়া

র্গেই পাভ্‌লভিচ নিকিতিন পড়ার ঘরে ঢুকতে অধ্যাপক সানন্দে বলে উঠলেন, 'অবশেষে এলে! বরাবরকার মতো দেরীতে!' নিকিতিন তরুণ জীবাশ্মবিদ। সাম্প্রতিক কতগুলো আবিষ্কারের সঙ্গে তার নামও যুক্ত আছে। অধ্যাপক বলে চললেন, 'আমার কাছে আজ তুমিই যে প্রথম এলে তা নয়। পূর্ব স্তেপ অঞ্চলের দুজন বিখ্যাত রাখাল মস্কোয় কৃষি প্রদর্শনীতে

যাচ্ছিল। তারাও এসেছিল। এই দেখ তাদের উপহার, বিজ্ঞানীদের প্রতি তাদের শ্রদ্ধার চিহ্ন। এর চেয়ে বড় খরমুজ কখনো দেখেছ? শুঁকে দেখ! খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে করছে, তাই না? আমাদের রাখাল বন্ধুদের স্বাস্থ্য কামনা করি।'

'আমায় কি এই কাজের জন্য ডেকেছিলেন, ভাসিলি পেত্রভিচ!'

'আহা, অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন। বাঁদিকের টেবিলটা একবার তাকিয়ে দেখ না।'

একটা ছাইরঙা কার্ডবোর্ড-এর উপর গুছিয়ে রাখা ঘনখয়েরী রঙের মসৃণ সব বিরাট বিরাট পাথর হয়ে যাওয়া হাড়ের টুকরো। একটা হাড় তুলে নিয়ে নিকিতিন বারকয়েক নখ দিয়ে ঠুকল, তারপর হাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। আটটা মোটা ভারী হাড়ের টুকরোর প্রত্যেকটাকে সে এইভাবে পরখ করে দেখল। হাড়গুলোর ভিতরে লোহা আর সিলিকন ঠাসা।

কঙ্কাল আর তার শরীরস্থান সম্বন্ধে নিকিতিনের গভীর জ্ঞান। তাই সে হাড়গুলোর বাড়তি অংশগুলো মনে মনে বসিয়ে লুপ্ত জন্তুটার পুরো চেহারাটা আঁচ করতে পারল।

'ও, হাড়ের উপরের এই ঘন, পালিশ ত্বকটা হচ্ছে মরুভূমির ছাপ। তার মানে রাখালরা মরুভূমির উপরেই এদের পেয়েছে, মাটি খুঁড়ে নয়। ভাসিলি পেত্রভিচ, এগুলো ডাইনোসর! এরকম ভাল অবস্থায় সোভিয়েত ইউনিয়নে এই প্রথম পাওয়া গেল। রাখালদের কিছু একটা পুরস্কার দেওয়া খুবই দরকার।'

'টাকা? হাঃ, হাঃ! ওরা যে আমাদের মতো অধ্যাপকদের চেয়ে অনেক বড়লোক, তা তুমি জান না? ওরাই তো বরং জিজ্ঞেস করছিল, ওদের যৌথখামার থেকে আমাদের জন্য কিছু করতে পারে কিনা। এটা কেবল ওদের বৈজ্ঞানিক কৌতূহল। ওরা আসছে কাল আসবে তোমার কাছে। কিছু "সিলিআউ" নিয়ে আসবে, তার মানে ওদের ভাষায়, বন্ধুত্বের উপহার। নাও, এস, এবার খরমুজটা খেতে খেতে কথা বলা যাক।'

সুস্বাদু, সুগন্ধ খরমুজের একটা টুকরো হাতে নিয়ে নিকিতিন দেয়ালে টাঙান ম্যাপটার কাছে নিচু হয়ে দাঁড়াল। দেখতে লাগল ফোঁটাকাটা বাঁ কোণটা। ফোঁটাগুলো হচ্ছে মরুভূমির বিপজ্জনক বালির প্রতীক। অধ্যাপক তাঁর আরাম কেদারায় বসে মাথা নুইয়ে নিকিতিনের আঙুল লক্ষ্য করে তাকিয়ে রইলেন।

'ডাইনোসরের হাড়ের বিরাট জায়গাটা এইখানেই কোথাও হবে,' নিকিতিন বলল, 'তাল্‌দি-সাইয়ের উৎস থেকে দু'শ মাইল। এই হচ্ছে বিস্‌সেক্‌তা, সবচেয়ে কাছাকাছির কূপ। আমাদের পথটা গেছে লাইনি পাহাড়ের দিকে, তারপর এগিয়ে গেছে পাথুরে মরুভূমি আর কিছু টুকরো স্তেপ অঞ্চলের ভিতর দিয়ে।'

"আরিক"এর জলের মৃদু কলস্বর। নিকিতিন জলের ধারে পায়চারী করে বেড়াচ্ছে। বাড়ির চারপাশের গাছগুলোর ঘনসবুজ পাতার আড়ালে ছায়া আরো ঘন হয়ে উঠেছে।

সোজা সামনে সে দেখতে পেল ছায়ায় ঘেরা পথ পার হয়ে আসছে সাদা ফ্রকপরা একটি ছিপছিপে পাৎলা মেয়ে। মেয়েটি "আরিক"টা লাফিয়ে পার হয়ে পথ ধরে এগতে লাগল। তার রোদে পোড়া পাদুটো মাটিতে প্রায় অদৃশ্য। তাই মনে হচ্ছে মেয়েটি যেন হাওয়ায় ভেসে আসছে। পিঠের উপর পড়ে রয়েছে মোটা কালো বেণী। সাদা ফ্রকের উপর আরো কালো দেখাচ্ছে। বেণীর ফাঁপান প্রান্তটি নেমেছে কোমরের নিচে।

দ্রুত পায়ে চলে যাওয়া মেয়েটির দিকে তাকিয়ে নিকিতিন দাঁড়িয়ে পড়ল। একটুখানি ভেবে নিল। তারপর তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়ল অভিযানের জন্য যে বাড়িটা নেওয়া হয়েছে তার বড় কাঠের গেটের কাছে।

উঠোনের বিজলী বাতিতে নিকিতিন দেখতে পেল অভিযানের বাকি লোকেরা সবাই ভ্যানগুলোর চারপাশে জড় হয়েছে। সবাই খুব হাসছে। এমন কি গোমড়ামুখো সিনিয়র ড্রাইভারের মুখে পর্যন্ত আকর্ণবিস্তৃত হাসি।

কালোচোখ মারুসিয়া নিকিতিনের কাছে এগিয়ে এল। মারুসিয়া হচ্ছে ল্যাবরেটরীর সহকর্মী। সম্প্রতি সে পার্টি সংগঠকের পদে নির্বাচিত হয়েছে। মারুসিয়া বলল:

'সের্গেই পাভলভিচ, আপনি এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? একটা সভা ডাকব বলে ভাবছি, অথচ আপনার দেখা নেই। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর সভা আপনিই সুরু হয়ে গেল।'

‘বেশ মজাদার সভা বলে মনে হচ্ছে!’ নিকিতিন হেসে বলল।

‘লরীগুলোর নাম দেওয়া হচ্ছে,’ মারুসিয়া জানাল।

‘নাম? লরীদের?’

‘চালকদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা হবে বলে ঠিক হয়েছে। মার্তিন মার্তিনভিচ বলেছে, প্রতিটি ভ্যানের একটা করে নাম থাকা চাই।’

‘নামগুলো শুনি!’

মার্তিন মার্তিনভিচ এগিয়ে এসে বলল, ‘তোমার ভ্যানটার নাম “বজ্র”, অন্যদুটোর নাম “সংগ্রামী” আর “ডাইনোসর”।’ মার্তিন মার্তিনভিচ খননের কাজে দক্ষ। জাতে সে লাতভীয়। বয়সও হয়েছে। চোখে গোল চশমা।

রাস্তায় একটা জোরাল হর্ণ শোনা গেল। খোলা গেটের উপর এসে পড়ল একটা “জিস্” গাড়ির হেডলাইটের আলো। নিকিতিন এগিয়ে গেল আঞ্চলিক পার্টি কমিটির সম্পাদকের দিকে। তার সঙ্গে আগেও এই অভিযানের ব্যাপার নিয়ে নিকিতিনের দেখা হয়েছে।

‘তোমরা তো এখানে বেশ ভালই আছ দেখছি,’ সম্পাদক বলল, ‘কবে যাচ্ছ?’

‘পরশু।’

‘চমৎকার। কমরেড নিকিতিন, আমার একটা উপকার তোমায় করতে হবে।’ সম্পাদক একটু থেমে আবার বলল, ‘এই একটু আগেই আমি একটা সভায় গিয়েছিলাম। বিস্‌সেক্‌তার কাছে নাকি এস্‌ফল্টের সঞ্চয় আছে। আমার ভূবিজ্ঞানীরা বলছেন, জায়গাটা খুঁজে দেখা দরকার। মোট কথা, ভূবিদ্যা বিভাগের একজনকে তোমার দলের সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।’

নিকিতিনের মুখে নামল দুশ্চিন্তার ছায়া। সম্পাদক নিকিতিনের হাতে হাত গলিয়ে তাকে উঠোনের এক প্রান্তে টেনে নিয়ে গেল।

‘সব তৈরী?’

‘হ্যাঁ, সের্গেই পাভলভিচ। মাল তোলা সুরু করা যেতে পারে।’

‘মার্তিন মার্তিনভিচের কাছ থেকে কাজের হিসাব বুঝে নাও। “বজ্র” হচ্ছে নেতা। তাতে পেট্রল আর যন্ত্রপাতি থাকবে। “ডাইনোসর” — পেট্রল, বোর্ড আর তাঁবুর উপকরণ। “সংগ্রামী” — জল, খাবারদাবার আর রবার।’

খোলা নিচু দরজাটা দিয়ে ভিতরে আসছে দুপুরের গরম নিঃশ্বাস। ডেস্কের কাগজগুলো নির্কিতিন তার চামড়ার ব্যাগটায় ভরছে। খুব ব্যস্ত সে, কারণ একটা টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে।

'আসতে পারি?' বাইরে থেকে শোনা গেল একটি মেয়ের গলা।

আলোয় ভরা দরজার কাঠামোয় দেখা গেল একটা ক্ষীণ কালো ছায়া। সাদা পোষাকে আলো পড়ে তার প্রান্তগুলো ঝকমক করছে। ভিতরের আধ-আলো আধ-অন্ধকারটা সইয়ে নেবার জন্য মেয়েটি একটু নিচু হয়ে চোখ কুঁচকল। নির্কিতিনেরও চোখে পড়ল আগের দিনের বেণীটা।

একটা অস্পষ্ট আনন্দের পূর্বাভাসে দ্রুততর হয়ে উঠল নির্কিতিনের হৃৎস্পন্দন। ছোট স্যুটকেস হাতে মেয়েটির জন্য সে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের পরিচয় দিল।

'মিরিয়াম — তারপর কী?' নির্কিতিন জিজ্ঞেস করল।

'তাশ্‌মুরাদভা। তবে মিরিয়ামই যথেষ্ট,' মৃদু হাসি হেসে বলল মেয়েটি।

'মিরিয়াম, আমাদের অভিযানে অনেক সময় লাগতে পারে, আপনার পক্ষে খুব কষ্টকরও হবে। এতে আপনার ভয় নেই তো?'

কালো চোখদুটিতে দুষ্টুমি চমকে উঠল, 'মোটেই না! আপনাদের ব্যবস্থা এত ভাল যে আপনার দলের একজন বলেছে স্বাস্থ্যাবাসে এক মাস কাটানর চেয়েও বেশি ফল পাওয়া যাবে আপনাদের অভিযানে।'

'ঠিক আছে। যে গাড়ি আপনার পছন্দ তাতেই উঠে পড়ুন,' নির্কিতিন বলল।

'আমি মারুসিয়ার সঙ্গে "সংগ্রামী"তে যেতে চাই।'

'মেয়েদের একসঙ্গে হতে একটুও সময় লাগে না,' মিরিয়ামের সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এসে নির্কিতিন হেসে বলল। তারপর হঠাৎ যোগ করে দিল, 'ভাল কথা, আপনার সঙ্গে আগেও দেখা হয়েছে — কাল রাত্রে এঙ্গেল্‌স্‌ স্ট্রীটে...'

নির্কিতিন মাথা নেড়ে গেটের দিকে এগিয়ে গেল। মেয়েটি হতভম্ব হয়ে চেয়ে রইল তার দিকে।

পথহীন স্তেপের বুক দিয়ে পরপর তিনটে গাড়ি দুলতে দুলতে, ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে এগিয়ে চলেছে। চারদিকে দিগন্তবিস্তৃত স্তেপ, রোদে পোড়া, ধূসর,

কাঁটাঝোপে ভরা। ঘোলাটে, বিবর্ণ আকাশ সমতলের উপর যেভাবে নেমে এসেছে, দেখে ভয় করে। চারদিন ধরে ইঞ্জিনগুলো ছুটে চলেছে। সহর আর রেলপথ ছেড়ে চলে গেছে আড়াইশ মাইল দূরে। দীর্ঘ অর্ধচন্দ্রাকার বালিয়াড়ি, পাথুরে টিলা, সমান স্তেপ আর কাঁটাঝোপ, হলদে-সাদা নোনাজলের জলায় ভরা আড়াইশ মাইল পথ। গিয়ারের আর্তনাদ, ইঞ্জিনের একঘেয়ে গুঞ্জন, ড্রাইভারদের ক্লান্ত হাতের ঘামে নেয়ে ওঠা কালো স্টিয়ারিং হুইল।

একবার কেবল সন্ধ্যার বেশ পরে একটা লম্বা পাহাড়ের পিছনে বিজলী বাতির হাতছানি দেখা গিয়েছিল। গন্ধক কারখানার আলো। এখন কেবল ইতস্তত ছড়ান স্থানীয় যাযাবরদের গোল আর পুরু ফেল্টের তৈরী আস্তানা ইয়ুর্তা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না।

শেষ পাড়িটা হল বেশ লম্বা। কারণ নিকিতিন জোর চাঁদের আলো আর বাকি ভাল জমিটার পুরো সুযোগ নিতে চায়। ভাপা মাটির অজস্র মসৃণ, নগ্ন টুকরোগুলোকে চাঁদের আলোয় ছোট ছোট হ্রদের মতো দেখাচ্ছিল। গাড়িগুলো তার উপর দিয়ে প্রাণপণ জোরে ছুটে চলল। রাত্রিবেলা মরুভূমিটাকে একইসঙ্গে যেমন রহস্যময় তেমনি সদয় মনে হতে লাগল।

নরম মাটির ঢিবির গায়ে গাড়িগুলো ধাক্কা খেয়ে ঘন ধুলো ওড়াতে সুরু করলে নিকিতিন থামার আদেশ দিল। গাড়ির পেছন দিকে ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌ব্‌ ঝুলিয়ে দেওয়ায় ছাউনীটাতে বেশ জোর আলো হল। কিন্তু জায়গাটা ভাল না — ঘন বরফের মতো এখানেও বালিতে সবার পা অনেক গভীরে ডেবে যেতে লাগল। শুকনো ঘাসের গোড়ায় জায়গাটা একেবারে খোঁচা খোঁচা হয়ে আছে। নিকিতিন দেখতে পেল, সামনে, চাঁদের আলোয় প্রায় অদৃশ্য লাইলি পাহাড়। পাথুরে মরুভূমির বুকে দাঁড়িয়ে পাহাড়টা ঘিরে রেখেছে প্রাগৈতিহাসিক জন্তুদের সমাধিস্থল।

ধূসর স্লেটে ঢাকা পাহাড়ের দীর্ঘ সারিগুলো পার হয়ে যাবার পর মরুভূমির প্রাণশূন্য খাঁ খাঁ ভাবটা সবাই আরো বেশি করে অনুভব করতে লাগল। অজস্র বাঁক, ঘুর আর উৎরাই পার হয়ে ধুলো-মাখা গাড়ি তিনটে মিহি বালির সূক্ষ্ম আচ্ছাদনে ঢাকা প্রাণহীন, সীমাহীন সমতলে এসে পড়তে

আবার মনে হতে লাগল জগৎটা বুঝি হারিয়ে গেছে। মরুভূমির উপর গরম হাওয়া কাঁপছে; তার কম্পিত স্রোত বৃথাই চেষ্টা করছে এই রুক্ষ দৃশ্যকে কোমল করে তুলতে, পর্দার আড়ালে ঢেকে রাখতে।

অভিযাত্রীরা তখন স্বপ্নে দেখছে — সুন্দর নীল হ্রদ, মনোরম সব কুঞ্জ, দূরে তুষারাবৃত পাহাড় চূড়ার চমক। কখনো কখনো ভোঁতানাক গাড়িগুলোর সামনেই তারা দেখতে পাচ্ছে সমুদ্র সানন্দে ছোট ছোট ঢেউয়ের বাড়ি মারছে আর তার কুয়াশায় ঢাকা ভূতুড়ে ঢেউগুলো আকাশে সাদা ফেনা ছিটিয়ে দিচ্ছে... কয়েক মিনিট পরেই আবার চোখের সামনে ভেসে উঠছে বালির ওপারে, বহু দক্ষিণে ছেড়ে আসা সহরটার মতোই ঘন পাতায় ঘেরা সাদা সাদা কুঁড়েঘরের সারি। এমনকি এত বাস্তব, আর স্পর্শগ্রাহ্য যে গাড়িগুলোই একেক সময় হঠাৎ ভীষণ লম্বা হয়ে উঠছে, ফেঁপে ফুলে বিরাট আকার নিচ্ছে।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। অস্তসূর্যের রক্তলাল আলোয় সবার চোখে পড়ল আরেকটা ভূতুড়ে দুর্গের নীল আর সবুজ রঙের লম্বা মিনারেটের শেষ ছবিটুকু।

হেডলাইটের জোর আলো রাত্রির অনেক গভীরে ছড়িয়ে দিয়ে "বজ্র" চলেছে অন্য গাড়িগুলোর আগে আগে। রাত্রে পথ চলা এখনো সম্ভব। সামনের গাড়িটা ধুলোর ঝড় উড়িয়ে চলেছে। "ডাইনোসর" আর "সংগ্রামী"কে তাই অনেক পিছিয়ে পড়তে হয়েছে, ধুলোপথে যাবার যা নিয়ম।

ঘুমঘুমভাবে গুঞ্জন করে চলেছে ইঞ্জিনটা। ড্রাইভারের পাশে বসে নিকিতিন ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ "ডাইনোসরের" জোর হর্ণ শুনে তার ঘুম ভেঙে গেল।

"বজ্র" থেমে যেতে পিছনের গাড়িদুটো এগিয়ে এল।

'কী হয়েছে?' নিকিতিন জিজ্ঞেস করল।

'আর পারছি না,' মিনমিন করে বলে উঠল "ডাইনোসরের" ড্রাইভার। 'চোখের সামনে সারাক্ষণ ঐ অদ্ভুত দৃশ্য...'

'কেন?'

'ও ঠিকই বলেছে, সের্গেই পাভলভিচ,' মার্তিন মার্তিনভিচ ড্রাইভারের সমর্থনে বলে উঠল, 'দিনের বেলা মরীচিকাদের দূরে দেখা যায়, এখন তারা একেবারে নাকের সামনে এসে গেছে। ভয়ে গা শিউরে ওঠে।'

'আমি যদি চালাতে পারি তবে তুমিই বা পারবে না কেন?' সিনিয়র ড্রাইভার ধমকে উঠল।

'তোমার "বজ্র" তো রয়েছে সামনে, আমাদের যে ধুলোর পিছন পিছন যেতে হচ্ছে। আমাদের হেডলাইটে তোমার ওড়ান ধুলোয় যত সব অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস দেখা যাচ্ছে। না, আমরা আর যেতে পারব না,' বলল "সংগ্রামীর" ড্রাইভার।

'যত বাজে কথা!' সিনিয়র ড্রাইভার ক্ষেপে উঠল, 'ধুলোতে মাঝে মাঝে নানা রকম ছায়া দেখা যায় বটে। কিন্তু তার জন্য তোমরা আর এগতে পারবে না...'

'তুমিই একবার চেষ্টা করে দেখ না! আমি সামনে যাচ্ছি,' ক্ষুব্ধভাবে বলে উঠল "ডাইনোসরের" ড্রাইভার।

'ঠিক আছে!' গোমড়া মুখ করে বলল সিনিয়র ড্রাইভার।

যে যার গাড়িতে তো ফিরে গেল। আবার ইঞ্জিনের গর্জন। লম্বা পিছনটা দোলাতে দোলাতে "বজ্রকে" ছাড়িয়ে "ডাইনোসর" গতি বাড়িয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় ধুলোর মেঘের ভিতর। সে ধুলো থিতিয়ে পড়া পর্যন্ত "বজ্র" অপেক্ষা করে থাকে। তার সোনালি আলোয় কেবল চমকে ওঠে আলাদা-আলাদাভাবে ধুলিকণা। তারপর সেও এগিয়ে যায় "ডাইনোসরের" পথ ধরে।

নিকিতিনের তখন ব্যাপারটা দেখার বেশ কৌতূহল হয়েছে। উইণ্ডস্ক্রীনটা ঘষে নিয়ে সে সামনের দিকে চেয়ে রইল। কয়েক মাইল চলার পরও যখন অস্বাভাবিক কিছুই দেখা গেল না, ড্রাইভার তখন বিড়বিড় করে বকাবকি সুরু করল। গাড়িটা বেশ সহজভাবেই এগিয়ে চলেছে। একটু পরেই নিকিতিনের মনোযোগ অলস হয়ে এল। হঠাৎ ড্রাইভার ভীষণ জোর স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে দিতে গাড়িটা একপাশে বেঁকে গেল। দুজনেই পরিষ্কার দেখতে পেল সামনে একটা মস্ত গোল গর্ত, তার ধারগুলোয় সাদা টালি বসান। নিকিতিন অবাক হয়ে গিয়ে চোখ ঘষে নিল — গাড়ির আলোয়

দেখতে পেল আবর্তিত ধুলোর আড়ালে উঁচু উঁচু বাড়ি। এত পরিষ্কার ছবি যে নিকিতিন চমকে উঠল। ড্রাইভার মুখ চেপে গালাগালি জুড়ে দিল।

বাড়িগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল। মরুভূমি জুড়ে পড়ে রইল হলদে কালো ডোরাকাটা অলৌকিক এক নক্সা। মাটি দুভাগ হয়ে বেরিয়ে পড়ল এক কালো ফাটল। দাঁতে দাঁত চেপে প্রাণপণ জোরে ড্রাইভার স্টিয়ারিং হুইল চেপে ধরে রইল। মরীচিকাদের সে পাত্তা দিতে চায় না। পরমুহূর্তেই সামনে উঠে এল একটা অসম্ভব রকম খাড়া খিলানওয়ালা সেতু। সেতুটা এত বাস্তব যে নিকিতিন উৎকণ্ঠার সঙ্গে ড্রাইভারের দিকে তাকাল। ড্রাইভার তার আগেই ব্রেক কষে দিয়েছে। "সংগ্রামী" ওদিকে পিছন থেকে হর্ণ দিয়ে চলেছে। বিদ্রূপের ভঙ্গীতে অধীরতার ভান করছে। নিকিতিনের ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। তারপর চোখ ধুয়ে নিয়ে জানলাটা খুলে দিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে আবার চলতে সুরু করল। আবার আলোর সামনে নাচতে থাকে ধুলোর মরীচিকা। স্নায়ুর উত্তেজনা দ্রুত বেড়ে চলেছে। কাল্পনিক বিপদ এড়াতে গিয়ে "বজ্রের" ব্রেকগুলো ক্রমাগত চীৎকার করে চলে। অবশেষে ড্রাইভার গুমরে উঠে থুতু ফেলে গাড়ি থামিয়ে দেয়। "ডাইনোসরের" কাছে তার হার মেনে নেয়। ধুলোটা থিতিয়ে গেলে "সংগ্রামী"ও এসে যোগ দেয়। সে অনেক আগেই পিছনে দাঁড়িয়ে পড়েছিল।

রাত্রিবাসের জন্য গাড়িগুলো থামা মাত্রই সব ভূতের ফাঁকি মিলিয়ে গেল চট করে। রাত্রি তার দিগন্ত ভরে দিল কালো শূন্যতায়। মাথার উপর বড় বড় তারার শান্ত জ্যোতি। পরিচিত তারকাপুঞ্জ দেখে সবাই আরাম বোধ করল। দিনের বেলা সুরু হবে ইঞ্জিনের শব্দ আর গাড়ির দুলুনী, সেই সঙ্গে আবার যত ভূতুড়ে ব্যাপারের আক্রমণ।

নতুন মরীচিকার অস্বচ্ছ দেয়ালের আড়ালে হঠাৎ আর্কার্লি পাহাড়ের কালো ছায়ারেখা চোখে পড়তে নিকিতিন অত্যন্ত স্বস্তি বোধ করল। বহুক্ষণ পর্যন্ত রেডিয়েটর-ক্যাপের উপর দিয়ে দেখা গেল আর্কার্লির চূড়াগুলো। পাহাড়গুলো দ্রুত বেড়ে উঠে পুরো উত্তর-পশ্চিম দিগন্তটা ঢেকে ফেলেছে। পথপ্রদর্শক একটা পাহাড় দেখাল। পাহাড়টা ফাটলে ভরা, সামনের ঢালুটা

চতুর্ভুজের আকার নিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই “বজ্র” ওদিকে ঘুরল। মাটিটা এখানে আর সমান নয়। তার পাথুরে বন্ধুরতা ক্রমেই বাড়ছে।

আরেকটা সরু বাঁক ফিরে “বজ্র” ব্রেকের বাঁধন চেপে রেখে ছুটে চলল একটা মস্ত সমতলভূমির দিকে। জায়গাটা হচ্ছে একটা প্রাচীন পাহাড়ের নাব।

সমতলের পশ্চিম সীমান্তে বিষণ্ণ, কালো পাহাড়। ডানদিকের পাহাড়গুলোর খাড়া চড়াই উজ্জ্বল লাল বালিপাথরে তৈরী। অনেক উঁচুতে উড়ছে দুটো ঈগল।

অভিযাত্রীদের নিয়ে পথপ্রদর্শক লাল পাহাড়ের ধার দিয়ে এগতে লাগল উত্তরের দিকে। একজায়গায় এসে দেখা গেল পাহাড়ের লাল রং বদলে হয়েছে কালচে। এখানেই বিস্‌সেক্‌তার প্রাচীন কূপ।

এখানে ওখানে সমতলের সমান জমিতে সরু সরু নালী আর যত্রতত্র অজস্র ছড়ান মরুভূমির বার্নিশ লাগান মসৃণ নুড়ি। নুড়িগুলোর জন্য মাটিটা অস্বাভাবিক রকম কালো দেখাচ্ছে। তাদের ফাঁকে ফাঁকে সঞ্চিত স্বচ্ছ জিপসামের কেলাস রোদের প্রতিফলনে অজস্র ছোট ছোট আলোর ফুলকি তুলেছে।

‘থাম! থাম!’ হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে নিকিতিন গাড়ি থেকে নেমে বেরিয়ে গেল।

হাড়গুলো অন্যেরাও দেখতে পেয়েছিল। তারাও নিকিতিনের পেছন পেছন ছুটে গেল।

বাঁদিকে পড়ে আছে প্রস্তরীভূত গাছের দুটো লম্বা গুঁড়ি। তাদের সরলবর্গীয় কাঠ আর ডাল কড়া রোদে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। চারদিকে পড়ে আছে কালচে অথচ চকচকে বিরাট বিরাট হাড়।

অভিযাত্রীরা আহ্লাদে আটখানা হয়ে সমতলে ছড়িয়ে পড়ল। ড্রাইভার আর মজুররাও তাদের উত্তেজনা চেপে রাখতে না পেরে এই অভূতপূর্ব দৃশ্যে উৎসাহী হয়ে উঠল।

অল্প কিছু হাড় রয়েছে মাটির উপরে, বাকি সবটাই বালিপাথর আর নুড়ির নিচে পোঁতা। নালীগুলোতেও অনেক হাড় বেরিয়ে রয়েছে।

রাখালরা ঠিকই বলেছে। লুপ্ত প্রাণীর সমাধিক্ষেত্রেই তারা এসে পড়েছিল। এর আগে এজাতের প্রাণীর এত বড় সমাধিক্ষেত্র আর পাওয়া যায়নি।

উপত্যকাটা কেমন যেন ভয়াবহ। কালো গরম, প্রাণহীন উপত্যকা, চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে বিরাট বিরাট হাড়। দেখে মনে পড়ে যায় পুরনো সব উপকথা — ড্রাগনদের লড়াই, দৈত্যদের কবর, বিরাট প্লাবনে ধ্বংস পাওয়া রাক্ষসজাতি। এ রকম অসংখ্য দৈত্যাকার হাড় ছড়ান জায়গাগুলোই হয়ত ঐসব উপকথার উৎস।

উপত্যকায় অভিযাত্রীদের দ্বিতীয় দিন।

'কী? এখনো যথেষ্ট জল পাওয়া গেল না?'

'না, সের্গেই পাভলভিচ।'

'আরো খোঁড়, আরো গভীরে।'

'আর যে পারা যাচ্ছে না। পাথরে এসে ঠেকেছি।'

'পাথরে!'

কাগজপত্র ফেলে রেখে নিকিতিন সেদিকে ছুটল। মার্তিন মার্তিনভিচ ঠিকই বলেছে দেখে তার মন ভেঙে গেল। মনের হতাশাকে যথাসাধ্য চেপে রাখার চেষ্টা করে নিকিতিন ধীরে ধীরে ক্যাম্প ছেড়ে পাহাড়ের দিকে হাঁটতে লাগল। সবকিছু নতুন করে ভেবে দেখার জন্য সে এখন একা থাকতে চায়।

খবরটা সত্যিই খারাপ — অভিযাত্রীদলের প্রয়োজনের পক্ষে বিস্‌সেক্‌তার জলসঞ্চয় খুবই কম। দু-একজন মরুচর আর তাদের উটেদের পক্ষে অবশ্য এই জলই যথেষ্ট। কিন্তু লোকজন, লরীতে ভর্তি একটা বিরাট অভিযাত্রীদলের পক্ষে তা অত্যন্ত সামান্য... এক শতাব্দী আগে হয়ত জলসঞ্চয়টার অবস্থা এর চেয়ে ভালই ছিল। এখন কিন্তু শুকিয়ে এসেছে। আপদকালের জন্য যে জল আনা হয়েছে, তাই তবে এখন খরচ করতে হবে। কিন্তু ফিরতি পথের জন্য তো জল চাই, সে জল কোথায় পাওয়া যাবে? না, আরো পুবে যেতেই হবে, তা তার ফল যাই হক না কেন। সেখানে হয়ত ভাল জলাশয় পাওয়া যেতে পারে। ওখান থেকে এই উপত্যকায়ও হয়ত জল নিয়ে আসা যাবে। কিন্তু লরীগুলোকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার মতো পেট্রল তবে আর থাকবে না।

অভিযাত্রীরা মুশকিলে পড়ে গেল। সব সরঞ্জামই রয়েছে, কিন্তু এই রোদে ফাটা পাথরের রাজ্যে তা কিছুই কাজে আসবে না।

জলাশয়টাকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য অনেক চেষ্টা করা হল। কিন্তু সবই বৃথা। অদৃষ্টপূর্ব এই দুর্ঘটনায় অভিযান এখন চরম ব্যর্থতায় পরিণত হতে চলেছে। দলের লোকেদের প্রাণের ঝুঁকি নিকিতিন কী করে নেয়?

ক্লান্ত ও ভগ্নমনোরথ নিকিতিন পাহাড়ের বুকে নিরুদ্দেশভাবে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ঘোড়ার পিঠের মতো একটা পাহাড়ের কালো দিকটায় এক সরু অথচ গভীর গিরিবর্ত্ম। নিকিতিন সেখান দিয়ে ধীরে ধীরে হেঁটে চলেছে। রোদে পোড়া কালো দেয়ালগুলো থেকে হাঁপ ধরান গরম হাওয়ার ঝাপটা এসে তার নাকে মুখে লাগছে। নিকিতিন দাঁড়িয়ে গিয়ে হঠাৎ দেখতে পেল মস্ত একটা পাথরের উপর পা মুড়ে বসে আছে মিরিয়াম। কোলের খোলা খাতাটার উপর ঝুঁকে পড়ে একমনে কী যেন ভাবছে। নিকিতিনকে সে দেখতেও পায়নি। মাথাটা যেন তার মোটা বেণীর ভারেই নুয়ে পড়েছে। মুখে ধীর প্রশান্তি। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সে কী সুন্দর মানিয়ে গেছে! তরুণ জীবাশ্মবিজ্ঞানী মুগ্ধ। নিকিতিনের এতক্ষণে মনে হল মিরিয়াম সত্যিই তার দেশের মেয়ে। বাইরের দুর্বলতার আড়ালে সঞ্চিত রয়েছে শক্তি ও স্থৈর্য। পাছে মিরিয়ামের নির্জনতায় ব্যাঘাত ঘটে তাই নিকিতিন চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

এ যা দেশ এখানে কিছুই সহজে পাবার উপায় নেই। বহু দিনের সাধনার ফলেই এই নিষ্ঠুর প্রকৃতি জয় করা সম্ভব। হঠাৎ ক্ষেপে উঠে কিছু করতে সুরু করলে কোনই লাভ হবে না। সফল হতে হলে ধৈর্য আর পরিশ্রমের প্রয়োজন। নতুন বাধার মুখোমুখি হয়ে তাকে জয় করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তাড়াহুড়ো করে হঠাৎ বাজী মাত করার যে স্বাভাবিক ইচ্ছা মানুষের মনে দেখা দেয়, তার উপর নির্ভর করলে চলবে না।

তার দিকে কেউ চেয়ে আছে সেটা অনুভব করে মিরিয়াম ঘুরে তাকাল। নিকিতিনকে দেখেই লাফিয়ে উঠে এগিয়ে এল তার দিকে। তারপর নিকিতিনের চোখের দিকে তাকিয়ে তার স্বাভাবিক টানা টানা ভঙ্গীতে বলল, 'কী হয়েছে, সের্গেই পাভলভিচ, কিছু গোলমাল হয়েছে কি?'

তার গলার স্বরের আন্তরিক উৎকণ্ঠা নিকিতিন ধরতে পারল। মুহূর্তের আবেগে সে মন খুলে মিরিয়ামের কাছে প্রকাশ করল তার সব দুশ্চিন্তা। জানাল, অভিযানের সংকটজনক অবস্থা। মেয়েটি কিছুক্ষণ একটি কথাও

বলল না। তারপরে ক্যাম্পে ফেরার মুখে সলজ্জভাবে, যেন নিজের মনেই ভাবতে ভাবতে বলল, 'গতবছর দ্যুর্ত-কিরে ডিনামাইটের সাহায্যে ঝরনার জল বাড়ান হয়েছিল। একটা ডিনামাইট যদি...'

'কেন, এমোনাল তো আছে!' নিকিতিন হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'তার আউটলেটটা উড়িয়ে দিলেই হল। তাতে অবশ্য সবসময় কাজ হয় না, কিন্তু... ব্যাপারটা আমার মাথাতে একেবারেই আসেনি। এক্ষুণি চেষ্টা করে দেখব!' নিকিতিন তখন হাসিমুখে, বড় বড় পা ফেলে চলেছে, 'অনেকটা চার্জ করতে হবে! দেখা যাক কী হয়!'

বিস্ফোরণের ভীষণ গর্জনে পাহাড় কেঁপে উঠল। একটা মস্ত ধুলোর স্তম্ভ উৎসের উপর ব্যাঙের ছাতার মতো লাফিয়ে উঠল। কয়েক সেকেণ্ড পর মনে হল চারপাশের পাহাড়গুলোয় যেন প্রচণ্ড ধ্বংস নেমেছে। অভিযাত্রীরা সবাই উৎসের দিকে ছুটে গিয়ে মুখ বুঁজে পাথর সরাতে লাগল। নিকিতিন আর মিরিয়াম যখন জল মাপতে সুরু করল তখন তো চারপাশের নীরবতা অসহ্য হয়ে উঠেছে।

অভিযানের দলপতি হঠাৎ খাড়া হয়ে বসে মিরিয়ামের হাত চেপে ধরে বলে উঠল, 'ধন্যবাদ, মিরিয়াম!'

দলের ছেলেরা সবাই চেঁচিয়ে উঠল, 'ওয়া মিরিয়াম কি — ফতে!'

মিরিয়াম লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠে সিনিয়র ড্রাইভারের বিরাট পিঠের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল। ড্রাইভার বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে ধমকে উঠল:

'ছোকরারা সব পালাও!'

'এস্‌ফল্ট দেখা যাচ্ছে, মিরিয়াম?' নিকিতিন হেসে জিজ্ঞেস করল।

'খুব অদ্ভুত সঞ্চয়, বুঝেছেন সের্গেই পাভলভিচ। তারোপর এটা এস্‌ফল্টও নয় এক জাতীয় খুব শক্ত রজন।'

'কাল একবার দেখব। এখন আমরা কী খুঁড়ে পেলাম সেইটে দেখুন।'

চারিদিকে শুধু খুঁড়ে তোলা মাটির ঢিবি। একজায়গায় আগুন থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া উঠছে। তৈরী হচ্ছে হাড় জোড়া লাগানর আঠা। মার্তিন মার্তিনভিচের পরনে শুধু হাফপ্যাণ্ট। খালি গা রোদে পুড়ে তামাটে

হয়ে গেছে। একমনে সে জীর্ণ হাড়গুলোকে আঠায় ভিজিয়ে চলেছে। একটা ছোট্ট দল সমতলের ঠিক মাঝখানে একটা বড় জায়গা নিয়ে কাজ করছে। উপরের মাটির স্তরটা এর মধ্যেই খুঁড়ে ফেলে চারপাশে খাল কাটা হয়ে গেছে। এদের কাজ হল কঙ্কালের চারপাশের মাটিটা কেটে সরিয়ে ফেলা। বাকি থাকবে কেবল "মোনোলিথ", তার মানে কঙ্কালকে যে মাটির অংশটুকু ঢেকে রাখে সেইটুকু। পরে কাঠের ফ্রেম করে সেটাকে মাটি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হবে। দুজন লোক বড় বড় ছুরি দিয়ে আলগা বালিপাথর কেটে জায়গাটাকে তিন ভাগে ভাগ করছে। মারুসিয়া বের-করা খুলিটার ভাঙা জায়গাগুলোয় চাঁচগালা ঢালছে।

মিরিয়ামকে নিয়ে সেখানে এল নিকিতিন। মাটির উপরে একটুখানি বের-করা সরীসৃপ জাতের জন্তুর বিরাট কঙ্কালটা দেখে মিরিয়াম তো অবাক। জন্তুটা এক পাশ ফিরে পড়ে আছে। লম্বা ল্যাজটা পিঠের নিচে পাকান, পিছনের বিরাট বিরাট পাদুটো মুড়ে রাখা। যে কটি হাড় সে দেখতে পাচ্ছে, তার প্রতিটিতেই নম্বর মারা — কশেরুকা, পাঁজরা এমন কি ভোঁতা ক্ষুরগুলোতে পর্যন্ত। জন্তুটার দুমিটার লম্বা খুলিটা ক্রমশ মোটা হয়ে খোঁচা খোঁচা কাঁটা বসান মস্ত কলারে পরিণত হয়েছে। চোখের গর্তদুটোর উপরে একজোড়া লম্বা শিং। আরেকটা শিং রয়েছে মস্ত পাখির ঠোঁটের মতো মুখের উপরে।

'এটা হচ্ছে ট্রিসেরাট্‌পস্‌, তিন শিংওয়ালা গাছাপালাখেকো ডাইনোসর। শিকারী জন্তুদের সঙ্গে লড়ার জন্য তার যে অনেক অস্ত্রশস্ত্র ছিল সে তো দেখতেই পাচ্ছেন,' নিকিতিন বুঝিয়ে বলতে লাগল, 'কঙ্কালটা সম্পূর্ণ অক্ষত আছে। আমরা এটাকে তিন ভাগে আলাদা করে নিয়ে শক্ত ফ্রেমে আটকে রাখব,' কাঠের বরগাগুলো দেখিয়ে নিকিতিন বলল, 'উপরে জিপসাম ছড়িয়ে দিয়ে কঙ্কালটাকে নিয়ে যাব। তারপর আমাদের ল্যাবরেটরীতে ওরা বাকি কাজটা সম্পূর্ণ করবে।'

'যে শিকারী জন্তুদের কাছ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য এর এরকম ভয়াবহ সব অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন হত তাদের চেহারাটা না জানি কী রকম?'

'এইটে দেখে কিছুটা বুঝতে পারবেন,' একটা বাক্স থেকে নিকিতিন প্রায় ছ'ইঞ্চি লম্বা একটা চ্যাপ্টা দাঁত বের করল। দাঁতটার ধারগুলো খাঁজ

কাটা, ডগাটা বাঁকান। 'এটা হচ্ছে সরীয় বা টিকটিকি জাতীয় প্রাণীদের রাজা টিরানোসরের দাঁত। টিরানোসর আবার পিছনের পায়ে ভর দিয়ে হাঁটত। পাহাড়ের নিচেও আমরা শীগগিরি খোঁড়ার কাজ সুরু করব। মার্তিন মার্তিনভিচ তিনটে সশস্ত্র ডাইনোসরের কঙ্কাল সেখানে পেয়েছে। তাদের গায়ের চামড়া বর্মের মতো। তার উপরে কাঁটা। ঠিক যেন ট্যাংক। কেবল আধুনিক ট্যাংকের মতো তাদের কামান নেই, কারণ কামান হচ্ছে আক্রমণের অস্ত্র। নিরামিষাশী জন্তু তার বর্ম আর শিং নিয়ে কেবল আত্মরক্ষার জন্যই লড়াই করে। নিজে থেকে এগিয়ে গিয়ে কখনো আক্রমণ করে না।'

পুবের গিরিবর্ত্মের মুখে না ঢুকে মিরিয়াম বাঁয়ে বেঁকে পাহাড়ের নিচে ছড়ান মস্ত মস্ত পাথরের ভিতর দিয়ে নিকিতিনকে নিয়ে গেল।

হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে তাদের পথ জুড়ে দাঁড়াল লাল কালো পাথরের একটা মস্ত দেয়াল। তার গায়ে একটা সরু গলি, কেউ যেন বিরাট তলোয়ার দিয়ে কেটে সেটা তৈরী করেছে। তার উপর দুপাশে দুটো পাথরের স্তম্ভ। সেদুটো অনেক উঁচুতে উঠে গিয়ে মাথার উপরে প্রায় মিশে গেছে।

গলিটা বন্দুকের নলের মতো সোজা। দেয়ালগুলো বেশ মসৃণ আর পালিশ করা। শখানেক ফুট যাওয়ার পর মিরিয়াম আর নিকিতিন এসে পড়ল একটা ছোট্ট খোলা উপত্যকায়, চারপাশে তার খাড়া পাহাড়। উল্টোদিকটা অর্ধচন্দ্রাকারে বেঁকে গেছে, তার ঠিক মাঝখানে উঠে গেছে লালচে খয়েরী রঙের লম্বা চৌকো বালিপাথর। পায়ের কাছে গাদা হয়ে রয়েছে অনেক চেপ্টা পাথর। পাথরগুলো, বেশ বোঝা যায়, সম্প্রতি ভেঙে পড়েছে। লম্বা চৌকো পাথরটার এক কোণে চকমক করছে একটা মস্ত কালো আয়না।

নিকিতিন অবাক হয়ে চারদিকে চেয়ে রইল।

মিরিয়াম শান্তভাবে বলল, 'এই হচ্ছে এস্‌ফল্টের সঞ্চয়। আসলে বলা উচিত জমাট রজনের শক্ত হয়ে যাওয়া লৌহবাহী বালিপাথরের মধ্যে সমস্তরে এরা সঞ্চিত। এই বালিপাথরের উৎপত্তি বোধ হয় বাতাস থেকে — তার মানে প্রাচীন বালিয়াড়ির জাতের। জলাশয়ে আমাদের ঐ বিস্ফোরণের ফলে এখানকার পাহাড় ভেঙে প্রস্তরীভূত রজনের নতুন স্তর বেরিয়ে পড়েছে। এর মসৃণ ত্বক এখনো ক্ষয়ে যায়নি। আয়নার মতো চকচক করছে।'

‘রজন আর বালিপাথরেরের সঞ্চয় কখন ঘটেছে বলে আপনার ধারণা?’ নিকিতিন কাল ব্যয় না করে জিজ্ঞেস করল।

‘ডাইনোসরদের সমাধিক্ষেত্রের উৎপত্তির সময়েই হবে,’ মিরিয়াম জবাব দিল, ‘প্রাচীন পাহাড়ের এই উপত্যকায় সঞ্চয়গুলি খুবই ভাল অবস্থায় রয়েছে।’

নিকিতিন বেশ খুসি হয়ে মাথা নেড়ে বড় বড় দানা, খড়খড়ে বালির উপরেই বসে পড়ল। মিরিয়ামও তার প্রিয় ভঙ্গীতে তুর্কী চালে পা মুড়ে বসে পড়ল নিকিতিনের সামনে।

উপত্যকাটা চারপাশ থেকে পাহাড়ে ঢাকা, কিন্তু তবু কেন জানি না তেমন গরম নয়। চারপাশের গম্ভীর নিস্তব্ধতা মাঝে মাঝে ব্যাহত হচ্ছে একটি ক্ষীণ শব্দে। এই স্বাভাবিক পাহাড়ে প্রাসাদকক্ষের মেঝেতে যে শুকনো ঘাস গজিয়েছে তার গায়ে বাতাসের মর্মর যেন স্ফটিকের ঘণ্টা বাজিয়ে চলেছে। এই করুণ মর্মরধ্বনি নিকিতিন আগে কখনো শোনেনি। তাই সে জিজ্ঞাসু চোখে মিরিয়ামের দিকে তাকাল। মিরিয়াম মাথা নামিয়ে ঠোঁটের কাছে আঙুল চেপে ধরল। কানখাড়া করে নিকিতিন শুনতে পেল, আরেকটা শব্দ মিশে গেল সেই প্রায় অশ্রুত অস্ফুট নিক্কণে। সেটাও মনে হল অনেক দূর থেকে ভেসে এল, আওয়াজটা কিছু চাপা। নিকিতিন ভাবল, উপত্যকার মাটিতে গোল হয়ে যে ঝোপগুলো উঠেছে সেখান থেকেই বুঝি এই আওয়াজ আসছে।

নিস্তব্ধ মরুভূমির এই ক্ষীণ সংগীত নিকিতিনের মনটাকে কেমন বিষণ্ণ করে তুলল।

ঘাসগুলো গান গেয়ে তাকে ডাকছে প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটনের কাজে। কিন্তু তা এতই গভীরে লুকনো যে প্রাত্যহিক অভ্যাসে জড়ান আমাদের মন তার নাগাল পায় না। সে রহস্য সম্বন্ধে আমরা ভাল করে সচেতন হই কেবল বিশেষ কয়েকটি দুর্লভ মুহূর্তে।

মানুষ যতটা জানে প্রকৃতি আসলে তার চেয়ে অনেক বেশি সমৃদ্ধ, একথা উপলব্ধি করে নিকিতিন অভিভূত হয়ে পড়ল। জ্ঞান হচ্ছে কঠোর সাধনার ব্যাপার। প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আর নিরন্তর সংগ্রামের ফলেই মানুষ তার রহস্য ভেদ করতে পারে। কিন্তু তবু একাজে সফল হতে হলে

অনুসন্ধানীর মনটি হওয়া চাই খাঁটি, মহৎ। প্রকৃতির রাগিণীর স্বরলিপি ধরতে হলে হৃদয়টি হওয়া চাই বাজনার মতো নিখুঁৎ সুরে বাঁধা।

নিকিতিন ধীরে ধীরে চোখ তুলতে মিরিয়ামের চোখে চোখ পড়ল। অদ্ভুতভাবে সে উঠে দাঁড়াল। তারপর ঘাসের রহস্যময় সংগীত ডুবিয়ে দিয়ে বলে উঠল:

'এবার যেতে হয়, মিরিয়াম!' গলার স্বরটা নিকিতিনের নিজের কানেই বড় কর্কশ শোনাল।

মিরিয়াম উঠে পড়ল। ছোট্ট শান্ত উপত্যকাটার দিকে নিকিতিন একবার তাকাল।

'এমন সুন্দর জায়গাটার মাধুর্য এতদিন একা একা ভোগ করেছেন, আপনি বড় স্বার্থপর,' হেসে বলল নিকিতিন।

'আপনি যা ব্যস্ত ছিলেন,' নম্রভাবে জবাব দিল মেয়েটি।

'কাল পাহাড়ে স্তম্ভের কাছে ক্যাম্প নিয়ে আসব,' নিকিতিন দৃঢ়তার সঙ্গে জানাল, 'এখন তো ওর কাছেই খোঁড়ার কাজ সুরু হবে!'

দক্ষ হাতে হাতুড়ির এক জোর ঘায়ে মার্তিন মার্তিনভিচ শেষ বাক্সটার গায়ে শেষ পেরেকটা পুঁতে হেসে বলে উঠল:

'ব্যস, সের্গেই পাভলভিচ!'

'আচ্ছা,' জবাবে বলল নিকিতিন, 'আসছে কাল আমাদের ছুটি। তারপর তৈরী হয়ে নিয়ে সন্ধ্যার দিকে বাড়িমুখো রওনা। আর এখানে থাকা নয়।'

'সের্গেই পাভলভিচ,' মারুসিয়া নিকিতিনের কাছে আব্দার ধরল, 'আপনি বলেছিলেন এই জন্তুগুলোর কথা আমাদের বলবেন।' চারপাশের বাক্সগুলো দেখিয়ে মারুসিয়া বলল, 'এবার সময় হয়েছে। এখন তো মাত্র তিনটে বাজে।'

'ঠিক আছে। খাবারের পর উপত্যকায় গিয়ে বলব,' অভিযানের নেতা রাজী হয়ে গেল।

অভিযাত্রীদলের চোদ্দজনই নিকিতিনকে ঘিরে বসল তার কথা শোনার জন্য। বহু প্রাচীন কাল থেকে জীবের লক্ষ লক্ষ বছরের অভিব্যক্তির ইতিহাস সে বলে চলে সুন্দর করে, দরদ দিয়ে। পৃথিবীতে প্রাণ চতুষ্পদ উভচর প্রাণী

আর সরীসৃপের আকারে এক সময় যে অদ্ভুত অবিশ্বাস্য রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল তার ব্যাখ্যানও সে দেয়। একে একে জানায়, প্রাকৃতিক বাছাইয়ের অমোঘ নিয়ম কীভাবে নির্মম হাতে দুর্বল আর অনুপযুক্তদের হটিয়ে দিয়ে জীবজননের অনন্ত স্রোতকে বাধামুক্ত করে রেখেছে।

পনের কোটি বছর আগে মধ্যজীবীয় যুগের সুরুতে পৃথিবীতে ছিল সরীসৃপের বাস। তারাই জন্ম দেয় স্তন্যপায়ী জীবের। এই অত্যন্ত উন্নত প্রাণীর অভিব্যক্তিতে প্রভাব পড়েছিল অবসৃত পুরাজীবীয় যুগের কঠোর অবস্থার। পুরাজীবীয় যুগের পরের যুগে কঠোর ও প্রতিকূল আবহাওয়ার জায়গায় দেখা দিল উষ্ণ আর্দ্র আবহাওয়া। পৃথিবী ঢেকে গেল উদ্ভিদ সম্পদের প্রাচুর্যে। চারপাশের অবস্থা হয়ে উঠল অনেক সহজ আর প্রাণের বিকাশের উপযোগী। এল সরীসৃপযুগ। মাটি সমুদ্র আকাশ জয় করে নিয়ে সরীসৃপরা আকারে আর সংখ্যায় বিপুল পরিমাণে বেড়ে উঠতে সুরু করল।

শিকারী জন্তুদের তৃপ্তিহীন লোভের হাত থেকে নিজেদের বাঁচানর জন্য বিরাটকায় নিরামিষাশী জন্তুদের মাথায় গজাল বিরাট বিরাট শিং, গায়ে শক্তহাড়ের বর্ম আর কাঁটার আবরণ। অন্যেরা অনেকে লুকল হ্রদ আর উপহ্রদে। মাথা থেকে ল্যাজ পর্যন্ত তাদের দৈর্ঘ্যের মাপ হবে অন্তত একশ ফুট। ওজন ষাট টন। আকাশ তখন ছেয়ে গেছে ডানাওয়ালা সরীসৃপে। সেখানে তাদের অবিসংবাদিত প্রাধান্য, কারণ তাদের ডানার পরিসর সবচেয়ে বেশি।

হিংস্র জন্তু মোটা ল্যাজের সাহায্যে ভারসাম্য বজায় রেখে পিছনের দুপায়ে ভর দিয়ে হাঁটত। সামনের পাদুটো তাই তাদের ক্রমশ দুর্বল হয়ে অকেজো হয়ে পড়ল। বড় বড় দাঁতে ভরা মুখ নিয়ে তাদের বিরাট মাথাটা হয়ে উঠল মারাত্মক অস্ত্র। প্রায় কুড়ি ফুট লম্বা এই তিনপেয়ে বুদ্ধিহীন দৈত্যগুলো হয়ে উঠল অত্যন্ত শক্তিশালী আর হিংস্র যুদ্ধযন্ত্র।

এই অপ্রীতিকর সঙ্গীদের সঙ্গেই বাস করত প্রাচীন স্তন্যপায়ী জীব। ইঁদুর বা হেজহগের চেয়ে তারা বেশি বড় নয়, মারাত্মকও নয়। মধ্যজীবীয় যুগটা হচ্ছে সরীসৃপদের পরাক্রমের যুগ। স্তন্যপায়ী জীবদের তারা প্রায় নিঃশেষই করে ফেলেছিল। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে এই প্রায় দশ কোটি বছরের যুগটাকে অন্ধ প্রতিক্রিয়ার কাল বলা যেতে পারে। প্রাণী জীবনের প্রগতি এই সময় ব্যাহত হয়েছে।

তারপর ঘটল আবহাওয়ার বদল। উদ্ভিদজীবনেও দেখা দিল পরিবর্তন। বড় বড় সরীসৃপ জাতের প্রাণীরা এবার পড়ল বিপদে। নিরামিষাশী যারা তারা আর আগের মতো প্রচুর স্বাস্থ্যকর খাবার পায় না। খাবার ক্রমশ লোপ পাওয়ায় তারা আর তাদের হিংস্র জাত ভাইরা, দুদলই পড়ল অসুবিধায়। লোপ পেতে বসল সরীসৃপ। তাদের অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে বিজয়ী স্তন্যপায়ী জীব দখল করে নিল পৃথিবী। তাদের অভিব্যক্তির ফলেই দেখা দিল মানুষ।

গল্প শেষ করে নির্কিতিন বলল, 'একবার ভেবে দেখ, কোটি কোটি বছর ধরে কত প্রাণী জন্ম নিয়েছে, লোপ পেয়েছে। তাদের কারো এতটুকুও বুদ্ধির আলো ছিল না। যা কল্পনার অতীত তাই একবার কল্পনা করতে চেষ্টা কর — অভিব্যক্তির অন্ধ প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক নির্বাচনের বেদীতে কত অজস্র প্রাণ হয়েছে উৎসৃষ্ট ...'

চুপ করে গেল নিকিতিন। অন্ধকার হয়ে আসা আকাশের বহু উঁচু থেকে ডেকে উঠল একটা ঈগল। কারো মুখে কোন কথা নেই। সবাই স্থিরদৃষ্টে চেয়ে আছে নিকিতিনের দিকে।

নির্কিতিন চিন্তামগ্নভাবে হেসে বলল, 'জীবাশ্মবিদ্যার মহত্ব হচ্ছে তার বিরাট কালচেতনায়। এদিক দিয়ে তার সমকক্ষ হচ্ছে একমাত্র জ্যোতিষ। তবে জীবাশ্মবিদ্যার একটা মস্ত অসুবিধাও আছে। যারা সম্পূর্ণ জ্ঞানের সন্ধানী তাদের পক্ষে সে অসুবিধাটা বড়ই কষ্টকর। তা হল তথ্যের দুরপনেয় অসম্পূর্ণতা। লুপ্ত প্রাণীর অত্যন্ত স্বল্প এক কণা মাত্র পৃথিবীর মাটিতে সঞ্চিত রয়েছে। তাও টুকরো টুকরো ভাবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের কথাই ধর না। আমরা কেবল হাড় খুঁড়ে বের করি। একথা সত্যি ঐ হাড়ের সাহায্যেই প্রাণীর চেহারাটা আমরা আঁচ করতে পারি, কিন্তু সেও কেবল অংশত। আসল কথাটা হচ্ছে জন্তুটার ভিতরের রূপটা আমরা কখনো জানতে পারব না, তার সত্যিকার চেহারাটা পাব না দেখতে। তার ফলে আমাদের তত্ত্বগুলোর প্রকৃত যাচাই সম্ভব হয় না, আমাদের ভুলভ্রান্তিও ধরা পড়ে না। জৈব নিয়ম অমোঘ; নিষ্ফল কল্পনার হাতে মানুষের বুদ্ধিকে ছেড়ে দিলে চলে না, প্রতিটি নিয়মকে তার সত্যিকার আলোয় বিচার করে দেখতে হয়।'

নির্কিতিনের গলায় বেজে উঠল একটা বিষণ্ণ সুর। তারপর হঠাৎ সে

লাফিয়ে উঠে পড়ল। তার শেষ কথাগুলোয় সবাই একটু মুষড়ে পড়েছে দেখে সে বলে উঠল:

'বন্ধুরা, বিজ্ঞানের রহস্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকের মত মেনে নিও না। গল্পের অবাধ আর ব্যাপক কল্পনাশক্তির সাহায্যেও হয়ত সেই রহস্যের অন্তস্তলে পেঁছিতে পার। লেখকরা কখনো তথ্যের সংকীর্ণ গণ্ডীতে বাঁধা পড়ে থাকতে চান না। অতীত কালের প্রাণীজগতের সুস্পষ্ট বিশ্বাস্য ছবি তাঁরা এঁকেছেন। সে জগতকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। কনান ডয়েলের "অজ্ঞাত জগৎ", রসনি আইনের "আগুনের জন্য লড়াই" আর "বিরাট শিকারী জন্তু" তোমাদের পড়তে বলি। আইনে আমার প্রিয় লেখক। তাঁর কল্পনাপ্রবণ লেখা, প্রাচীন জীবনের আশ্চর্য সুন্দর বর্ণনা, অতীতকে আবার বাঁচিয়ে তোলার ক্ষমতা, জীবাশ্মবিদদের পক্ষেও মনোমুগ্ধকর।'

আলোচনায় আত্মহারা হয়ে নিকিতিন ফরাসী লেখকের লেখা থেকে উদ্ধৃতি শোনাতে সুরু করল, "গোধূলির গভীর আলোর সঙ্গে সঙ্গে নেমে এল অতীতের অস্পষ্ট ছায়া। একটা অমঙ্গলে লাল কুয়াশা ঘূর্ণির মতো ছড়িয়ে পড়ল সারা সমতলে..."

মারুসিয়ার চাপা চীৎকার শুনে নিকিতিন ঘুরে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গেই তার হৃৎস্পন্দন যেন বন্ধ হয়ে গেল, ভয়ে সারা শরীর জমে গেল পাথরের মতো।

প্রস্তরীভূত রজনের নীলচে কালো গায়ের কাছে যেন হাঁ করা গহ্বরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল একটা দৈত্যকায় ধূসর-সবুজ প্রাণী। একটা ফাটলের ধার ঘেঁষে চুপ করে, শূন্যে ঝুলে আছে বিরাট এক ডাইনোসর। নিচের হতভম্ব দলটার প্রায় ত্রিশ ফুট উঁচুতে।

ঝুলে পড়া জন্তুটার বাঁকা নাক মাথাটা তোলা। নিষ্প্রভ নিষ্ঠুর চোখদুটো একদৃষ্টে দূরে কী যেন দেখছে। ঠোঁটহীন বিরাট মুখটার ভিতর থেকে বেরিয়ে আছে বড় বড় দাঁতের দীর্ঘ সারি। ছোট্ট কুঁজওয়ালা খাড়া পিঠটা এসে শেষ হয়েছে অবিশ্বাস্যরকম শক্তিশালী ল্যাজে। ল্যাজটা আবার পিছন থেকে তার ভার ধরে রেখেছে। থামের মতো পিছনের পাদুটো গাঁটের কাছে ভাঁজ করা। তারাও কম শক্তিশালী নয়। তিন আঙুলের পাতায় ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিরাট নখগুলো যেমন ছড়ান, তেমনি বাঁকা। সামনের

পাদুটো সরু, ঠিক গলার তল থেকেই নেমেছে, নখগুলো খুব ধারাল। বিরাট শরীর আর মস্ত মাথার তুলনায় সামনের পাদুটো অত্যন্ত ছোট।

জন্তুটার ছায়াশরীরের ভিতর দিয়ে উঁকি মারছিল কালো পাহাড়ের গা। কিন্তু তবু ডাইনোসরের শরীরের প্রতিটি অঙ্গ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে— পিঠ, ফোঁটাকাটা ছোট্ট ছোট্ট হাড়ের আঁশ, রুক্ষ চামড়া, মোটা মোটা মাংসপেশী, এমনকি দুপাশের চওড়া বেগুনি রঙের দাগগুলো পর্যন্ত। অত্যন্ত সজীব ছবি। অত্যন্ত বাস্তব অথচ অশরীরী ঐ ছায়াটার দিকে যে সবাই রুদ্ধ নিশ্বাসে চুপ করে চেয়ে রয়েছে, তাতে অবাক হবার কিছুই নেই।

বেশ কয়েক মিনিট কেটে গেল। সূর্যের আলো মিলিয়ে এলে সেই নিস্তব্ধ ছায়াশরীরও ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল। তার জায়গায় রইল কেবল কালো আয়নাটা। তার আগেকার নীলচে ভাবের জায়গায় দেখা দিয়েছে নিষ্প্রভ তামাটে আভা।

সবার বুক থেকে একসঙ্গে ফেটে পড়ল রুদ্ধ নিঃশ্বাস। নিকিতিন তার শুকনো ঠোঁটদুটো জিভ দিয়ে চেটে নিল।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত কারো মুখ দিয়ে কোন কথা সরল না। প্রতিদিনের অভিজ্ঞতা আর শিক্ষার ফলে জগত সম্বন্ধে যে ধারণা এদের হয়েছে এই অবিশ্বাস্য ছায়াশরীর তা একেবারেই তছনছ করে দিয়েছে। সবার মনে হল, এই অলৌকিক ঘটনায় তাদের জীবনের ধারাটা বুঝি সম্পূর্ণ উলটে পালটে গেল। অদ্ভুত দৃশ্যটা দেখে নিকিতিনই সবচেয়ে বেশি বিচলিত হয়েছিল। নিকিতিন বৈজ্ঞানিক, প্রকৃতির ধাঁধার বিশ্লেষণ ও সমাধান করা তার অভ্যাসের গভীরে শিকড় গেড়েছে। অথচ এখন এই অলৌকিক ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে সে অক্ষম।

সবাই একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা খুঁজে বের করার চেষ্টা করতে লাগল। রাত্রে বহুক্ষণ পর্যন্ত ক্যাম্পের সবাই জেগে বসে ঐ কথাই আলোচনা করল। শেষকালে নিকিতিন সবাইকে শান্ত করে বলল, এই মরীচিকার দেশে টিরানোসরের ছায়া দেখা কিছুই অসম্ভব ব্যাপার নয়।

বাড়ি ফেরার দীর্ঘযাত্রার আগে ড্রাইভার গাড়ির ইঞ্জিন পরখ করে দেখছে। সমতলের খয়েরী নুড়িভরা জমির উপরে দেখা দিয়েছে একটা নীলচে কুয়াশা।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে নিকিতিন দ্রুত পায়ে সরু গলিটার দিকে এগিয়ে গেল।

কালো আয়নাটা তার দিকে গভীর, দৃষ্টিহীন চোখে তাকিয়ে। উপত্যকার সেই সুন্দর নিস্তব্ধতা আর নেই — পিছনের সমতল থেকে ভেসে আসছে ইঞ্জিনের শব্দ। নিকিতিনের মনে একটা অপূরণীয় ক্ষতির বোধ। শুধু শুধুই সে গতদিনের অশরীরী ছায়ার আশায় দাঁড়িয়ে রইল। সে ছায়া আর দেখা দিল না। হয়ত তার আসার ঠিক সময়টা সে আঁচ করতে পারেনি; হয়ত নিকিতিনের আসতে অনেক দেরী হয়ে গেছে।

গভীর ক্ষোভের সঙ্গে নিকিতিন আয়নার পায়ের কাছে ভাঙা পাথরের স্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে রইল। অনেকক্ষণ পর হঠাৎ তার খেয়াল হল পিছনে বালি মাড়িয়ে কে যেন আসছে। মিরিয়াম।

'মার্তিন মার্তিনভিচ বলল, সব প্রস্তুত,' নিকিতিনের কাছে এগিয়ে এসে মিরিয়াম হাঁপাতে হাঁপাতে বলল। 'আমি আপনাকে ডাকতে এলাম। সেই ফাঁকে আর একবার দেখে যাব...'

'এক্ষুণি যাচ্ছি,' নিকিতিন বেশ অনিচ্ছার সঙ্গেই বলল, 'একটুখানি দাঁড়ান, মিরিয়াম!'

মিরিয়ামও এগিয়ে এসে কালো আয়নাটার দিকে স্থিরদৃষ্টে চেয়ে রইল।

'ফিরে গিয়ে আপনি কী করবেন, মিরিয়াম?' নিকিতিন হঠাৎ জিজ্ঞেস করল।

'কাজ করব আর পড়ব,' খুব সংক্ষেপে জবাব দিল মিরিয়াম, 'আপনি?'

'আমিও আমার ডাইনোসরদের নিয়ে কাজ করব আর ভাবব...' নিকিতিনের কথা ঠেকে গেল। তবু সে শেষ পর্যন্ত বলে ফেলল, 'ভাবব আপনার কথা!'

মিরিয়াম মাথা নামিয়ে চুপ করে রইল। কিছুক্ষণ পর বলল, 'আমি আপনার জায়গায় হলে কালকের ঐ অশরীরী ছায়ার কথা ছাড়া আর কোন কিছুই ভাবতাম না। কালকের ওটা কিন্তু মরীচিকা নয়।'

'আমি তা জানি!' নিকিতিন ক্ষুব্ধভাবে বলল, 'কিন্তু আমি তো পদার্থবিদ নই, আমি জীবাশ্মবিদ। শুধু যদি...'

নিজের প্রতি কেমন একটা অস্পষ্ট বিরক্তির ফলে নিকিতিন হঠাৎ থেমে গেল। প্রস্তরীভূত রজনের সেই অপূর্ব খণ্ডটার দিকে এগিয়ে গিয়ে সে অনেকক্ষণ ধরে স্থিরদৃষ্টে তার কালো, নিষ্প্রাণ ত্বকের দিকে চেয়ে রইল। এক মুহূর্তের জন্য মানুষের চোখের সামনে খুলে গিয়েছিল কালের দুর্ভেদ্য পর্দা। সারা মানবজাতির মধ্যে কেবল সে আর তার বন্ধুরাই তা দেখতে পেয়েছিল। তাদের মধ্যে একমাত্র সে-ই প্রয়োজনীয় জ্ঞান আর অভিজ্ঞতার অধিকারী। মিরিয়াম ঠিকই বলেছে... প্রকৃতির রহস্যের মর্মভেদ তারই কর্তব্য।

হঠাৎ নিকিতিনের মনে হল সে যেন রুপোলি ছায়া দেখছে... আয়নার কালো গভীরতা থেকে তারা ভেসে আসছে। নিকিতিন মন দিয়ে ভাল করে ব্যাপারটা দেখতে লাগল। বিচ্ছিন্ন অংশগুলো জুড়ে গিয়ে একটা মূর্তি গড়ে উঠেছে — যেন মস্তবড় একটা ফোটো, কিন্তু সেটা ভাল করে ডেভেলপ করা হয়নি। মাঝখানে রয়েছে উল্টো করা একটা টিরানোসরের ছবি, আগের দিনেরটার চেয়ে অনেক ছোট। বাঁদিকে অতিকায় গাছের ঝাড়। পিছনে পাহাড়ের অস্পষ্ট রেখা।

মিরিয়ামের দিকে একবার তাকিয়ে নিকিতিন চট করে তার নোট-বইটা বের করে নিল। মিরিয়ামও তখন মন্ত্রমুগ্ধের মতো আয়নাটার দিকে তাকিয়ে। নিকিতিন আয়নার দৃশ্যটা তার খাতায় এঁকে নিতে লাগল, কিন্তু সেই রুপোলি ধূসর ছায়া আগের চেয়ে বেশি স্পষ্ট হল না। কিছুক্ষণ পরেই তার ক্লান্ত চোখের সামনে ফুটে উঠল কতগুলো উজ্জ্বল ফোঁটা আর সর্পিল রেখা। কালো আয়নাটা আবার ফাঁকা হয়ে গেল।

নিকিতিন আর কিছুতেই নিজেকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে না। সে বেশ বুঝতে পারছে এখানে আরো কয়েকদিন থেকে এই যাদু দর্পণের ছবিগুলোর বিবরণ তার লিখে রাখা উচিত।

ভাগ্যের খেয়ালের ফলে সে হঠাৎ এক অদ্ভুত ঘটনার সামনে এসে পড়েছে। আর কয়েকদিন পরেই হয়ত রোদ আর হাওয়ায় এই রজন পাথরটার মসৃণ গা যাবে নষ্ট হয়ে। এই ধাঁধারও তবে আর কোন উত্তর পাওয়া যাবে না। এই সুযোগ নিয়ে মানবজাতির উপকার করা তার অবশ্য কর্তব্য — তার চেয়েও বেশি, তার জীবনের মহত্তম কাজ।

কিন্তু এই যাদু আয়না, অতীতকে দেখার এই জানলাকে এখন এই পাণ্ডববর্জিত পাহাড়ে রাজ্যে ছেড়ে যেতে হবে। হাতে সময় একটুও নেই। যাওয়ার দিন পিছিয়ে দেওয়া বিপজ্জনক। অভিযানের নির্দিষ্ট দিন ফুরিয়ে গেছে। মাল বেশি হয়ে গেছে। তাই নিয়েই দুর্গম পথে বাড়িমুখো ফিরতে হবে। একটা ছায়ার জন্য তো এতগুলো মানুষের জীবন বিপন্ন করা যায় না। না, এক্ষুণি তাকে যেতে হবে।

নির্কিতিন দ্রুত পায়ে গাড়ির কাছে ফিরে এল।

"বজ্রের" কাছে পেঁছে নির্কিতিন একবার মিরিয়ামের দিকে তাকাল। সে তখন "সংগ্রামীর" কাছে দাঁড়িয়ে পাহাড়গুলোর দিকে তাকিয়ে। সেখানেই লুকিয়ে আছে সেই ছোট্ট উপত্যকাটি। আর্কার্লি পাহাড়ে এই ঘটনাবহুল দিনগুলোর শেষ এই ছবিটিই নির্কিতিনের মনে গাঁথা হয়ে গেল।

'চল!' ধড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে নির্কিতিন বলে উঠল। ডাইনোসরদের সমাধিক্ষেত্র ছেড়ে গাড়ি চলতে সুরু করল। নির্কিতিন একদৃষ্টে চেয়ে আছে চাকার নিচ থেকে ছিটকে ওঠা জিপসাম'এর স্ফুলিঙ্গগুলোর দিকে।

সীসার মতো আকাশের গায়ে মিলিয়ে আসছে ঠাণ্ডা বিমর্ষ আলো। জানলার জোড়া পাল্লার ভিতর দিয়ে নির্কিতিন পাশের বাড়ির ছাদের দিকে তাকাল। বরফে ছাদটা ঢেকে গেছে। চিমনী দিয়ে বেরিয়ে আসা ধোঁয়াটা বাতাসের ঘায়ে ছড়িয়ে পড়ছে।

হাতের বইটা সরিয়ে দিয়ে নির্কিতিন আরামকেদারায় বসে আড়ামুড়ি ভেঙে নিল। এই মুহূর্তে জীবনটাকে তার বড় বিস্বাদ বলে মনে হচ্ছে। বৈজ্ঞানিকের মন কিছুতেই হার মানতে চায় না, কিন্তু ভীষণ পরাজয়ের আর বেশি বাকি নেই।

নির্কিতিন বিষণ্ণ মনে ভাবছিল, তার প্রতিষ্ঠার ফলেই তাকে এখনো হাসির পাত্র হয়ে উঠতে হয়নি। পদার্থবিদদের প্রতি তার আবেদনে সবাই প্রশ্রয়ের ভাব দেখিয়েছে—যেন বলতে চায়, হ্যাঁ, তারাও একেক সময় মরীচিকা আর মায়াস্বপ্নের কথা শুনেছে বটে। নির্কিতিনও ধীরশান্ত অবস্থায় তাদের বক্তব্য মেনে নিয়েছে।

এমনকি ঐ ডাইনোসরদের সমাধিক্ষেত্রেও নিকিতিন বুঝেছিল যে কালো রজনের মসৃণ গায়ে রহস্যজনকভাবে একটা ফোটোগ্রাফের ছাপ পড়েছে। কিন্তু ফোটোগ্রাফিক প্লেট, তারপর ডেভেলপিং আর ফিক্সিং ছাড়া ফোটোটা উঠবে কী ভাবে? আর সবচেয়ে বড় কথা হল, আলো তার স্বাভাবিক বিক্ষিপ্ত অবস্থায় কোন ছবি গড়তে পারে না। একটা ক্যামেরা অব্‌স্কুরা থাকাই চাই। তার মানে একটা অন্ধকার ঘেরা জায়গায় একটা সংকীর্ণ এপারচার বা খোলামুখ, যার ভিতর দিয়ে আলোর রশ্মি বাইরের লক্ষ্য বস্তুর একটা উল্টো ছবি পাঠিয়ে দেয়। টিরানোসরটাও কালো আয়নার বুকে উল্টো হয়েছিল।

এই সমস্যার সমাধানের জন্য নিকিতিনের বিশেষ রকমের উৎসাহ প্রয়োজন। প্রয়োজন বহু আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছনর মনোবল আর ইচ্ছাশক্তি। সত্যিই তার প্রেরণার প্রয়োজন। কিন্তু এখানকার এই মাপাজোঁকা, অভ্যস্ত জীবনযাত্রায় অনুপ্রেরণা হচ্ছে দুর্লভ অতিথি। আড়াই হাজার মাইল দূরে স্তেপ আর মরুভূমির ওপারে যে ঘটনা ঘটল সেটাই বরং ক্রমে বহুদূরে সরে যাচ্ছে। একেক সময়, শীতের দিনের ম্লান চাপা আলোয় মরীচিকার দেশের সেই দৃশ্য নিকিতিনের নিজের কাছেই অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। আর মিরিয়াম... মিরিয়ামও তার জীবন থেকে ঝরে পড়েছে, মরীচিকার মতোই মিলিয়ে গেছে।

নিকিতিন চোখ বুঁজে ফেলল। অন্ধকার জানলা, বরফ আর বাইরের ঠাণ্ডা — সবকিছু মিলিয়ে গেল। মনশ্চক্ষে নিকিতিন দেখতে পেল, উজ্জ্বল সাদা দেয়াল, সোনালী আলোয় সবুজ পাতা, কল উচ্ছলিত “আরিক”, হলদে ধুলোর মেঘ... আরেকবার গাড়িগুলো এপাশ ওপাশ দুলে উঠল। ইঞ্জিনের গর্জন। উত্তপ্ত, তরঙ্গায়িত বাতাসে মরীচিকা। রোদে-পোড়া বিরাট উন্মুক্ত সমতলের সেই অলৌকিক মায়াজগতের অস্বচ্ছতার মধ্যে সে স্পষ্ট দেখতে পেল তার প্রিয় মুখটি — জলপাইয়ের মতো ত্বক, সাদা পোষাকের উপর পড়ে আছে কালো বেণী, দীর্ঘ বাদাম আকারের চোখ, ঋজু কালো ভ্রূ, পুরু ঠোঁট...

লাফিয়ে উঠে নিকিতিন সশব্দে আরামকেদারাটা সরিয়ে দিল।

"আমি কী বোকা!" ঘরের ভিতর পায়চারী করতে করতে নির্কিতিন ভাবতে লাগল, "সবকিছু তখনই ওকে বলিনি কেন? এখনও নিশ্চয় বেশি দেরী হয়নি। চিঠি লেখা যেতে পারে, সোজা চলে গেলেও হয়।"

নির্কিতিনের উত্তেজনা বেড়ে উঠল — ব্যাপারটার এখনই একটা সুরাহা করে ফেলতে হয়। সোজা গিয়ে মিরিয়ামকে সব কথা সে বলবে। এক্ষুণি।

নির্কিতিন হাত ছুঁড়তেই ডেস্কের ধারে রাখা ডাইনোসরের কশেরুকার মোটা হাড়টা ছিটকে পড়ে গিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। শান্ত হয়ে হাঁটু গেড়ে টুকরোগুলো নির্কিতিন তুলতে লাগল। ভীষণ লজ্জাও পেয়ে গেল যেন বাইরের কেউ তার এই বিচলিত ভাব দেখে ফেলেছে। চারপাশটা একবার চেয়ে দেখেও নিল সে। ঘরের পরিচিত দৃশ্য আবার তার মনে চেপে বসল। এই তো তার জগৎ, শান্ত, বাস্তব, তৃপ্তিকর, তবে একেক সময় অত্যন্ত সংকীর্ণ। কাচ লাগান ঐ আলমারীটায় রয়েছে প্রাচীন প্রাণিজগতের রত্নাবলী, তাদের নিয়ে কাজকর্ম পড়াশুনো এখনো বাকি রয়েছে...

তাছাড়া রয়েছে সেই বিরাট ধাঁধা — অতীতের ছায়া। তাকে ব্যস্ত রাখার পক্ষে এই তো অনেক। মাস্টারমশাই তো আগেই বলেছেন, যে কাজ সুরু করার ব্যাপারে সে বড়ই মন্থর। মিরিয়ামের বেলাতেও সে অত্যন্ত দেরী করে ফেলেছে। আর্কার্লি পাহাড়ে সেই বাঁশি বাজান ঘাসের উপত্যকায় সে তার সুযোগ হারিয়েছে ... এখন মিরিয়ামকে পাওয়ার জন্য তাকে একাগ্রমনে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে। তবু এই অতীতের ছায়া নিয়ে কাজে অনেক সময় ও উৎসাহ প্রয়োজন। মিরিয়ামও যে তাকে ভালবাসে এবিষয়ে সে অত নিশ্চিত হয় কিসের জোরে? মিরিয়াম তো আর কাউকেও ভালবাসতে পারে?

হঠাৎ তার উত্তেজনা কোথায় উপে গেল, নির্কিতিন আবার বসে পড়ল। খুবই দুঃখের কথা, কিন্তু তবুও উপায় নেই। ধাঁধার সমাধানের কাজে এখন মিরিয়ামকে ত্যাগ করতেই হবে। অজ্ঞেয়কে সে কিছুতেই মেনে নিতে পারবে না। ডাইনোসরের ঐ অশরীরী ছায়ার যে কোন বাস্তব কারণ আছে, সে বিষয়ে সে নিশ্চিত! এই কঠিন কাজ আর অন্ধ কুসংস্কারের কাছে হার মানলে মানুষের বুদ্ধিশক্তির উপরে আস্থা হারাতে হয়।

কিন্তু নিজের অজ্ঞাতসারেই নিকিতিন মরুভূমির সেই অভিযানের কথাই ভাবতে লাগল। প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় সে মনে করে চলল, বিশেষত শেষদিকে মস্কো ফিরে আসার ঠিক আগের দিনগুলো। প্রকৃতিবিজ্ঞানীর প্রখর স্মরণশক্তির ফলে তার সুবিধাও হল।

মনে পড়ল সেই দিনটির কথা। বহু দূরের এক সহরের হোটেলে সে তার গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছে। একটা চওড়া ডিভানে সে শুয়ে। দক্ষিণের সূর্যালোকে ভেসে যাওয়া রাস্তার দিকে মুখ করা জানলার খড়খড়িগুলো বন্ধ। একটিমাত্র সরু আলোর রেখা ছুরির মতো এসে বিঁধেছে প্রায়ান্ধকার ঘরটাকে।

জানলার উল্টোদিকের দেয়ালে একটা আলোর চমক নিকিতিনের চোখে পড়ে। কাছ থেকে ভালভাবে নজর করে দেখে একটা ছোট্ট ছবি পড়েছে। রাস্তার একটা উল্টো ছবি। নিষ্পত্র পপলার ডাল, নতুন চালওয়ালা একটা নিচু বাড়ি। একটা লোহার গেটের রেলিং, আর একজন অদ্ভুত বেঁটেখাট মানুষ বাতাসে তার গাউনের প্রান্তটা উড়িয়ে হেঁটে চলেছে...

এক ঝলক খোলা বাতাসের মতো একটা কথা নিকিতিনের মাথায় এসে গেল—আর্কার্লি পাহাড়ে ঘেরা সেই বিচ্ছিন্ন ছোট্ট উপত্যকা, সংকীর্ণ অলিন্দটি একটা বিস্তৃত সমতলে গিয়ে পড়েছে আর তার ঠিক সামনেই রজনের আয়নাটা... মস্ত এক ক্যামেরা, তার ফোকাস সহজেই নির্দেশ করা যায়! ছায়াটা কী করে পড়ল তা সে আগেই বুঝতে পেরেছে। কিন্তু সেটা কেমন করে স্থায়ী হল, আলো ছায়ার আকস্মিক খেলা এত শতাব্দী পরেও কেমন করে রয়ে গেল সেটাই সে বুঝতে পারছে না। ফোটোগ্রাফি নিয়ে সে পড়াশুনো করছে কিন্তু এখনো কোন ফল পায়নি।

দাঁড়াও! নিকিতিন লাফিয়ে উঠে ঘরের মধ্যে পায়চারী করতে লাগল। সেই ছায়াটা ছিল রঙিন! রঙিন ফোটোগ্রাফি নিয়েই তবে পড়াশুনো করতে হয়!

পরের দিন নিকিতিন বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক ঘুচিয়ে একটা মোটা বই নিয়ে পড়ল। রঙের তত্ত্ব আর মানুষের চোখের দৃষ্টির বিশ্লেষণ শেষ করে সে শেষ পরিচ্ছেদটায় এসে দেখল লেখা রয়েছে, “রঙিন

ফোটোগ্রাফির বিশেষ পদ্ধতি"। গত শতাব্দীর ত্রিশের ঘরে লুই দাগুয়েরকে লেখা জোসেফ নিয়েপ্‌চের এই চিঠিটি তাতে তুলে দেওয়া আছে:

"...দেখা গেল আলোর প্রক্রিয়া অনুসারে প্লেটের ইমালসনও (এস্‌ফল্ট রজন) বদলে যায়। ফিকে হয়ে আসা আলোয় স্লাইডের ছবির মতো ছবি দেখা দেয়, রঙের প্রতিটি বর্ণালীও পরিষ্কার ফুটে ওঠে।"

নিকিতিনের মুখ দিয়ে একটা চাপা চীৎকার বেরিয়ে এল। তাড়াতাড়ি সে দুহাত দিয়ে তার কপাল চেপে ধরল, যেন হঠাৎ যে কথাটা তার মাথায় এসেছে সেটাকে বন্ধ করে রাখতে চায়।

"উপর থেকে পড়া আলোয় নির্দিষ্ট কোণ থেকে যখন প্রাপ্ত ছবিটিকে পরীক্ষা করে দেখা হল, একটা অত্যন্ত সুন্দর আর কৌতূহলোদ্দীপক দৃশ্য চোখে পড়ল। এই ঘটনাটাকে রঙিন চক্রের প্রভাব সম্পর্কে নিউটনের মতবাদের সঙ্গে যুক্ত করা উচিত। রজনের উপর বর্ণালীর নির্দিষ্ট কোন অংশের ক্রিয়া সম্ভব, তার ফলে স্তরের ঘনত্বের সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটে থাকে ..."

ডাইনোসরের অশরীরী ছায়ার ব্যাখ্যার দুর্মূল্য সূত্র এইভাবে জট খুলে এগিয়ে চলল। আরম্ভে যা ছিল ক্ষীণ ও পল্‌কা, সেটাই ক্রমে আরো শক্ত আর নির্ভরযোগ্য হয়ে উঠল।

পড়তে পড়তে নিকিতিন আবিষ্কার করল, স্থায়ী আলোক তরঙ্গের প্রক্রিয়ায় ফোটোগ্রাফিক প্লেটের মসৃণ গায়ে বদল ঘটে। এই তরঙ্গগুলি নির্দিষ্ট রঙিন ছবি সৃষ্টি করে। সিলভার ব্রমাইড্‌ লাগান ফোটোগ্রাফিক প্লেটে আলোর রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলে সাধারণত সাদাকালোয় যে ছবি ফুটে ওঠে তা থেকে তার এই ছবি স্বতন্ত্র। আলোক তরঙ্গের এই জটিল প্রতিফলন, তরঙ্গগুলি খুব বড় আকারে বাড়িয়ে দেখলেও অদৃশ্য থেকে যায়। এই প্রতিফলনের ছবির একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য আছে — এরা কেবল একটি নির্দিষ্ট রঙের আলোই প্রতিফলিত করে। তাও যখন প্রোটোটাইপটিতে বিশেষভাবে নির্দিষ্ট কোণ থেকে আলো এসে পড়ে। এই সব ছায়া মিলেমিশে স্বাভাবিক রঙের একটি চমৎকার ছবি পাওয়া যায়।

নিকিতিন বুঝতে পারল, স্বাভাবিক অবস্থায় বিশেষ বস্তুর উপর আলোর সরাসরি প্রক্রিয়া সম্ভব। এ অবস্থায় আলো রূপের সংহতি ভেঙে না ফেলেও

ছবি রচনা করতে পারে। নির্কিতিনের চিন্তাধারায় ঠিক এই ফাঁকটাই থেকে গিয়েছিল।

বাড়ির চাল থেকে বরফ গলে ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরে পড়ছে। নির্কিতিন প্রায় দৌড়েই তার ইনস্টিটিউটে চলে গেল। গত তিন মাস বৃথা যায়নি। তার পথ এখন পরিষ্কার হয়ে উঠেছে — যে দক্ষ দৃষ্টিবিদ, পদার্থবিদ আর ফোটোগ্রাফাররা তাকে সাহায্য করেছেন তাঁদের ধন্যবাদ। আজ সে এই প্রথম বৈজ্ঞানিকদের কাছে এই সংবাদ প্রকাশ করবে।

বক্তৃতার বিষয় আর নির্কিতিনের নাম দেখে অনেক শ্রোতা জুটেছে। তরুণ জীবাশ্মবিদ নির্কিতিন যখন ডাইনোসরের অশরীরী ছায়ার কথা জানাল শ্রোতাদের মুখে তখন অবিশ্বাসের হাসি ফুটে উঠল, কিছুটা মজারও। নির্কিতিনের ভুরু কুঁচকে গেল কিন্তু তবু সে ধীরে ধীরে স্পষ্ট করে তার যা বক্তব্য বলে যেতে লাগল:

"প্রস্তরীভূত রজনের সেই সদ্য কাটা স্তর, মনে হয়, ক্রেটাকিয়াস পর্বের ইতিহাসের একটি মুহূর্তের আলোক ছায়া ধরে রেখেছে। কালো আয়নাটা একটি নির্দিষ্ট কোণ থেকে প্রজেক্টরের মতো আলোকরশ্মি প্রতিফলিত করেছে। তার ফলে মরীচিকা সৃষ্টি করতে পারে এমন বায়ু তরঙ্গে জ্যান্ত ডাইনোসরের খাড়া বিরাট ছবি ফুটে উঠেছে।

"রজনের উপর আলোকছায়া ফুটিয়ে তুলতে যে দীর্ঘ এক্সপোজারের প্রয়োজন হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এও হতে পারে, সে যুগের গ্রীষ্মপ্রধান আবহাওয়ায় সূর্যের আলোকক্ষমতা আরো বেশি ছিল; কিম্বা ডাইনোসররাও আধুনিক কালের বড় বড় সরীসৃপ — কুমীর, কচ্ছপ, সাপ আর বড় গিরগিটির মতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকত। সরীসৃপরা স্তন্যপায়ী জন্তুদের মতো এত চটপটে নয়, তাদের প্রাণশক্তিও তুলনায় কম। এই সম্ভাবনাটা শুধু তত্ত্বীয় নয়, আমাদের ডাইনোসরই তা প্রমাণ করেছে।

"আমার হিসাব অনুযায়ী দুটো পাহাড়ে স্তম্ভের তল থেকে, সাড়ে চারশ ফুট দূর থেকে, ডাইনোসরটার ছবি তোলা হয়েছে, মানে ছবি উঠেছে।"

বোর্ডের উপর লাগান ঐ অঞ্চলের বিরাট ম্যাপটা দেখিয়ে নিকিতিন বলল:

"জোর আলো, মেঘের খেলা, বা অন্য কোন উপায়ে পাওয়া এই ছবি বোধহয় সঙ্গে সঙ্গেই রজনের পরবর্তী স্তরে চাপা পড়ে গিয়ে সংরক্ষিত থেকে যায়। জলাশয়ে বিস্ফোরণ ঘটানর ফলে উপরের স্তরগুলো খসে গিয়ে ছবিটা বেরিয়ে পড়ে।"

নিজের উত্তেজনাকে প্রশমিত করার জন্য নিকিতিন একটু থেমে আবার বলে চলল:

"মানবজাতির ইতিহাসে এই প্রথম অল্প কয়েকজন লোক প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর সজীব চিত্র দেখতে পেল, এ ঘটনাটা খুব উল্লেখযোগ্য হলেও, শেষ পর্যন্ত দেখা যায় এটাই সবচেয়ে বড় কথা নয়। আসল কথা হল যে ওরোজেনিক বস্তুতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের ফোটোর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। সেই অতীতের ছায়া কোটি কোটি বছর ধরে, সত্যি সত্যিই স্মৃতির অতীতকাল পার হয়ে আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে। এদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানতাম না। কখনো এদের খোঁজও করিনি, কারণ প্রকৃতি যে নিজেই ফোটো তুলে রাখতে সক্ষম একথা কারো মাথায় আসেনি।

"এই সুপ্রাচীন ফোটোগ্রাফের উপযোগী যে পরিবেশ বা অবস্থার প্রয়োজন তা অত্যন্ত জটিল ও দুর্লভ। তাই এই ছবিও অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। কিন্তু অতীতের অনন্ত যাত্রায় বেশ কিছু ছবিই নিশ্চয় সঞ্চিত হয়েছে। একথা তো আমরা জানিই জীবাশ্ম সংক্রান্ত যা কিছু আমরা পেয়েছি তা সবই দুর্লভ অবস্থাসংযোগেরই ফল। কিন্তু তবু লুপ্ত প্রাণী সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান বেশ ব্যাপক, জীবাশ্মবিদ্যা সংক্রান্ত অনুসন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টান্তের সংখ্যাও ক্রমশ বেড়ে চলেছে।

"শুধু যে এস্‌ফল্ট রজনেই আলোকছায়া ধরা পড়েছে তা নিশ্চয়ই নয়। লিমোনাইট, ম্যাংগানিজ অক্সাইড এবং অন্যান্য সাধারণ ধাতুর আকরেও এই ছায়া পাওয়া যেতে পারে। বর্ণবিকার পদ্ধতির ফোটোগ্রাফি, যাতে কয়েকটি অস্থায়ী রংকে নষ্ট করে ফেলে আলো নতুন রং জুগিয়ে দেয়, বহুকাল ধরেই আমাদের জানা। দূর অতীতের এই সব ছবি আমরা কোথায় খুঁজব? বহিরাগত আকরের স্তরে, বা অত্যন্ত অগভীর জলাশয়ে, স্তরবিন্যাস যেখানে খুব দ্রুত

ঘটেছে। সবচেয়ে সম্ভাব্য জায়গার স্তরগুলো সযত্নে তুলে ফেলতে হবে। বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে আলোকছায়া ধরতে হবে। এই সব ছবি ধরে রাখার কাজ আমাদের শিখতে হবে।

“শেষকালে, একথাও মনে রাখতে হবে যে প্রকৃতি আলোর সাহায্য ছাড়াও নিজের অনেক ফোটো তুলেছে। আপনারা জানেন অনেক সময় বিদ্যুত চমকের ফলে কাঠের বোর্ড, কাচ এমনকি লোকের গায়ের চামড়ায়ও পারিপার্শ্বিক দৃশ্যের ছাপ পড়েছে। এ ঘটনার ভাল ব্যাখ্যা বিজ্ঞান এখনো দিতে পারেনি। ইলেক্‌ট্রিসিটির ডিসচার্জের ফলেও যে এরকম ছবি ফুটে উঠতে পারে সে সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। রেডিয়ামের বিচ্ছুরণের মতো অদৃশ্য রেডিয়েশনের ফলে এই ডিস্‌চার্জ সম্ভব হতে পারে।

“একবার যদি আমরা ভাল করে ধারণা করতে পারি কী আমাদের খুঁজতে হবে, তবে কোথায় খুঁজতে হবে তা ঠিক ধরতে পারা যাবে। আমাদের খোঁজাও সফল হবে।”

বক্তৃতা শেষ হল। নিকিতিনের পর যারা বলল, তারা নিকিতিনের সিদ্ধান্তে সরাসরি অবিশ্বাস প্রকাশ করল। একজন বিখ্যাত ভূবিজ্ঞানী তো নিকিতিনের বক্তৃতাকে বললেন অত্যন্ত কল্পনাপ্রবণ কিন্তু বিজ্ঞানের দিক দিয়ে একেবারেই মূল্যহীন “জীবাশ্মরোমন্যাস” মাত্র। কিন্তু এই সব সমালোচনায় নিকিতিন একটুও বিচলিত হল না। এরপর তাকে কী করতে হবে তা সে জানে।

বড় হলঘরটার প্রবেশপথে নিকিতিন দাঁড়িয়ে পড়ল। লোহা পেটার আওয়াজে ঘর ভরে গেছে। মুখোমুখি বসান দুটো কাচের কেসে একজোড়া বেঁটে সরীসৃপ কালো দাঁত বের করে বীভৎস হাসি হাসছে। আরো দূরে মেঝের উপর পড়ে আছে লোহার বীম, নল, বল্টু, যন্ত্রপাতি। ঘরের মাঝখানে দুটো আড়ভাবে বসান লোহার বীম। তাতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে দুটো লম্বা খুঁটি — টিরানোসরের কঙ্কালের প্রধান স্ট্যানশিয়ন বা অবলম্বন। এদের একটাতে এরমধ্যেই একটা জটিল লোহার ফ্রেম লাগান হয়েছে। দুজন ল্যাবরেটরী কর্মী সযত্নে তাতে টিরানোসরের পিছনের পায়ের বিরাট হাড়গুলো জোড়া দিচ্ছে। কঙ্কালটার উপর দিয়ে চলে যাওয়া নলগুলোর দিকে নিকিতিন

একবার তাকাল। টিরানোসরের তিরাশিটা কশেরুকার বদলে এখনো তাতে শুধু তামার আংটা লাগান রয়েছে।

অন্য স্ট্যানশিয়নটার কাছে একটা মস্তবড় বল্টু আঁটবার স্প্যানার নিয়ে মার্তিন মার্তিনভিচ নড়বড়ে মইয়ের উপর দাঁড়িয়ে। তার গোমড়ামুখ, হাড় জিরজিরে সঙ্গীটি একটা লম্বা নল নিয়ে মই বেয়ে উঠছে। তারও পরনে সুতির জোব্বা।

'সাবধান!' নিকিতিন চেঁচিয়ে উঠল, 'ওতে হবে না! ভারাটা টেনে আনতে বুঝি কুঁড়েমি লাগছে?'

'শুধু শুধু সময় নষ্ট করে কী হবে, সের্গেই পাভলভিচ!' মার্তিন মার্তিনভিচ উপর থেকে সানন্দে বলে উঠল, 'এতে আমাদের কিচ্ছু হবে না!'

নিকিতিন হেসে কাঁধ ঝাঁকাল। গোমড়ামুখ সহকর্মীটি স্ট্যানশিয়নের শেষে উপরের টীতে নল বসাল। মার্তিন মার্তিনভিচ স্প্যানার দিয়ে নলটা জোরে এঁটে দিল। নলটা — টিরানোসরের মস্ত মাথাটা ওতে বসাবার কথা — একপাশে ঘুরে গিয়ে গোমড়ামুখ সহকর্মীটিকে এক ধাক্কা মারল। সে গিয়ে আবার পড়ল মইয়ের সবচেয়ে উঁচু সরু রানে মার্তিন মার্তিনভিচের উপর। তারপরে দুজনেই একসঙ্গে ডিগবাজী খেয়ে পড়ল মেঝেয়। মাটিতে ছিটকে পড়া লোহার নলগুলোর আওয়াজে ডুবে গেল ওদের চীৎকার আর কাচ ভাঙার শব্দ।

মার্তিন মার্তিনভিচ দাঁড়িয়ে উঠে সক্ষোভে টাকের উপর সদ্য গজান আবটায় হাত বোলাতে লাগল।

'এ তো তোমার কাছে কিছুই না,' একটু রেগেই বলল নিকিতিন।

'নিশ্চয়ই!' মার্তিন মার্তিনভিচ কিছুতেই দমবার পাত্র নয়, 'আর কেউ হলে জন্মের মতো তাকে পঙ্গু হয়ে থাকতে হত। এখন তো কেবল কতগুলো ভাঙা কাচ এর সাক্ষী রইল, তাও প্লেট-গ্লাস নয়। ওহে এস, এবার ভারাটাই নিয়ে যাওয়া যাক।' সোজাসুজি বলে ফেলল মার্তিন মার্তিনভিচ।

নিকিতিনও তার জোব্বাটা পরে নিয়ে ওদের সঙ্গে হাত লাগাল। লোহার কাঠামো তৈরী করা আর সাময়িকভাবে হাড়গুলো জোড়া লাগান হচ্ছে সবচেয়ে সময়সাপেক্ষ কাজ। তবে সে কাজ এর মধ্যেই শেষ হয়ে গেছে। শরীরটা তৈরী। পরবর্তী কাজ হচ্ছে জোড়া লাগিয়ে আংটা, কড়া আর বল্টুগুলোতে ভারী

হাড়গুলো লাগান। তাতেও বেশ কয় মাস লাগল। ল্যাবরেটরীতে হাড়ের মাটিগুলো পরিষ্কার করা হয়েছে। ভাঙা অংশগুলোকে আঠা দিয়ে জুড়ে দেওয়া। যে অংশগুলো পাওয়া যায়নি কাঠ আর জিপসাম দিয়ে তাদের জায়গা পূরণ করা হয়েছে।

কাঠামোটা বেশ ভালভাবেই তৈরী। কঙ্কালটা বসানর সময় যে ভুল শোধরাতে হয়েছে, তার সংখ্যা বেশি নয়। বৈজ্ঞানিক আর ল্যাবরেটরীর কর্মীরা সানন্দে বহুরাত পর্যন্ত খেটে চলেছে। আর্কালির্ পাহাড়ে জন্তুটার যে ছবি তারা দেখেছে সেই নিদর্শন অনুসারে কঙ্কালটাকে গড়ে তুলতে তারা বদ্ধপরিকর।

একসপ্তাহের মধ্যেই কাজ শেষ হয়ে গেল। টিরানোসরের কঙ্কালটা খাড়া হয়ে দাঁড়াল। শিকারী পাখির পায়ের মতো তার পিছনের পাদুটো চলতে গিয়ে যেন থেমে গেছে। বহু পিছনে লম্বা সোজা ল্যাজ। বিরাট ফাঁকা খুলিটা আঠার ফুট উঁচুতে উঠে। তার আধখোলা চোয়াল আর ফাঁক ফাঁক খসখসে দাঁতগুলো দেখে মনে হচ্ছে যেন একটা বিরাট করাতকে সূক্ষ্মকোণে বেঁকিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কঙ্কালটা দাঁড়িয়ে আছে বড় পিয়ানোর ডালার মতো চকচকে পালিশ করা কালো ওককাঠের পাটার উপর।

লম্বা বাঁকা জানালা দিয়ে অস্তসূর্যের তেরচা আলো এসে পড়েছে কাচের কেসগুলোর গায়ে আর পালিশ করা কালো ভিতগুলোয়। কাচের কেসের পাশে দাঁড়িয়ে নিকিতিন ভাল করে দেখতে লাগল শারীরস্থানের কঠোর নিয়মের এতটুকু ব্যতিক্রম কোথাও অজান্তে রয়ে গেছে কিনা।

না, সবকিছুই নিখুঁৎ মনে হচ্ছে। ডাইনোসরদের সমাধিক্ষেত্র থেকে আনা এই দৈত্যটাকে এবার হাজার হাজার লোকের সামনে তুলে ধরা হবে। মিউজিয়মে শীগ্‌গিরি শিংওয়ালা, বর্ম আঁটা ডাইনোসরের কঙ্কাল চালান দেওয়া হবে। তাদের শরীর এরমধ্যেই তৈরী হয়ে গেছে। এই অভিযানে সত্যিই চমৎকার কাজ হয়েছে।

কালো কাঠের পাটায় সূর্যের আলো দেখে আর্কালির্ পাহাড়ের সেই রজন আয়নার কথা নিকিতিনের মনে পড়ে গেল। যে টিরানোসরের ছবি তারা দেখেছিল সে ছবি তার মনে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে আঁকা রয়েছে। কঙ্কালটাকে

ঠিক তার ভঙ্গীতেই দাঁড় করান হয়েছে। ভঙ্গীটা অত্যন্ত স্বাভাবিক, সজীব — অন্য মিউজিয়মের ডাইনোসরের মতো নয়।

"আমার শ্রদ্ধেয় সহকর্মীরা যদি জানতেন অন্য কোন ভাবে না করে এই ভাবেই কঙ্কালটাকে দাঁড় করালাম কেন," মনে মনে হেসে নিকিতিন বলল।

আবার তার চিন্তা কম্পাসের কাঁটার মতো টিরানোসরের ছায়ার দিকে ঘুরে গেল। সে ছায়া তার কাছে আর অজ্ঞেয় রহস্য নয়। অশরীরী ছায়া এখন বৈজ্ঞানিকদের ব্যাখ্যার অধীন বাস্তব ঘটনায় পরিণত হয়েছে। তার মন আর রহস্যের ভারে পীড়িত নয়, প্রকৃতির দুর্ভেদ্য গোপন কথার সামনে বিরক্তি ও রাগের অনুভূতিতে ক্লিষ্ট নয়। তার চিন্তা পৌঁছেছে এক শান্ত গভীরতায়।

নিকিতিন ভাল করেই জানে, যতক্ষণ না সে অতীতের আলোক চিত্রের অস্তিত্ব প্রমাণ করে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ তার অনুসন্ধানে যোগ দেবে না। খুব সম্ভব টাকা পয়সার অসুবিধাতেও পড়তে হবে, সময়েরও অভাব দেখা দেবে— ব্যাপারটাকে তার প্রধান কাজের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। সে এক বিরাট কাজ।

তাছাড়া ভূবিদ্যার সাক্ষীও তার বিরুদ্ধে যায়। পাললিক শিলা সৃষ্টিতে, তার মানে আলোকচিত্রের পক্ষে সংবেদশীল সঞ্চয়ের সৃষ্টিতে দ্রুত স্তরবিন্যাস খুবই দুর্লভ ব্যাপার। হ্রদ বা সমুদ্রের বেলায় নয় বিশেষ করে ভূত্বকের বেলায় একথা অত্যন্ত সত্যি! আলোর পরবর্তী প্রক্রিয়াকে অসম্ভব করে তুলতে পারে এরকম গতিবেগে সৃষ্ট সঞ্চয় তাকে খুঁজতে হবে। তার সঙ্গে আবার ক্যামেরা অব্‌সক্যুরার কিছু পরিমাণ মিল থাকা চাই। তার মানে স্তরের উপরের ত্বকে বিক্ষিপ্ত আলো পড়লে চলবে না, আলোকছবি পড়া চাই।

ঘনীভবন, কেলাসন প্রভৃতি পাললিক শিলার আরো নানারকম রাসায়নিক পরিবর্তনের সময় এরকম কত ছবি নষ্ট হয়ে গিয়েছে!

কোটি কোটি স্তরবিন্যাসের মধ্যে যে একটিতে এই ছবি লুকিয়ে রয়েছে সেটিকে এখন নিকিতিন খুঁজে বের করে কী করে। কালের এই গভীরতা তবে কি দুর্লঙ্ঘ্যই থেকে যাবে?

না, কালের সেই অনন্ত স্বরূপই একাজের সহায় হবে। হয়ত এরকম একটা ঘটনা ঘটতে হাজার বছর লাগে। কোটি কোটি বছর যখন পার হয়ে গেছে তখন এ সম্ভাবনাও কোটি গুণ বেড়ে গেছে। তবে তা নিশ্চয়ই

অনুসন্ধানের ফলে ধরা পড়বে! পৃথিবীর বিরাট আকারের ফলে সে সুযোগ আরো বেড়ে উঠবে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের আয়তন হচ্ছে কোটি কোটি স্কোয়ার ফুট। নানা রকম অবস্থায় গঠিত বিচিত্র ধরনের শিলা নিয়ে গড়ে উঠেছে এই রাজ্যের মাটি। এরকম বিরাট আয়তনে কাজ করার সময় দৃষ্টির সংকীর্ণতা দূর করা চাই। "আমার দেশ রয়েছে আমার এই অনুসন্ধানের সহায়", নিকিতিন ভাবল, "আর কোথায় এই বিরাট ব্যাপক ভূমি পাব?"

এক নতুন সাহস আর নতুন আবিষ্কারের তৃষ্ণা নিকিতিনের মনে দেখা দিল।

শিলাস্তর থেকে প্রতিফলিত আলো ধরতে পারে এরকম একটা যন্ত্র তাকে তৈরী করতে হবে। অসীম আলোক শক্তি বিশিষ্ট একটা ক্যামেরা আর বিস্তৃত কোণ লেন্‌স্‌। প্রতিফলনের কোণটা নির্ভুলভাবে ধরতে পারা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কাজ। একটা রিভল্‌ভিং প্রিজ্‌ম্‌?

টিরানোসরটার দিকে আর একবারও না তাকিয়ে নিকিতিন তাড়াতাড়ি তার পড়ার ঘরে চলে গেল।

'ওটা ভুল পথ, কমরেড অধ্যাপক,' দাড়িওয়ালা, কঠোর মুখ যৌথখামারীটি নিকিতিনকে ডেকে বলল, 'ওটা ঘোড়ার পথ। আমাদের পথ ঐ খাদটায় গিয়ে পড়েছে।'

'লাল পাহাড়ে কখন পেঁছব?' নিকিতিনের সহকারীদের একজন বলল।

'খাদটা ধরে আধমাইল গেলে নদীতে পড়বে। নদীর তীর ধরে তারপর আরো তিন মাইল যেতে হবে,' পথপ্রদর্শক বাড়তি কথার মানুষ নয়।

সরু পথটা বড় বড় ঘন ফারগাছের ছায়ায় ঢাকা। মাঝে মাঝে তাদের ধূসর-সবুজ কাণ্ড আর শ্যাওলা ঢাকা নিচের ডালগুলোর ফাঁক দিয়ে অনেক নিচে নদী ভাঙা কাচের টুকরোর মতো চমকে উঠছে। বাতাসে ফারের রজনের মিষ্টি গন্ধ। সে গন্ধ পাইনের চেয়েও মৃদু আর মিষ্টি। এল্ডারে ভরা খাদটাকে দেখে মনে হয় যেন ঝরে পড়া খয়েরী পাতার গালিচার ঘন আস্তরে ঢাকা লম্বা একটা সুড়ঙ্গ। নিকিতিনরা যত এগল পাতাগুলো ততই কালো আর ভেজা ভেজা হয়ে উঠল। কিছু পরেই পায়ের নিচে জলের আওয়াজ শোনা

গেল। তারপর খাদ শেষ হল। অভিযাত্রীরা এসে পড়ল একটা খরস্রোত ঠান্ডা নদীর উঁচু খাড়া তীরে। নদীটা প্রতি বাঁকে সূর্যের আলোয় চমকাচ্ছে। কিন্তু তার খরস্রোত ছায়ায় ঢাকা, অন্ধকার আর বিপজ্জনক। কিছু দূরেই দেখা যাচ্ছে ঘন লাল মাটির পাহাড়, চূড়ার কাছটা সবুজ।

কিছুক্ষণ পরেই অভিযাত্রীদের ছোট্ট দলটা লাল পাহাড়ের কাছে গিয়ে পেঁছিল। মজুররা সঙ্গে সঙ্গে লেগে গেল কাজে। তাদের শক্তহাতে কোদাল আর গাঁইতির দ্রুত ওঠাপড়ার দিকে তাল রেখে তাকিয়ে থাকা অসম্ভব। ছোট ছোট মাটির চাপড়া নদীর উপর দ্রুত পড়ে চলেছে। কিছুক্ষণ পরেই একটা চকচকে মসৃণ স্তর সযত্নে কেটে বের করা হল। স্তরটা কোণা করে কাটা। একটা মাচার মতো তৈরী করে তার উপর নির্কিতিন ক্যামেরাটাকে বসাল। মজুরদের কাজ শেষ হয়ে যাওয়াতে তারা চলে গেল জিরতে। নির্কিতিনের সহকারীরাও বেরিয়ে পড়ল বঁড়শী নিয়ে। নির্কিতিন একা।

ঘণ্টার পর ঘণ্টা পেরিয়ে যায়। কখনো কখনো মিনিট দুয়েকের জন্য নির্কিতিন তার ক্লান্ত চোখদুটোকে বন্ধ করে ফেলে। সে অত্যন্ত ধীরস্থির শান্ত। কারণ তার এই প্রতীক্ষার এতটুকু সফলতাও সে আশা করে না। অনেকবার অনেক জায়গায় ক্যামেরা বসিয়ে শূন্য স্তরগুলোর দিকে চরম উৎকণ্ঠার সঙ্গে তাকিয়ে থেকেছে। তারপর তার উত্তেজনা কমে এসেছে, ক্রমশ সে আশাও হারিয়েছে। কিন্তু তবু সে নানা সম্ভাব্য জায়গায় অনুসন্ধান করেছে। এখনো কর্তব্য সম্বন্ধে নিজেকে সচেতন করে জোর করে এ কাজে সে নিজেকে লাগিয়ে রেখেছে।

ক্যামেরার ভিতর দিয়ে নির্কিতিন শক্ত লাল মাটির দিকে চেয়ে রইল। সূর্য ধীরে ধীরে জায়গা বদল করল। বড় বড় ফারগাছগুলো মাথা নোয়াল। তীরের নলখাগড়ার ঝোপের ভিতর দিয়ে মৃদু কলস্বরে বয়ে গেল জল।

হঠাৎ একঘেয়ে ত্বকের বুকে কয়েকটি কালো ছোপ দেখা দিল। ছোপগুলো সংখ্যায় বেড়ে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল। পাগলের মতো রিভল্‌ভিং প্রিজ্‌মের সাহায্যে প্রতিফলনের কোণটাকে ঠিক করতে করতে নির্কিতিন ছবিটাকে তার ফোকাসে এনে ফেলল।

দেখতে পেল ঈষৎ স্বচ্ছ আলোয় ভরা সবুজ সমুদ্রের রোদে ধোওয়া উপকূল। রুপোলি-সাদা বালির প্রায় সম্পূর্ণ মসৃণ তট ধীরে ধীরে দৃষ্টির

অলক্ষ্যে মিশে গেছে পান্না রং জলে। ছোট ছোট নীলচে সবুজ ঢেউ'এর রেখা, তাদের মাথায় সোজা, লম্বা সাদা চূড়া। সমুদ্রের ভিতরে রেখা ত্রিভুজের সৃষ্টি করেছে, চূড়াগুলো সাদা আর রুপোলি ফেনার চমক তুলে ভিতর দিকে বেঁকে গেছে। দিগন্তের রং হালকা নীল। ছবিটা দেখে মনে হল বাতাসটা অত্যন্ত স্বচ্ছ আর আলোটাও অসাধারণ রকম পরিষ্কার।

অদ্ভুত বিস্ময়ের সঙ্গে নির্কিতিন সেই বর্ণনাতীত উজ্জ্বল আর শান্ত জগতের দিকে চেয়ে রইল। নির্কিতিন জানে ঐ ঢেউগুলো যে সূর্যের আলোয় শান্ত হয়ে রয়েছে সে আলো ৪০,০০,০০,০০০ বছর আগেকার। সিলুরীয় পর্বের এক সমুদ্রতীরের দিকে নির্কিতিন চেয়ে আছে...

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সূর্যের আলোর পরিবর্তনের ফলে ছবিটা অদৃশ্য হয়ে গেল। এই অলৌকিক ছবির ফোটো তুলে রাখার সুযোগ নির্কিতিন হারাল।

নির্কিতিন ঠিক করল সারা রাত সে মাচার নিচে তার ক্যামেরা নিয়ে কাটাবে। আসছে কাল ঠিক এই সময়েই সূর্যালোকে আবার ফুটে উঠবে এই অশরীরী ছায়া।

কিন্তু সারা রাত মাচার নিচে বসে স্যাঁতসেঁতে রাত্রের ঠাণ্ডায় কাঁপা আর মশার কামড় খাওয়া বৃথাই গেল। উত্তরের গ্রীষ্ম বড় অস্থির — ঠাণ্ডা সকালের শেষে দেখা দিল বৃষ্টি। ঝিরঝিরে কুয়াশায় হতোদ্যম নির্কিতিন দেখল বৃষ্টিতে ভেসে যাচ্ছে সেই মাটির স্তর। সিলুরীয় সমুদ্রের সেই অত্যাশ্চর্য ছবিকে নষ্ট করে বৃষ্টির লাল প্যাচপেচে জলধারা চারিদিকে ছুটোছুটি করে চলেছে।

এ পর্যন্ত দুবার নির্কিতিন অতীতের ছায়া দেখতে পেয়েছে। দ্বিতীয় সুন্দর ছবিটি অল্পের মধ্যেই মিলিয়ে গেল। কিন্তু নির্কিতিন এখন নিশ্চিত যে তার অনুসন্ধান ব্যর্থ হবে না, সে জিতবেই।

সে ঠিক করল গুহার দেয়াল তার মানে প্রাকৃতিক ক্যামেরা অবসক্যুরা নিয়ে এবার সে ভাগ্য পরীক্ষা করবে। সেখানে এই প্রতিচ্ছবি প্রকৃতির মার কিছুটা এড়াতে পারবে, অবশ্য যদি তা সত্যি সত্যিই থাকে। তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে প্রতিচ্ছবির ফোটো তোলায় আগে থেকেই প্রস্তুত থাকার প্রয়োজনীয়তা সে বুঝেছে। এবারের প্রতিচ্ছবিটিকে সে কিছুতেই হাত ফসকাতে দেবে না।

তেলতেলে জলের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে একটা পাৎলা ধূসর কুয়াশা। নদীতীর ঘন শিশিরে উজ্জ্বল। উদয় সূর্যের আলোয় উত্তপ্ত পাহাড়ের খাড়া গা অন্ধকার আর বিষণ্ণ। জবড়জং নৌকোটার ক্যানভাসে ঢাকা ভোঁতা গলুই চওড়া নদীটার মাঝখানের খাড়া উঁচু পাথরটার দিকে ঘোরান।

ঠাণ্ডা কনকনে বিরাট নদীটার স্রোত যেমন দ্রুত তেমনি নিঃশব্দ। ভাঁটির দিক থেকে মেঘের ডাকের মতো গম্ভীর আওয়াজ শোনা গেল। নির্কিতিন পাইলটের পাশে হালের কাছে এসে দাঁড়াল। পাইলটের হাতে তখন মোটা হালটা ধরা।

পাইলট একটা বিশ্রী দস্তানা দিয়ে ঠাণ্ডা লাল নাকটা ঘষে নিয়ে নির্কিতিনের দিকে ঝুঁকে ভাঙা গলায় বলল, 'বল্লক্‌তাসের গর্জন। এখানকার নদীপ্রপাত অত্যন্ত বিপজ্জনক।'

'ঐ বাঁকটার ওদিকে?' নির্কিতিন ধীরে ধীরে জিজ্ঞেস করল।

পাইলট হতাশভাবে মাথা নাড়ল।

নির্কিতিন আবার জিজ্ঞেস করল, 'গুহাটা কি ঐখানেই? ঐ বাঁ তীরে?'

'ঐখানেই নৌকো ভেড়াতে বলছেন?' বেশ চিন্তিতভাবে বলল পাইলট।

'হ্যাঁ। তাছাড়া তো অন্য উপায় নেই, পাহাড়ের জন্য মাটি দিয়ে তো গুহাটায় পেঁছবার উপায় নেই।'

চ্যাপ্টা পেট ভারী নৌকোটা বড় বড় ঢেউয়ে দুলতে লাগল। গলুইয়ের নিচে জলের শব্দ। চারপাশের পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে গর্জনটা ক্রমেই আরো কাছে এসে গেল, আরো জোর হয়ে উঠল। মনে হল যেন মরণোন্মুখ নৌকোটাকে পাথরগুলো পাগলের মতো চেঁচিয়ে সাবধান করে দিচ্ছে।

পাইলটের আদেশে দাঁড়িরা শক্ত হাতে দাঁড় ধরে আছে। নৌকোটা বাঁক ফিরল। নদীটা এখানে একটা সংকীর্ণ গিরিবর্ত্মের ভিতর ঢুকে গেছে। দেড় হাজার ফুট উঁচু বিরাট পাহাড়গুলো নদীটাকে ভীষণভাবে ঘিরে ধরেছে। তার ফলে একটা বড় ত্রিভুজের সৃষ্টি হয়েছে। তার চূড়া অদৃশ্য হয়ে গেছে গিরিবর্ত্মের পরের বাঁকটায়। ত্রিভুজটার নিচেই বড় পাথরটা দাঁড়িয়ে। তার গায়ে এসে আছড়ে পড়ছে ফেনায়িত ঢেউ। আরো এগিয়ে দাঁতের মতো সারি সারি মাথা তুলে দাঁড়ান পাথর। প্রত্যেকটার চারপাশে ঘূর্ণী স্রোতের মারাত্মক আবর্তন। গিরিবর্ত্মের আরো ভিতরে নদীটা সরু সরু উঁচু ঢেউয়ে ভেঙে

গেছে যেন একপাল সাদা ঘোড়া সরু পথের ভিতর দিয়ে জোর করে এগবার চেষ্টা করছে। ত্রিভুজের বাঁ দিকটা মস্ত একটা গুহার পেট বের-করা দেয়ালের ফলে বিকৃত। গুহাটা নদীর পাথুরে তীরে ঢুকে গেছে। ঐখানেই নদীর প্রধান ধারাটা বিরাট আবর্তের সৃষ্টি করেছে।

দূরবীণটা নামিয়ে রেখে নিকিতিন পাইলটকে সাহায্য করার জন্য দাঁড় ধরল। মাঝখানের বড় পাথরটা ভীষণ গর্জন করে তাদের শাসাচ্ছে। নৌকোটাকে বাধ্য হয়ে বাঁ পাশের বিপজ্জনক পথটা দিয়েই চলতে হচ্ছে। তানাহলে স্রোতের টানে ডান তীরে গিয়ে পড়বে। তারপর গুহায় পেঁছিন যাবে শুধু পরের বছরে। সত্যি বলতে আর তবে পেঁছিনই হবে না কারণ অভিযানের দিন শেষ হয়ে আসছে। বেশ তাড়াহুড়ো করেই ফিরতে হবে।

'আরো জোরে দাঁড় টান!' পাইলট চেঁচিয়ে উঠল।

একটা উঁচু ঢেউয়ের তোড়ে নৌকোটা ছিটকে পড়ল বড় পাথরটা পেরিয়ে ওদিকের অন্ধকার, গভীর গর্তে। তলটা গিয়ে ঠেকল পাথরে। দাঁড়ের ঝাঁকানিতে নিকিতিন আর পাইলট প্রায় ছিটকে পড়েই গিয়েছিল আর কি, কোনরকমে পা দিয়ে চেপে রেখে তারা রক্ষা পেল। নৌকোটা এখন পাশাপাশিভাবে এগিয়ে চলেছে তীরের সেই ভীষণ দাঁতের মতো পাথরগুলোর দিকে। ঢেউ আর ফেনায় মাঝে মাঝে ঢাকা পড়ে নৌকোটা পাগলের মতো দুলে চলেছে।

'দাঁড় বাও! দাঁড় বেয়ে চল!' পাইলট চীৎকার করে চলল।

জলে আর ঘামে নেয়ে উঠে মজুররা আর অভিযাত্রীরা অবাধ্য দাঁড়গুলো প্রাণপণ জোরে টেনে চলেছে। যারা কম অভিজ্ঞ তারা তো ভাবছে যে কোন মুহূর্তে নৌকো উল্টে যাবে। একরোখা দলপতির দিকে তারা কেবল চেয়ে দেখছে। দলপতির কালো দাড়িতে ঢাকা মুখটা অত্যন্ত কঠোর।

দোদুল্যমান নৌকোর পাটায় পাদুটো অনেক ফাঁক করে দাঁড়িয়ে সে তখন সামনের সাদা ফেনার রেখাটার দূরত্ব আঁচ করার চেষ্টা করছে। ঐটেই এই ছিটকে যাওয়া স্রোতের সীমা। পাইলটও ঠোঁট কামড়ে ঐ দিকেই তাকিয়ে আছে। নৌকোটা থেমে গিয়ে সোজা ফেনার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সবার মন ভীষণ দমে গেল — যে কোন মুহূর্তেই নৌকোটা পাথরে লেগে তছনছ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আবার তার গতিবেগ কমে এল। পাল্টা স্রোতের

টানে নৌকোটা নিরাপদে এসে পৌঁছল গভীর, কালো জলে। স্ফটিক, ফেল্ড্স্পার আর অভ্রের পাৎলা স্তরযুক্ত খাড়া পাহাড়ের পায়ের কাছে সে জল অলসভঙ্গীতে আছড়ে পড়ছে।

নিকিতিন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। বল্লক্তাস গুহার এই বিপজ্জনক যাত্রা অভিযানের পরিকল্পনায় ছিল না। অতীতের ছায়ার সন্ধানে যদি একটা কিছু দুর্ঘটনা ঘটত তাহলে ... নৌকোটা নরম আওয়াজ করে তীরে এসে ঠেকল। নিকিতিনের সহকারীদের একজন চট করে পাথরের উপর লাফিয়ে পড়ে নোঙরের দড়িটাকে জোরে বেঁধে ফেলল।

'আসাটা বেশ মজারই হল!' রসিকতা করে বলল পাইলট।

'খুব ভাগ্য ভাল, এখানে এসে পৌঁছতে পেরেছি!' নিকিতিন জবাব দিল।

'রুশী গোঁ ছাড়া এখানে আসা সম্ভব হত না!' পাইলট একটা আপ্তবাক্য ছাড়ল।

নৌকোর কাছ থেকে পাহাড়গুলো প্রায় পাঁচশ ফুট উঠে গেছে। তারপর একটা চওড়া বারান্দার মতো সৃষ্টি করে অর্ধচন্দ্রাকারে তীরের উপর দিয়ে চলে গেছে। সেই বারান্দার উপরে পাহাড় আবার ঢালু হয়ে নেমে এসেছে। সেইখানে, পাহাড়ের পায়ের কাছে গুহার ন'টা কালো প্রবেশদ্বার। পাহাড়ের গা বেঁটে, কোঁকড়ান পাইনগাছ আর সাদা বলগা-হরিণ শ্যাওলায় ঢাকা।

প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম সবই অতি সহজেই বারান্দার মতো জায়গাটায় তুলে নিয়ে যাওয়া হল। বাকি দিনটা নিকিতিন গুহার মধ্যেই কাটাল। তার আন্দাজ ঠিক হয়েছে বলে সে খুব খুসি।

গুহাগুলোর পিছনের দেয়ালে সমানভাবে পড়েছে পাৎলা মসৃণ স্তর। ঘন হলদে-সবুজ রং তাদের। নিকিতিনের আশা — ক্রোম আর লোহার লবণ মিশে, আলোর প্রভাবে, এখানে কোয়াটারনারি পর্বের আলোকচিত্র ধরা পড়েছে। তার মানে ষাট হাজার বছর আগেকার ব্যাপার। তখন এখানে গরম জলের ঝর্ণা ছিল, অগ্ন্যুৎপাতও হত।

নিকিতিনের সহকারীরা প্রবেশপথটা পরিষ্কার করে ফেলেছে। তার ফলে পিছনের দেয়ালে একটা গোল আলো এসে পড়েছে। গুহাটা সত্যিই ক্যামেরার ভিতরটার মতো দেখতে।

অসীম যত্ন আর ধৈর্যের সঙ্গে নিকিতিন তার কাজ করে চলেছে। স্তরগুলো সে একটার পর একটা সরিয়ে চলেছে নিজের তৈরী বিশেষ জাতের ম্যাগ্নেসিয়ম বাতির আলোয়। কখনো বাতিটাকে এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে, কখনো বা প্রিজ্‌ম্‌টাকে অন্যভাবে ঠিক করে নিয়ে সে দেয়ালের দিকে গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাকিয়ে আছে। কিন্তু কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

দশটা স্তর এরমধ্যেই পরীক্ষা করে খুলে ফেলা হয়েছে। বাকি স্তরবিন্যাসটা অত্যন্ত পাৎলা। শ্রান্তি ক্লান্তি ভুলে গিয়ে নিকিতিন মরীয়া হয়ে সারারাত ধরে কাজ করেছে। ম্যাগ্নেসিয়ম কম্‌পাউণ্ড দ্রুত কমে আসছে। নিকিতিনের চোখের সামনে সবকিছু দুলতে সুরু করেছে।

এই গ্রীষ্মেও কি কোন ফল পাওয়া যাবে না? অথচ ছায়াছবিকে ধরার জন্য কত ভাল করেই না নিজেকে সে প্রস্তুত করেছে!

আগের স্তরগুলোর চেয়ে এগার নম্বর স্তরটাই নিকিতিনের সবচেয়ে মসৃণ বলে মনে হল। আলো জ্বালিয়ে স্ক্রুটাকে কয়েকবার ঘোরাতে কাচের উপর একটা অস্পষ্ট গোল ছবি দেখা দিল। ডানপাশের ঝাপসা ধূসর আকারটা দেখে মনে হল একটি মানুষ যেন ঝুঁকে পড়েছে, কাঁধে তার আড়ভাবে রাখা অদ্ভুত কী একটা জিনিস। বাঁয়ে শুধু অস্পষ্ট গোল ফোঁটা ... নিকিতিন প্রাণপণে ছবিটাকে তার ফোকাসে আনার চেষ্টা করল। কিন্তু কোনই ফল হল না। সে বেশ বুঝতে পারল এটাও অতীতের ছবি। কিন্তু এতই ঝাপসা যে ফোটো তোলা তো দূরের কথা ছবিটার বর্ণনা দেওয়াও অসম্ভব। ম্যাগ্নেসিয়ম কম্‌পাউণ্ড দিয়ে আলোটাকে সে পুরো জোর করে তুলল। মানুষের ছবি, আর কোন সন্দেহ নেই! এখন সবকিছু নির্ভর করছে আলোর জোরের উপর। ম্যাগ্নেসিয়ম আলোয় সৌর বর্ণালীর একটা অনুকৃতি পাওয়া যায়, কিন্তু তার জোর বড় কম। একমাত্র সূর্যের পক্ষেই তার নিজের সৃষ্ট এই ছায়াকে বাঁচিয়ে তোলা সম্ভব। নিকিতিনের যন্ত্রের সংবেদনশীলতাও বড় কম।

শেষ একবার জ্বলে অতি-উত্তপ্ত বাতিটা নিভে গেল। অন্ধকার গুহায় ধীরে ধীরে দেখা দিল আলোকিত গোল প্রবেশপথটা ... ভোর হয়ে গেছে! নিকিতিনের স্বভাবসিদ্ধ শান্তভাব আর রইল না। নিষ্ফল রাগে সে ক্যামেরাটার উপর এক ঘুঁষি কষিয়ে দিল।

প্রচণ্ড রাগে হাঁপ ধরান গুহাটা থেকে ছুটে বেরতে গিয়ে গুহামুখে ভীষণ জোর মাথা ঠুকে যাওয়ায় নির্কিতিন হাঁটু গেড়ে পড়ে গেল। সে আঘাতে তার জ্ঞান ফিরে এল, কিন্তু রাগের বশে তখনো সে ফুঁসছে। গুহামুখের কাছের বিরাট বিরাট পাথরগুলোর দিকে সে চোখ কুঁচকে তাকিয়ে রইল। তার বাতি তাকে হতাশ করেছে! ঠিক আছে, সূর্যের আলোর সাহায্যেই সে ছবিটাকে বাঁচিয়ে তুলবে! বিস্ফোরক তার কাছে প্রচুর আছে, স্তর খসাবার জন্য মাঝে মাঝে ওগুলোরও দরকার হয়।

গুহার ছাদের দিকে তাকিয়ে সে কতগুলো লম্বা সোজা ফাটল দেখতে পেল। তাদের ফাটিয়ে দেওয়া অত্যন্ত সহজ ব্যাপার!

তার বন্ধুরা রাত্রের জন্য নদীতীরে ছাউনী ফেলেছে। নির্কিতিন সেদিকেই যেতে যেতে হঠাৎ কী ভেবে ফিরে গেল। গুহার ভিতর এসে তার ম্যাগ্নেসিয়ম বাতির আলোটা কত কোণ করে চুনের স্তরের উপর পড়ছিল সেটা ঠিক করে নিয়ে কম্পাসের দিকে তাকাল। চমৎকার! দুপুর দুটো থেকে তিনটের মধ্যে সূর্যও এই জায়গায় আসবে। ঘুমবার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাবে। ঘুমটা খুবই দরকার! চোখদুটো এতই ক্লান্ত যে সূর্যের আলোয় হয়ত তাকাতেও পারবে না। সকালটাও বেশ আশাপ্রদ মনে হচ্ছে ...

বিস্ফোরণের পর ধুলোটা সরে যেতেই ভাঙা পাথরের উপর ঘুরে ঘুরে নির্কিতিন তার ক্যামেরাটাকে দাঁড় করাতে লেগে গেল। মসৃণ সবুজ দেয়ালটা উজ্জ্বল দিনের আলোয় চকচক করছে। বিস্ফোরণে দেয়ালটার কোন ক্ষতি হয়নি। এবার আর নির্কিতিন বোকার মতো কোন ভুল করবে না — হাতে তার প্লেটহোল্ডারটা ধরা। সূর্যের তৈরী ছবিটা চোখে পড়া মাত্রই সে ফোকাস ঠিক করে ছবি তুলে ফেলবে। সেই ছবিতে প্রমাণ হবে অতীতের ছায়ার অস্তিত্ব। তার এই অনুসন্ধানের মোড় তবে ফিরে যাবে। তখন আর তাকে একা একা এই অনুসন্ধানে ঘুরতে হবে না। বিজ্ঞান বা ইঞ্জিনিয়ারিঙের ক্ষেত্রে নতুন পথনির্মাণের কাজ যাকে একা করতে হয়েছে অনেকের সম্মিলিত প্রচেষ্টার সুবিধার কথা সে ভালভাবেই জানে।

নির্কিতিন তার ঘড়ি দেখল — দুপুর ২টো ২৩। প্রিজ্মের স্ক্রুটা ধরে সে ক্যামেরার উপর ঝুঁকে পড়ল। মিনিটগুলো টিকটিক করে ধীরে ধীরে

বয়ে চলেছে। নির্কিতিন কিন্তু শান্ত আর প্রত্যয়শীল — সে জানে তার প্রতীক্ষা ব্যর্থ হবে না।

সূর্য অত্যন্ত ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। নির্কিতিন তখন চারপাশের সবকিছু ভুলে গেছে ...

ক্রমশঃ ডানদিকের নুয়ে পড়া ধূসর আকারটা রূপ নিল। কাঁধের আড় রেখাটা হচ্ছে লম্বা একটা বর্শা।

লোকটা তার চওড়া কাঁধ গুঁজে বসে। টানটান মাংসপেশীগুলো বেরিয়ে আছে। তার ভাঁজ-পড়া চওড়া মুখটা নির্কিতিনের দিকে পাশ ফেরান। একটা ছোট খাড়া পাহাড়ের পায়ের কাছে সমতল। তার পিছনে বনে ঢাকা টিলা। লোকটা স্থিরদৃষ্টে সেই দিকেই চেয়ে আছে। নির্কিতিন দেখল উঁচু কপালটা ঘন উস্কো-খুস্কো চুলে ঢাকা। গালের হাড়দুটো অত্যন্ত উঁচু। মস্ত জোরাল চোয়াল। চিন্তামগ্ন লোকটার মুখে একটা গভীর উৎকণ্ঠার ভাব। ভাবখানা যেন ভবিষ্যতের দিকে চেয়ে সে কিছু একটা জানতে চাইছে। মুহূর্তের মধ্যে নির্কিতিন এসব কিছু দেখে নিল। ছবিটার প্রতিটি খুঁটিনাটির প্রতি তার অসীম কৌতূহল থাকলেও তার তখন একমুহূর্ত নষ্ট করলে চলবে না। প্লেটহোল্ডারটা জায়গামত লাগিয়ে দিয়ে ছবি তোলার জন্য সে স্লাইডিংপ্যানেলটা ধরে তৈরী হল। কিন্তু তাকে থামতে হল। চকচকে দেয়ালটা নিষ্প্রভ হয়ে চারদিক অন্ধকার হয়ে উঠল। নির্কিতিন ঘুরে দেখল মস্ত একটা মেঘ সূর্যকে ঢেকে ফেলেছে। তার পিছনে পাহাড়ের চূড়া বেয়ে ছুটে আসছে মেঘের দল। অলক্ষুণে লাইলাক রঙে তারা রাঙা — তার মানে শীগ্গির বরফ ঝড় উঠবে।

হতাশ মনে নির্কিতিন আকাশের দিকে চেয়ে রইল। বরফ ঝড় উঠলে পরে এই ছবি সে আর কোনদিন দেখতে পাবে না। অত্যন্ত পাৎলা এই আলোকচিত্র চিরদিনের মতো নষ্ট হয়ে যাবে।

তবু অসম্ভব আশায় বুক বেঁধে নির্কিতিন তার ওয়াটার প্রুফ দিয়ে ক্যামেরাটাকে ঢেকে নিজেকে তাঁবুর দিকে টেনে নিয়ে গেল। ক্যামেরা কাল পর্যন্ত ঐখানেই থাকবে। নতুন বাধা আর আকস্মিক দুর্ঘটনায় নির্কিতিনের শরীর ও মন অসাড় হয়ে পড়ল।

ক্লান্ত, পরাজিত নিকিতিন আসতে তার সঙ্গীরা সবাই চুপ করে গেল। পরেও কথাবার্তা বলে চলল, ফিসফিস করে।

পাহাড়ের গায়ে বাতাসের করুণ আর্তনাদ। প্রথম তুষারের বড় বড় দানাগুলো ঘূর্ণির মতো ঘুরে ঘুরে পড়ছে।

কিছুটা খাঁটি এল্‌কোহল গ্লাসে ঢেলে নিয়ে এক ঢোকে সবটা শেষ করে নিকিতিন তার লোকদের ক্যামেরাটা নামিয়ে আনতে বলল। শুধু যে গুহামানবকে আবার দেখতে পাওয়ার সুযোগটাই নষ্ট হল তা নয় — আর একটুও দেরী না করে এক্ষুণি তাদের ফিরতে হবে। কয়েক ঘণ্টা দেরী করলে জনমানবহীন তাইগায় নৌকোটা বরফে আটকে যেতে পারে।

পরদিন খুব ভোরে, অন্ধকার আকাশের গায়ে পাহাড়ের চূড়াগুলো ফুটে উঠতেই অভিযাত্রীরা ছাউনী তুলে বেরিয়ে পড়ল।

নোঙরের দড়িটা নরম আওয়াজ করে জলে পড়ল। নৌকো ধীরে ধীরে এগতে লাগল প্রধান স্রোতের ফেনা ওঠা সীমার দিকে। হঠাৎ এক ঝটকায়, যেন মস্তবড় একটা থাবার আঘাতে নৌকোটা সাঁ করে ঢুকে গেল সংকীর্ণ গিরিবর্ত্মের ভিতরে। তারপর লাফাতে লাফাতে অদৃশ্য হয়ে গেল বিরাট ঢেউয়ের মাঝখানে।

বই-ভরা ডেস্কের উপর একটা টেবিল-ল্যাম্প গোল আলো ফেলেছে। বিরাট পড়ার ঘরটা অন্ধকার। বিষণ্ণ নিকিতিন চুপ করে বসে।

গত তিন বছর ধরে তার মনে শান্তি নেই... আগেকার কাজটাই তার কাছে এখন অনেক বেশি শান্তির আর ফলপ্রসূ বলে মনে হচ্ছে। তাই সে কাজ আবার তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে সুরু করেছে! কিন্তু পুরনো কাজ আর নতুন কাজের টানে দ্বিধাবিভক্ত নিকিতিন আর একাগ্রচিত্তে পুরনো কাজে নিজেকে ঢেলে দিতে পারে না। পুরনো কাজের প্রতি ছিল তার শুধু কর্তব্যবোধ। তার মনের সব উৎসাহ আর আনন্দ সে ঢেলে দিয়েছে এই নতুন কাজের পায়ে। এ কয় বছরে দুবার সে অতীতকে তার হাতের মুঠোয় পেয়েছিল, দুবার সারা মানবজাতির মধ্যে একা সে অতীতের ছবি দেখতে পেয়েছে।

কিন্তু তবু আর্কার্লি পাহাড়ের সেই অবিস্মরণীয় মুহূর্তটির পর সে তার লক্ষ্যের দিকে একটুও এগতে পারেনি।

পুরনো ভুলের জন্যই তাকে এখন এই দাম দিতে হচ্ছে? না, একাজ একলা মানুষের ক্ষমতার বাইরে...

মাথার উপরের আলোটা জ্বালিয়ে নিকিতিন আলোয় চোখ কুঁচকে তার কাগজপত্র গোছাতে লাগল। হঠাৎ নজর পড়ল আলাদা টেবিলের উপর দাঁড় করান ক্যামেরাটার উপর। বিষণ্ণ হাসি হেসে নিকিতিন মনে মনে ভাবল এত ঘোরাঘুরিতে ক্যামেরাটাও তার মতই জীর্ণক্লান্ত। ক্যামেরাটায় কোনই সাহায্য হয়নি। ঐ মান্ধাতার আমলের যন্ত্র দিয়ে কি কিছু হয় ...

নিকিতিন পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এল। এ ঘরটা গিয়ে পড়েছে মিউজিয়মের অন্ধকার হলঘরটায়। সেখানে যত রাজ্যের শো-কেস আর লুপ্ত প্রাণীর কঙ্কাল। অন্ধকারে নিকিতিন চোখ পিটপিট করতে লাগল। শো-কেসগুলোর ভিতর দিয়ে পথ করে সে যেতে পারে, কিন্তু বাইরে দাঁড় করান শিং আর কঙ্কালের চোয়ালগুলো এদিক ওদিক বেরিয়ে আছে। ভঙ্গুর হাড়গুলোকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে এগতে হবে।

তাই সে অন্ধকারটা সইয়ে নেবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল। কাচের চকচকে গা সে দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু কালো হাড়গুলো মিশে গেছে ঘরজোড়া অন্ধকারে। বহুবছরের অভ্যাসের ফলেই নিকিতিন মিউজিয়মের এই মৃত অধিবাসীদের উপস্থিতি অনুভব করতে পারছে। নিকিতিনের মনে দেখা দিল একটা অদ্ভুত অনুভূতি — মনে হল সারা ঘরটা যেন অদৃশ্য অশরীরী প্রাণীতে ভরা।

মানুষের দৃষ্টিশক্তির দুর্বলতার শ্রাদ্ধ করতে করতে নিকিতিন পথ হাতড়ে এগতে লাগল। ঘরে কী আছে, কোথায় আছে, তা সবই সে জানে, কিন্তু তবু সে কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। এও সেই ছায়াগুলোরই মতো। কঙ্কালগুলো এখানেই আছে কিন্তু তারা অদৃশ্য, কারণ তার চোখে যথেষ্ট আলো নেই...

নিকিতিন হঠাৎ থেমে গেল। উপমাটার একটা গভীরতর মানে তার কাছে ধরা পড়ল। কী বোকা সে! চোখের উপর এতদিন নির্ভর করে থেকেছে। একথাটা সে কী করে ভুলে গেল যে আলোক তরঙ্গের অত্যন্ত ক্ষীণ ছাপ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সবচেয়ে কম পরিমাণ আলো প্রতিফলিত করে। খালি

চোখে তা কখনই ধরা পড়ে না। সেই কারণে কৃত্রিম আলোয় কখনই পরিষ্কার ছবি দেখা যাবে না। কত ক্ষীণ ছবিই না তার অগোচরে থেকে গেছে!

নিকিতিন ভীষণ লজ্জা পেল। বিজ্ঞানী হয়ে সে তার ক্যামেরাটাকে এমন আনাড়ীর মতো তৈরী করেছে! আধুনিক যন্ত্রবিদ্যার বিরাট শক্তিকে সে অজান্তে অবহেলা করেছে। অত্যন্ত স্বল্প পরিমাণ আলো ধরতে সক্ষম এমন যন্ত্রও তো আছে!

ঘরের ভিতর দিয়ে কোন রকমে যেতে যেতে ক্রমশই তার মনে ক্যামেরার নতুন নক্সাটা গড়ে উঠতে লাগল। পদার্থবিদ আর টেক্‌নিশিয়নদের সাহায্য তাকে আবার নিতে হবে। ছবির প্রতিফলিত আলোকে সে আর সরাসরি ধরবে না, ধরবে অত্যন্ত সংবেদনশীল ফোটোসেলের সংযোগের সাহায্যে। আলোকে বিদ্যুতে পরিণত করে তার শক্তি বাড়িয়ে দেবে তারপর রূপান্তরিত করবে দৃশ্য আলোয়।

রঙের যথাযথ প্রতিমুদ্রণে কিছু বেগ পেতে হল কিন্তু সে একটা দুর্লঙ্ঘ্য কিছু নয়। সমোন্নতিরেখাদের বাড়ান যেতে পারে আর সরাসরি প্রতিফলন থেকে রং পাওয়া সম্ভব।

একটা শো-কেসে কাঁধ ঠেকতে নিকিতিন লাফিয়ে সরে গেল। এ নিয়ে আরো ভাবতে হবে, কিন্তু সমস্যাটা সমাধানের সূত্র সে পেয়ে গেছে। "এরকম একটা ক্যামেরা বানাতে পারলে, বাধা অনেকটা দূর হবে," নিকিতিন মনে মনে ভাবল, "খোলা জায়গায় একটা ছাউনী বানিয়ে কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা করব। মাটির নিচে তো ব্যাপারটা আরো সহজ হবে।" হাতটাকে আরো জোরে মুঠো করে সে বলল, "শীগ্‌গিরি অতীতের ছায়াকে আমি এই মুঠোর ভিতর ধরব। কয়েকটা ফোটোসেল থাকলে যন্ত্রটাকে ইচ্ছামত ঠিক করা যাবে, বর্ণালীর বিভিন্ন রশ্মি অনুসারে সংবেদনশীলতা বাড়ান কমান সম্ভব হবে।"

ইঞ্জিনিয়র একদল লোককে নিয়ে চলেছে। দলের কেউ যে আগে কখনো খনির ভিতর নামেনি, তা চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। তাই খনির খাঁচা-চালক ফূর্তিবাজ ছোকরাটি ইঞ্জিনিয়রের কাছে এগিয়ে এসে আগন্তুকদের চোখ ঠেরে দেখিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'কী, হুকুম কী? এদের "ওয়াইন্ড" না "বেল্টে" করে নিচে নিয়ে যাব?'

'এই! ওসব দুষ্টুমি করতে যেও না!' ইঞ্জিনিয়র তাড়াতাড়ি বলে উঠল। 'উনি একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক!' নিকিতিনকে একবার আড়চোখে দেখে নিল, 'যন্ত্রপাতি শেষকালে আবার ভেঙে দিও না যেন। ওসব চালাকী করলে তোমায় কিন্তু আচ্ছা করে শায়েস্তা করে দেব ...'

নিকিতিনের কানদুটো খুবই প্রখর। অন্য যে কোন বাইরের লোকের কাছে এ ভাষা দুর্বোধ্য ঠেকলেও নিকিতিন প্রতিটি কথাই বুঝতে পেরেছে।

'"ওয়াইন্ড" আর "বেল্ট" দুটো দিয়েই নামাও না কেন!' খাঁচা-চালকের উদ্দেশে নিকিতিন বলে উঠল, 'যন্ত্র বা আমাদের কারোই কোন ক্ষতি হবে না। পুরনো দিনের কথা মনে পড়লে বেশ ভালই লাগবে। আর এরা — ওদেরও অভ্যস্ত হতে দাও।'

খাঁচা-চালক হাঁ করে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। তারপর হেসে সে নিকিতিনের দিকে চেয়ে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

খাঁচাটা প্রথমটা ধীরে ধীরে নামল, তারপর হঠাৎ ধাঁ করে এত জোর নেমে গেল, মনে হল বুঝি তার ছিঁড়ে গেছে। খাঁচার ভিতরের লোকেদের পা হড়কে গেল, বুকটা ভীষণ জোর ধ্বক করে উঠল। নিঃশ্বাসও গেল বন্ধ হয়ে। খাঁচাটা ক্রমে আরো দ্রুতবেগে ছুটতে ছুটতে হঠাৎ থেমে গিয়ে নিচে এসে পৌঁছল। ভীষণ এক ভার সবাইকে যেন মেঝের উপর চেপে ধরে রইল। সবার মনে হতে লাগল একটা মস্ত বেল্ট বুঝি ভীষণ জোরে তাদের পেঁচিয়ে ধরেছে।

এক সেকেন্ড এরকম হবার পর আবার সবার মনে হল পা থেকে মাটি বুঝি সরে যাচ্ছে, শরীরের কোন ভার নেই, কলজেটাও যেন লাফিয়ে বেরিয়ে যেতে চায়।

'আ-উ!' নিকিতিনের দলের একজন তো চেঁচিয়েই উঠল।

খাঁচাটা তখন খনির সবচেয়ে গভীরে থেমেছে।

কেঁপে যাওয়া পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার বৃথা চেষ্টা করতে করতে আগের লোকটি চেঁচিয়ে উঠল, 'চুলোয় যাক সব!'

নিকিতিন হেসে উঠল। তার ভীতসন্ত্রস্ত সহকারীরা যে তাতে বিশেষ খুসি হল তা মোটেই নয়!

নিকিতিন এই খনিতে এসেছে গভীর প্রত্যয় নিয়ে। নতুন ক্যামেরার জন্য তার মনের জোর অনেক বেড়ে গেছে। তাছাড়া খবর পাওয়া গেছে এখানেও

খনির লোকেরা প্রস্তরীভূত রজনের স্তর পেয়েছে। টিরানোসরের অশরীরী ছায়া প্রথম যে কালো আয়নাটায় দেখা গিয়েছিল ঠিক সেটারই মতো। এছাড়া অবশ্য তার এই দৃঢ় প্রত্যয়ের উপর সদ্য পাওয়া একটা চিঠিরও প্রভাব আছে।

চিঠির লাইনগুলো মনে মনে আউড়ে নিকিতিনের মুখে হাসি ফুটে উঠল। চিঠির লেখক, মিরিয়াম। সে নিকিতিনকে ভোলেনি, তার টিরানোসরকেও না।

সে লিখেছে, সেই অভিযানের এক বছর পর সে আবার ঐ এস্‌ফল্ট সঞ্চয়ে ফিরে যায়। কালো আয়নাটার অবশ্য আর কিছুই তখন বাকি ছিল না। কিন্তু যে ছবি সে ঐ আয়নায় দেখেছে, সে ছবি কখনো তার স্মৃতি থেকে মুছে যাবে না... বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক কার্জায়েভ্‌কে সে এই ঘটনায় উৎসাহী করেছে। তিনিও এখন অতীতের ছবির অনুসন্ধানে ব্যস্ত।

এর আগে সে নিকিতিনকে চিঠি লেখেনি, তার কারণ লিখে কী হত — এর মধ্যে যে খেদ লুকিয়ে আছে নিকিতিনের কাছে তা অস্পষ্ট রইল না — কিন্তু নিকিতিনের কাজের সব খবরই সে রেখেছে, তার স্থির বিশ্বাস নিকিতিন শেষ পর্যন্ত জয়ী হবে। একটা খুব উল্লেখযোগ্য স্তরবিন্যাস মিরিয়ামরা খুঁজে পেয়েছে। সেই স্তরের কাজের ভার গ্রহণ করা নিকিতিনের পক্ষে সম্ভব হবে কি?

মিরিয়ামের চিঠির পুরো মর্মগ্রহণ নিকিতিনের পক্ষে তখন সম্ভব হয়নি। সে তখন তার সমস্যা নিয়ে আরেকবার লড়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ তার মধ্যে দেখা গেল আবার চপল হৃদয় তরুণটিকে। তার বন্ধু আর সহকর্মীরা তা দেখে তো অবাক।

লম্বা পুরনো সুরঙ্গ থেকে পোড়া গন্ধ বেরিয়ে গলায় জ্বালা ধরিয়েছে। একটা বড় ভেন্‌টিলেটর বাতাস টেনে নিচ্ছে, তার ফলে বাতাসে একটা মৃদু গুঞ্জন। তার তদারকীতে ড্রিল দিয়ে গর্ত করা আর বিস্ফোরণ শেষ হলে পরেই নিকিতিন কাজ সুরু করে দিতে চায়। এই পুরনো খাদটা ছুটে যাওয়া ট্রলি আর বাতির আলোর ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্ত। বেশ শান্ত আর ফাঁকা। মাটির তলের নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার বাতির আলো আর দেয়ালের কালো রঙকে ছেয়ে ফেলেছে।

কোথায় যেন দূরে জলের অল্প আওয়াজ। আরেক দিকে খাদের নিরন্তর শব্দ। মাথার উপর মাটির বিরাট ভারটার কথা তাতে মনে পড়ে যায়।

'এই চমৎকার জায়গাটা কে খুঁজে বের করল?' দলের একজনকে জিজ্ঞেস করল নিকিতিন।

লোকটি ইঞ্জিনিয়রের পিছনের বুড়োটিকে দেখিয়ে বলল, 'যে সব চমৎকার খনিকর্মীদের কথা শোনা যায়, ও হচ্ছে তাদেরই একজন — খনির প্রতিটি পাথর ওর চেনা। ওর সাহায্য না পেলে এখানে আমাদের বছরের পর বছর অন্ধের মতো ঘুরতে হত।'

নিকিতিন বুড়ো লোকটির দিকে শ্রদ্ধাভরে চাইল।

সবাই এসে পেঁছিল আনকোরা নতুন কতগুলো স্তম্ভের উজ্জ্বল সারিতে। স্তম্ভের সংখ্যা দেখে বোঝা গেল জায়গাটা কোন লম্বা সুড়ঙ্গের প্রান্তবর্তী বড় ঘর। সত্যিই কালো দেয়ালগুলো সরে গিয়ে মাটির নিচে মস্ত এক ফাঁকা হলঘরের মতো সৃষ্টি করেছে, সিলিংটা অনেক উঁচুতে।

নিকিতিনের লোকেরা তার ভারী ক্যামেরাটা টেনে আনতে আনতে পিছিয়ে পড়েছে। ইঞ্জিনিয়র এগিয়ে এসে তার জোরাল আলোটা তুলে ধরল। চারপাশে ছড়িয়ে আছে ধারাল, ইস্পাতের মতো চকচকে ভাঙা স্লেটকয়লা ...

ঘরটার মুখেই দুটো বড় বৃক্ষ-কাণ্ড। মোটা, শিরা পাকান, কয়লা থেকে তফাৎ করা যায় না — একেবারে কয়লার ভিতরেই তারা ঢুকে গেছে। কেবল বাকলের রম্বিক গঠন দেখে আলাদা করা যায়। ঘরটার মেঝে যেখানে যেখানে পরিষ্কার করা হয়েছে সেখানে বিরাট মাকড়সার জালের মতো শিকড় মেলে দেওয়া প্রাচীন গাছের গোড়া বেরিয়ে পড়েছে। বহুকাল আগে যে মাটিতে তারা বেড়ে উঠেছিল সে মাটি এখন কয়লায় পরিণত। গোড়াগুলো সবকটাই মাথায় সমান—কার্বনিফেরাস পর্বে বন্যাপ্লাবিত এই বনে এতটা উঁচুতেই জল দাঁড়িয়েছিল। যে দুটো কাণ্ড এখনো রয়ে গেছে তাদের গায়ে কালো ফুটো।

বহুকাল আগে কয়লা আর চূর্ণে পরিণত বনের এই কোণটা তার বয়সের ভারে নিকিতিনদের মনে হাঁপ ধরিয়ে দিল। মাথার উপর ছ'শ ফুট ঘন মাটি থাকলেও মনে হল যেন কোটি কোটি বছরের অতল গভীরতা এখানে বিরাজিত — এই গাছগুলোর জীবনধারণের পর এই সুদীর্ঘ কাল পার হয়ে গেছে।

ঘরের এক প্রান্তে ভাঙা স্লেট দেখে বোঝা গেল এইখানেই বিস্ফোরণ হয়েছে। ভাঙা স্লেটগুলোর উপর চকচক করছে একটা ঢালু খয়েরী কালো পাথর, শক্ত হয়ে যাওয়া বিটুমিনাস স্তরবিন্যাস। কার্বনিফেরাস বনের একটা ছোট পাহাড়ের ভিতর দিয়ে চলে যাওয়া স্তরবিন্যাসই নির্কিতিনদের এখানে নিয়ে এসেছে।

কিছুক্ষণ পরেই পাথরের উপর ম্যাগ্নেসিয়ম বাতিটার জোর আলো পড়ল। নির্কিতিনও ফোকাস করল তার ক্যামেরা। উত্তেজিতভাবে কর্কশ গলায় বলল:

‘এবার চেষ্টা করা যাক...’

এত যত্নে বাছাই করা স্তরে কী পাওয়া যাবে কে জানে? নির্কিতিন ফোটোসেলটা চালিয়ে দিয়ে কারেণ্ট বাড়িয়ে দিল। প্রিজ্মের স্ক্রুটা ঘোরাতে দেখা গেল পাথরটা আর কালো নেই — স্বচ্ছ ধূসর পটভূমিতে ফুটে উঠেছে কয়েকটা অস্পষ্ট খাড়া রেখা।

অসীম যত্নভরে আর ধৈর্যের সঙ্গে নির্কিতিন তার ক্যামেরাটাকে ঠিক করতে লাগল। ফুটে উঠল অত্যন্ত স্পষ্ট একটি ছায়া — অতীতের চতুর্থ ছায়া। হাজার হাজার লোক আর কিছু পরেই সে ছায়া দেখতে পাবে!

বন্যাপ্লাবিত ঘন বনের একটা ফাঁকা অংশ। চারপাশের তেলতেলে কালো জলের উপর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে কতগুলো হালকা ধূসর গাছ। গায়ে তাদের হীরের মতো চৌকো দাগ। প্রতি গাছে দুটো করে ডাল। ঘন পাতায় সে ডাল আচ্ছাদিত। ছবির বাঁ ধারে, একটা ছোট্ট ঢিবির উপর দিয়ে পড়ে আছে একটা ঘন আঁশওয়ালা গাছের গুঁড়ি। ঢিবির ভেজা লাল মাটি ছেয়ে গেছে ছত্রকের মতো এক জাতীয় বেগুনী গাছে। গাছগুলো লম্বা আর শ্যাম্পেনের গেলাসের মতো সরু। তাদের থলথলে মাথা বাইরের দিকে খুলে গেছে। তার ফলে দেখা যাচ্ছে ভিতরের তেলতেলে গাটা। ঢিবিটা আর কতগুলো নিষ্পত্র বাঁকা ডাঁটার পিছনে রয়েছে একটা ফাঁকা জায়গা। কিন্তু গোলাপী কুয়াশা ছাড়া তার ভিতর দিয়ে আর কিছুই দেখা যায় না। সেই কুয়াশার ভিতর থেকে একটা ফাঁকা বাঁকা ডাল হাতের মতো বেরিয়ে আছে। তার উপরে ঘাড় গুঁজে বসে আছে একটা অদ্ভুত প্রাণী।

নির্কিতিন একবার ভাল করে জন্তুটাকে দেখে নিয়েই চমকে উঠল। গোলাপী ব্যাঙের ছাতায় জন্তুটার শরীর ঢাকা। কিন্তু মাথাটা বেরিয়ে আছে। মস্ত অধিবৃত্ত আকারের মাথাটা বাদামী লাইলাক রঙের চিটচিটে চামড়ায় ঢাকা। বের করা বড় বড় চোখদুটো নির্কিতিনের দিকেই চেয়ে। চোখদুটোয় অত্যন্ত হিংস্র, ক্রূর ভাব। নিচের চোয়ালে সারা মুখ জুড়ে বড় বড় দাঁত। ডান দিক থেকে ছবিতে এসে পড়েছে একটা অস্বচ্ছ সবুজ আলো। হাওয়াটা কালো ধোঁয়া-মাখা, যেন আসছে ধোঁয়াটে অথচ স্বচ্ছ কাচের ভিতর দিয়ে।

অতীতের সেই বিস্ময়কর জানলার ভিতর দিয়ে নির্কিতিন অনেকক্ষণ পর্যন্ত কার্বনিফেরাস পর্বের একটি দৃশ্যের দিকে চেয়ে রইল। একদিন আলোর এক দুর্লভ খেলার ফলে এই ছবিটি ধরা পড়ে তারপর পঁয়ত্রিশ কোটি বছর পার হয়ে গেছে। ম্যাগ্‌নেসিয়ম বাতিটা সোঁ সোঁ আওয়াজ করে চলেছে। চারপাশে সবাই রুদ্ধনিঃশ্বাসে দাঁড়িয়ে। আবার সেই অদ্ভুত ধূসর হাওয়া, বদ্ধ জল, গোলাপী ছত্রক আর সেই রহস্যময় প্রাণীটার ক্রূর চোখের দিকে তাকাল নির্কিতিন ...

তার মাথার ভিতরটা তখন যেন ঘুরতে সুরু করেছে। ক্যামেরা থেকে সরে এসে সে এবড়োখেবড়ো দেয়াল আর মরা গাছের প্রাচীন কাণ্ডগুলোর দিকে একবার চেয়ে দেখল। এই গাছগুলোকেই হয়ত সে এইমাত্র ছবিতে অমন সজীব আর সুন্দর দেখেছে। দলের আর সবার মুখের দিকেও সে চাইল পাগলের দৃষ্টিতে। তারপর নিজেকে জোর করে স্থির রেখে তুলে নিল কয়েকটা রঙিন ছবি।

ডেস্কের উপর গাদা করা অতীতের ছায়ার রঙিন ছবি সহ নির্কিতিনের ছাপান প্রবন্ধের কপি। শেষ কপিটায় সই করে নির্কিতিন তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

সত্যিই তবে ফল পাওয়া গেছে।

এখন আরো অনেকে তার পথ অনুসরণ করবে। নির্কিতিনের আশা, একাজের পক্ষে তারা আরো উপযুক্ত হয়ে উঠবে। প্রকৃতির আরেকটি রহস্যের প্রথম পর্দা সে খুলে দিয়েছে। এই দীর্ঘ দুর্গম পথে তাকে আর একা চলতে হবে না। কিন্তু সত্যিই কি সে এতদিন একা ছিল? তার

সহকারীদের বাদ দিলেও আরো যে অনেক লোক তাকে সাহায্য করেছে, তারা কোথায় যাবে?

একের পর পর এক তার চোখের সামনে ভীড় করে ভেসে উঠল পরিচিত মুখ — খনির কর্মী, মাটি খোঁড়ার মজুর, যৌথখামারী, শিকারী। এরা সবাই তাকে নিঃস্বার্থভাবে, উদার হাতে সাহায্য করেছে। লক্ষ্যটা তারা সবসময় বুঝতে পারেনি, কিন্তু তবু বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক হিসেবে তাকে সম্মান দেখিয়েছে। অতীতের ছায়ার সন্ধানে এরা ছিল অপরিহার্য।

এদের কাছে তার অনেক ঋণ। আজ সে সেই ঋণের মর্যাদা দিয়েছে। তাই তো তার আজ এত আনন্দ!

নিকিতিনের মনে পড়ল পড়ার ঘরের সেই দীর্ঘ সন্ধ্যাগুলো — নিজেকে নিয়ে অসন্তুষ্ট সে বসে বসে ভেবেছে জীবনের পথ বেছে নিতে তার ভুল হয়নি তো!

মৃদু হেসে নিকিতিন মিরিয়ামের উদ্দেশে একটা টেলিগ্রাম লিখে ফেলল। জানাল পরের ট্রেনেই সে তার ওখানে যাচ্ছে। সামনের পথ তার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, নিকিতিনের আনন্দ আর ধরে না। না, তার ভুল হয়নি; প্রকৃতির ধাঁধার উত্তরের জন্য তার বহু বছরের কঠোর সংগ্রাম ব্যর্থ হয়নি।

নুর-ই-দেশ্‌ৎ মানমন্দির
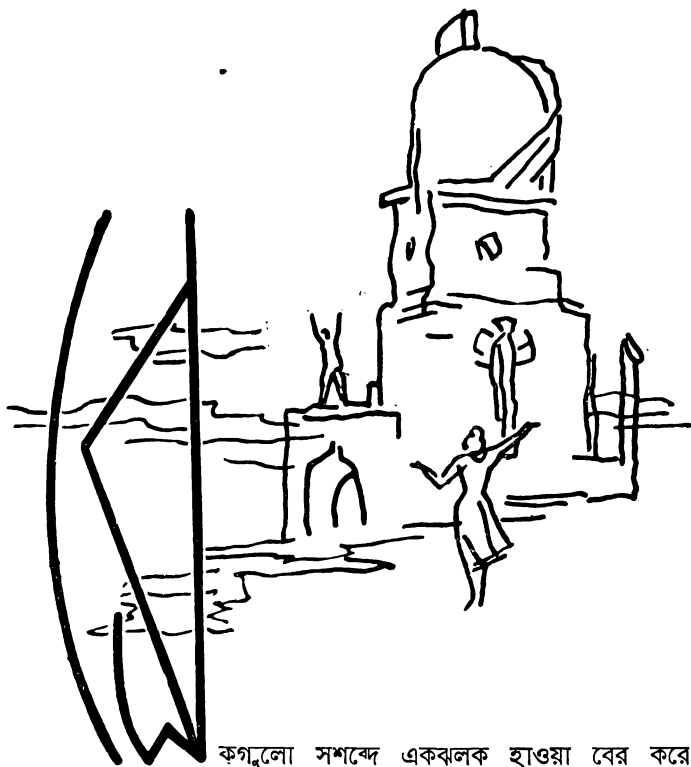
ক্‌গুলো সশব্দে একঝলক হাওয়া বের করে দিল। চাকাগুলোও কিছুক্ষণ পরেই বাঁধা চালে ঝিকঝিক করে এগতে লাগল। গাড়ির জানলায় বরফের ঘূর্ণী।

যত কণ্ঠস্বর গেল মিলিয়ে। কামরার যাত্রীদের মধ্যে একজন লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেল। জানলার পাশে বসে অস্তসূর্যের গোলাপী আভায় রঙিন সান্ধ্য

দৃশ্যের দিকে ভদ্রলোক চেয়ে আছেন। ট্রেনের গতি ক্রমেই বাড়ছে। যাত্রীদের বয়ে নিয়ে চলেছে অজানা ভবিতব্যের দিকে। ১৯৪৩ সাল। যুদ্ধের আরেকটি নতুন বছর।

নৌবাহিনীর একটি অফিসার করিডরে এসে একটা জাম্পসীটে বসে পড়ল। গত কয়েক বছরে যুদ্ধের ভীষণতার যে ছাপ দেশের উপর পড়েছে তার কথাই রয়েছে তার মনে।

কামরার সহযাত্রী দীর্ঘকায় তরুণ আর্টিলারি মেজরটি তার পাশে এসে দাঁড়াতে নৌবাহিনীর অফিসারটি চোখ তুলে মেজরের সুস্থসবল ছিপছিপে চেহারাটি দেখে নিল। মেজরের চলাফেরা বসায় প্রাণশক্তির প্রকাশ তার নজর এড়াল না। রোদে পোড়া মুখে ছেলেটির চোখদুটো খুব ফিকে হয়ে উঠেছে। চোখের ভাবটি শান্ত প্রত্যয়ের কিন্তু একটু নজর করলে আরেকটি জিনিসও দেখা যায়। নাবিক অফিসারটির সঙ্গে সঙ্গেই মনে হল, তা হচ্ছে অত্যন্ত একরোখো আশাবাদী মনের ছাপ, দৃঢ় চরিত্রের শাসনে যা বাঁধা।

অন্ধকার হয়ে এল; দুজনে তখনো কথা বলে চলেছে। কামরায় ঢুকে উপরের বাঙ্কে ওঠার আগে সেই দীর্ঘ আলাপ থামল না। জানলাগুলো ভাল করে পর্দায় ঢাকা। রাত্রের একটি মাত্র বাতির ম্লান আলোয় ভিতরে বেশ একটা আরামের ভাব এসেছে। নৌবাহিনীর অফিসারটি শুয়ে শুয়ে উল্টো বাঙ্কের নবপরিচিত মেজরটির গল্প শুনতে লাগল। সে কাহিনীর সঙ্গে এই পারিপার্শ্বিকের এতই অমিল যে অফিসারটির মনে হল তার মনটা এই কামরা ছেড়ে চলে গেছে মধ্য এশিয়ার সূর্যস্নাত উদার উন্মুক্ত সমতলে...

মেজরের গল্পটি হল এই।

যুদ্ধ যখন তিন মাসের তখন আমার ডাক পড়ল। পশ্চাদপসরণের তিক্ত দিনগুলোর পুরো অভিজ্ঞতাই আমার হয়েছে। সাত মাসের প্রতিনিয়ত লড়াইয়ে মনে হয়েছে বুলেট আর গোলার স্প্লিণ্টার যেন আমায় এড়িয়ে চলতে চায়। কিন্তু আমার এ গল্প যুদ্ধের গল্প নয় ...

যুদ্ধের আগে আমি ছিলাম ভূবিজ্ঞানী। দুর্জয় প্রকৃতির উপাসক। স্বপ্নদ্রষ্টা। যুদ্ধ তার নিষ্ঠুরতা আর ধ্বংসলীলার ফলে নরম মনকে বড়ই পীড়িত করে। আমার মনটাও সে প্রায় ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। কোনরকমে

সব সহ্য করতে শিখলাম। অন্য সৈন্যদের মতোই কঠিন হয়ে উঠলাম। মনে হল আমার স্বপ্নদের বোধহয় শেষ বিদায় জানান হয়ে গেল। দেখা দিল যন্ত্রণাদায়ক শূন্যতা। কেবল শত্রুর সঙ্গে লড়াইয়ের সময়েই তা ভুলে থাকতে পারি। মনটা বিষণ্ণ ও কঠোর হয়ে উঠল। কামান ছাড়া অন্য সব চিন্তা মাথা থেকে দূর হয়ে গেল।

মার্চ মাসে গুরুতর আঘাতের ফলে সাত মাস বিছানায় পড়ে রইলাম। হাসপাতালের বাস ফুরলে আমায় ভাল করে সেরে ওঠার জন্য মধ্য এশিয়ার একটি স্বাস্থ্যাবাসে পাঠিয়ে দেওয়া হল। খুব চেঁচামেচি গোলমাল জুড়ে দিলাম। বললাম, আমায় যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠান হক, সেটাই আমার জায়গা। কিন্তু কোন ফল হল না।

গত বছর জুলাই মাসে দেখলাম ট্রেনে চড়ে চলেছি সূর্যস্নাত কাজাখস্তানের সীমাহীন স্তেপের দিকে। রাত্রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জানলার ধারে বসে বসে ওয়ার্মউডের মিষ্টি গন্ধে ভরা শুকনো, ঠাণ্ডা হাওয়ার মুণ্ডপাত করি, আর চেয়ে থাকি প্রাচীন প্রান্তরের দিকে। স্তেপের নীরন্ধ্র অন্ধকারে সে প্রান্তরকে আরো বন্য, আরো ফাঁকা মনে হয়। দক্ষিণে যাবার আমার এতটুকু উৎসাহ নেই: মন পড়ে রয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে।

মধ্য এশিয়ার প্রাকৃতিক দৃশ্যের অন্তহীন শান্তি কখন যেন অজ্ঞাতসারেই আমার মন জুড়ে বসল। সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই মনটা ভিতরে ভিতরে নরম হয়ে উঠল। চারপাশের দৃশ্যের প্রতি ঔৎসুক্যও বাড়ল।

আরিস পার হবার সময় রোদে তেতে ওঠা গাড়ির গরম অসহ্য হয়ে উঠল। অনেক রাত্রে একটা ছোট্ট স্টেশনে নেমে বড় আরাম পেলাম। শুনলাম স্যানাটোরিয়ামের বাস আসবে সকালে। স্টেশন বাড়ির হলঘরে ঘুমনোর বদলে দক্ষিণাঞ্চলের রাত্রের খোলা হাওয়াটাই বেশি লোভনীয় মনে হল। ল্যাম্পপোস্টের পাশে সুটকেসটা পেতে তার উপর চেপে বসে চারদিকটা দেখতে লাগলাম।

ট্রেনটা যেন কী কারণে স্টেশনেই দাঁড়িয়েছিল। যাত্রীরা আলোয় ভরা, পাথর ঢাকা প্ল্যাটফর্মে পায়চারী করছিল। একটা সিগারেট ধরিয়ে আমি চেয়ে রইলাম সহযাত্রীদের দিকে।

একটি মেয়ে দেখলাম, থেকে থেকেই প্ল্যাটফর্মটায় আসা যাওয়া করছে।

তার ধূসর সোনালি রঙের চুলে, রোদে পোড়া লালচে তামাটে শরীরে আর সবুজ পোষাকে ভারী সুন্দর একটা বর্ণ সুষমা গড়ে উঠেছে। তাই সে বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

তার সজীব প্রাণোচ্ছ্বলতা আর সবার থেকে কিছু স্বতন্ত্র। এই সজীবতার ভাবটা এতই প্রবল যে এখনো তা আমার স্পষ্ট মনে পড়ে।

মেয়েটি মনে হল কিছু একটা খুঁজছে। মেয়েটি এসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে অধীরভাবে ছোট করে কাটা চুল ঝাঁকিয়ে আলোর দিকে মুখ তুলে একবার ঘুরে দাঁড়াল। ঠোঁটদুটো একটু মজার ভঙ্গীতে ফোলান। আমার দৃষ্টি অনুভব করে মেয়েটি জিজ্ঞাসু চোখে আমার দিকেও একবার তাকাল, তারপর ঘুরে চলে গেল।

ট্রেন তখন ছেড়ে দিয়েছে। পিছনের লাল আলোটা অন্ধকার টিলাগুলোর আড়ালে গেল মিলিয়ে। দুটো আলো বাদে স্টেশনের বাকি সবকটা আলো নিভে গেল। কিছুক্ষণ পর্যন্ত ঐ নিস্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যেই স্যুটকেসে আসীন হয়ে রইলাম। চারপাশের সেই শীতল আলো আঁধারি আর সমতলের গভীর প্রশান্তি আমার মনে বহুকাল ভুলে যাওয়া এক শান্তির আমেজ এনে দিল।

বাতাস খুবই ঠাণ্ডা হয়ে ওঠায় বাধ্য হয়ে স্টেশন বাড়িতে আশ্রয় নিতে হল। ছোট্ট ঘরটায় আলো কম। কাঠের বেড়াটার ওধারে আহত সৈন্যদের কামরা। সেখানে কাউকেই চোখে পড়ল না। বাতাস আসার জন্য জানলাগুলো হাট করে খোলা।

একটি বেঞ্চির উপর শুয়ে পড়লাম, কিন্তু ঘুম এল না। হঠাৎ চাপা পায়ের আওয়াজে ঘুরে দেখি প্ল্যাটফর্মের সেই মেয়েটি। বেঞ্চিজোড়া ঘুমন্ত উজবেকদের দেখতে দেখতে সে একটু ইতস্তত করে আমার কামরার বেড়ার দিকে এগিয়ে এল।

উঠে পড়ে তাকে ভিতরে ডেকে আনলাম। মেয়েটি মাথা নেড়ে অভিবাদন জানিয়ে একটা ফাঁকা বেঞ্চিতে বসে পড়ল। বড়ই ভাল লাগল এই সঙ্গীটিকে পেয়ে; স্টেশনটা আর ফাঁকা বোধ হল না। মেয়েটির মনে হল একটুও ঘুম পায়নি। সাহস সঞ্চয় করে সহযাত্রীদের যে সব বাঁধাধরা প্রশ্ন করতে হয় সেগুলোই জিজ্ঞেস করলাম। প্রথম প্রথম মেয়েটি ছোট ছোট জবাব দিয়েই সেরে দিচ্ছিল। ক্রমে আমরা বেশ গল্প জুড়ে দিলাম।

তাতিয়ানা নিকোলায়েভনা, সংক্ষেপে তানিয়া — আমায় সে ঐ নামে ডাকারই অনুমতি দিয়েছিল — তাশখন্দে প্রাচ্য বিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগের ছাত্রী। একটি প্রাচীন মানমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ খুঁজে বের করার কাজে সে তখন একজন বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদের সহায়তা করছে। ঐ স্টেশন থেকেই প্রায় একশ কুড়ি মাইল দূরের পাহাড়ের পাদদেশে হাজারখানেক বছর আগে মানমন্দিরটি নির্মিত হয়। তানিয়ার কাজ হল ধ্বংসাবশেষের গায়ে আরবী ভাষার লিপি পুনরুদ্ধার করা আর পড়া।

আমার ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা হাতটা আঙুলের ডগা দিয়ে ছুঁয়ে মেয়েটি বলল, 'যুদ্ধক্ষেত্রের লড়াই আর এই আঘাতের পর আপনি নিশ্চয়ই অবাক হয়ে ভাবছেন, এমন অযুদ্ধসুলভ কাজ নিয়েও লোকে এখন মাথা ঘামাতে পারে।'

এই কথার সঙ্গে মেয়েটির চোখে ফুটে উঠল একটা সলজ্জ উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি।

'মোটেই না, তানিয়া,' আমি বলে উঠলাম, 'আমিও এককালে ভূবিজ্ঞানী ছিলাম। তাই বিজ্ঞানের কীর্তির প্রতি আমার বিশ্বাস আছে। তাছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে আমরা ভাল করছি বলেই আপনারা শান্তির সময়ের কাজ এখনো করে চলতে পারছেন, একথা ভেবে গর্ববোধ করছি।'

'ও, আপনি তাহলে জিনিসটাকে এই ভাবে দেখছেন?' মৃদু হেসে বলল তানিয়া। তারপর চুপ করে কী যেন ভাবতে লাগল।

'আপনি বললেন মানমন্দিরটা অনেক দূরে, স্তেপের বুকে। তবে আপনি এখানে কেন?' আলাপটা যাতে থেমে না যায়, তাই জিজ্ঞেস করলাম।

তানিয়া তখন তাদের অভিযানের বিবরণ দিতে সুরু করল। অভিযানে মাত্র তিনটি লোক। সে নিজে, অধ্যাপক আর তানিয়ার পনের বছরের ভাই — সে জরীপের কাজ করে। কাছের যৌথখামার অভিযানের কাজের জন্য কেবল দুজন বুড়োকে দিতে পেরেছিল। দু'সপ্তাহ কাজের পর বুড়োরা খামারে ফিরে গেছে। খামার থেকে আর কাউকে পাঠাতে না পারায় অভিযানের কাজ এখন বন্ধ। অধ্যাপক তার ইনস্টিটিউটে চিঠি লিখে একটি গবেষককে পাঠিয়ে দিতে বলেছেন। ছেলেটি তাশখন্দে তার থিসিস রচনার কাজে ব্যস্ত। তানিয়া তার জন্যই স্টেশনে এসেছে। কিন্তু দুটো ট্রেন চলে গেল, ছেলেটি এল না।

তাশখন্দে সে টেলিগ্রাম করেছে, সকালবেলা তার জবাব পাবে বলে আশা করছে।

'খুবই খেদের কথা!' মেয়েটি অত্যন্ত নিরাশ হয়ে বলল, 'কাজটা অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক! তাছাড়া নরু-ই-দেশ্‌ৎ জায়গাটাও খুব সুন্দর!.. নুর-ই-দেশ্‌ৎ হচ্ছে মানমন্দিরটার নাম। কথাটার মানে হল "মরুভূমির আলো"।'

'আপনি বলছেন জায়গাটা সুন্দর। তাই যদি হবে তবে আপনার পাকাদাড়ি বুড়োরা হঠাৎ পালাল কেন?'

'তার কারণ ওখানে থেকে থেকেই ভূমিকম্প হয়। সবকিছু থরথর করে কাঁপতে থাকে, মাটির নিচে গুম্‌গুম্‌ আওয়াজ হয়, মানমন্দিরের দেয়াল বেয়ে পাথরের টুকরো আর আল্‌গা মাটি ঝরে পড়ে। ওরা ভাবল এ হচ্ছে একটা বড় গোছের ভূমিকম্পের ভূমিকা আর সে ভূমিকম্পে আমরা সবাই মারা পড়ব ...'

হঠাৎ একটা কথা মাথায় আসতে আমি তানিয়ার কথাগুলো নিয়ে ভাবতে সুরু করলাম। তারপর আবার কথা বলতে গিয়ে দেখি তানিয়ার মাথাটা তার কাঁধে ঢলে পড়েছে। সে ঘুমিয়ে পড়েছে।

আমার ওভারকোটটা মুড়ে তানিয়ার পাশে গুঁজে দিলাম। কিছুক্ষণ পর আমিও পাশের বেঞ্চিটাতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম থেকে উঠে দেখি, তানিয়া নেই। ঘরটায় তখন নানা রঙের পোষাক পরা উজবেকের মেলা বসে গেছে। চারিদিকে দুর্বোধ্য ভাষার কিচির-মিচির।

হাতমুখ ধুয়ে নিয়ে বাসের সন্ধানে বেরলাম। শুনলাম বাস আসবে দুপুরের খাওয়ার পর। তানিয়ার দেখা পাওয়ার আশায় স্টেশন বাড়ির চারপাশটা ঘুরে এগিয়ে গেলাম স্তেপের দিকে। কিন্তু রোদের চোটে তাড়াতাড়ি আবার স্টেশনের ছোট্ট বাগানটার ছায়ায় এসে দাঁড়াতে হল। দূরে টেলিগ্রাফ অফিসের দোরগোড়ায় চোখে পড়ল তানিয়ার সবুজ পোষাক। একেশিয়া গাছের নিচে একটা বেদীর উপর বসে বসে সে কী যেন ভাবছে।

'সুপ্রভাত। তাশখন্দ থেকে জবাব এল?'

'হ্যাঁ ... তাশখন্দের লোকটি আর্মিতে চলে গেছে। তার মানে আমরা এবার পথে বসলাম। আর কোন সাহায্য পাওয়া যাবে না। মাৎভেই আন্দ্রেয়েভিচকে

এ কথা কী করে বলব তা জানি না। কাজটা শেষ করার জন্য তিনি অত্যন্ত ব্যগ্র!'

'মাৎভেই আন্দ্রেয়েভিচ কে?'

'কেন, আমাদের অধ্যাপক। কাল রাত্রেই তো আপনাকে ওঁর কথা বললাম,' মেয়েটি একটু রুক্ষভাবেই বলল।

আমি তখন মনস্থির করে ফেলেছি।

'শুনুন, তানিয়া, আমায় নিন না আপনাদের কাজে! ঐ বুড়োদের চেয়ে আমি বোধহয় বেশি সাহায্যে আসব।'

তানিয়া অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল।

'আপনি?.. কিন্তু অপনার যে বিশ্রাম প্রয়োজন, তাছাড়া আপনার ...' স্লিঙে ঝোলান হাতটার দিকে তাকিয়ে তানিয়া অপ্রস্তুতভাবে থেমে গেল।

জখম হাতটা বের করে কয়েকবার জোরে জোরে শূন্যে ছুঁড়লাম।

'ভয় পাবেন না। হাত আমার সম্পূর্ণ সুস্থ। স্লিংটা ঝুলিয়েছি, যাতে ফুলে না যায় তাই। আমার ছুটি আমি যেখানে খুসি কাটাব, তাতে কারো কিছু এসে যায় না! আপনার ঐ সুন্দর নুর-ই-দেশ্‌তেও হয়ত থেকে যেতে পারি!'

মেয়েটি তখনো মনস্থির করতে পারেনি, কিন্তু তার ধূসর চোখদুটো তখন আনন্দে জ্বলে উঠেছে।

'আমার তো মনে হয় এটা বেশ একটা ভাল দাঁও,' ঠাট্টা করে বললাম, 'অবশ্য আপনার অধ্যাপক যদি আমায় শূন্যি পেটে না রাখেন।'

'খাবার প্রচুর আছে। কিন্তু আপনার স্যানাটোরিয়ামের কী হবে? তাছাড়া মানমন্দিরের পথটাও বড় খারাপ ...'

'আপনি যখন এরমধ্যেই তিনবার যেতে পেরেছেন, তখন নিশ্চয়ই খুব বেশি খারাপ নয়।'

'আমি অবশ্য লম্বা নই, কিন্তু তবু গায়ে বেশ জোর আছে,' তানিয়া জবাব দিল, 'প্রথমে মোটরে করে রাষ্ট্রীয় খামারে যেতে হবে — তার মানে পঁচাত্তর মাইলেরও বেশি। তারপর এবড়োখেবড়ো বালি আর পাথুরে রাস্তা দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যেতে হবে তুজ্‌-কুলের ছোট্ট যৌথখামারটায়। তারপর

উটে চড়ে মাইল পনেরক মরুভূমি পার হতে হবে। উট আমি দুচোখে দেখতে পারি না: মনে হয় যেন মস্ত একটা পিপের উপর বসে পেণ্ডুলামের মতো খালি সামনে পিছনে দুলছি। তারপর উট আবার ঘণ্টায় দুমাইলের বেশি এগয় না।'

তানিয়াকে বোঝাতে বেশি সময় লাগল না। সেদিন সন্ধ্যাসন্ধিই একটা ফাঁকা তিন-টনী গাড়িতে চড়ে বসলাম। এবড়োখেবড়ো রাস্তার উপর দিয়ে বলের মতো লাফাতে লাফাতে গাড়িটা এগতে লাগল বরফ-ঢাকা পাহাড়ের নীল রেখা ছেড়ে দক্ষিণ-পুবে। তার মানে স্যানাটোরিয়ামের একেবারে উল্টোদিকে। ড্রাইভারের ঘরের গায়ে পিঠ দিয়ে আমরা বসলাম। একেকটা ঝাঁকানি আসে আর আমরা হেসে গড়িয়ে পড়ি। এ অবস্থায় কথা বলে কার সাধ্য — একবার মুখ খুলতেই জিভে কামড় পড়ে জিভটা আমার কাটাই গিয়েছিল আর কি।

লরীর চাকা থেকে লালচে ধুলোর মেঘ পাক খেয়ে ফেঁপে ফুলে উঠে দূরে সরে যাওয়া টিলাগুলোকে ঢেকে দিচ্ছে। ঐ টিলার আড়ালেই মুখ লুকিয়েছে স্টেশনটা। তিন ঘণ্টা পথ চলার পর দিগন্তে পপলারগাছের উঁচু নিচু রেখাটায় ফাঁক ধরল। বেরিয়ে পড়ল একটা সোজা চওড়া রাস্তা। তার দুপাশে দুসারি ছোট ছোট সাদা বাড়ি। পপলারগুলো যেন সবুজ গম্বুজ। বাড়িগুলোর পিছনের প্রান্তরটা ঢিবি হয়ে উঁচুতে উঠে গেছে। লম্বা লম্বা ফিকে হলদে স্তেপ-ঘাসে তা ঢাকা।

রাষ্ট্রীয় খামারের দপ্তরের কাছে এসে লরীটা দাঁড়াল। একটা ছোট্ট সেই দূর দেশের খামারে যে সাদর আতিথেয়তা পেয়েছিলাম তা দীর্ঘকাল মনে থাকবে। যাওয়াটা যতক্ষণ পারা যায় পেছিয়ে দেবার চেষ্টা করা গেল; কারণ ঐ অঞ্চলে ঠাণ্ডা রাতেই পথচলা ভাল।

একটা বেশ ভাল জাতের ঘোড়ার গাড়িকে রাস্তা দিয়ে আসতে দেখে তানিয়া হেসে বলল, 'আপনাকে সঙ্গে এনে খুবই ভাল হয়েছে, ইভান তিমোফেয়েভিচ। আপনার ঐ ইউনিফর্মের দৌলতে এদের কাছ থেকে একটা "তারান্তাস" পাওয়া গেছে।'

রাষ্ট্রীয় খামারের কৃষিবিজ্ঞানী একজন তুজ-কুল যৌথখামারে যাচ্ছিল।

সে নিজে থেকেই আমাদের গাড়ি চালাবার ভার নিল। তানিয়া আর আমি তার পিছনে উঠে বসলাম। গাড়ি চলতে ঝিরঝিরে হাওয়ায় বেশ আরাম লাগল। চারপাশে অন্ধকার স্তেপ। মাথার উপরে মিটমিট করছে আকাশের গায়ে ঢলে পড়া তারাগুলো।

কিছুক্ষণ পরেই অনুভব করলাম বাহুর উপর তানিয়ার কাঁধের ছোঁয়া। তার চোখদুটো বুজে এসেছে। কোঁকড়া চুলগুলো আমার কাঁধের উপর বিছনো। সময় বয়ে চলল। মুখের উপর ঝিরঝিরে হাওয়ার হাত বুলনটা হঠাৎ ভীষণ কনকনে ঠাণ্ডা হয়ে উঠল। ভোরের ঠাণ্ডায় আর আমাদের ঘুম হল না।

তুজ-কুল জায়গাটা মোটেই আরামের নয়: ন্যাড়া একটা পাহাড়। এখানে ওখানে কয়েকটা সদ্য পোঁতা ছাড়া ছাড়া পপলারগাছ আর লালচে-খয়েরী মাটি ল্যাপা ছোট ছোট কুঁড়েঘর।

সন্ধ্যা ছ'টায় আবার আমরা বেরিয়ে পড়লাম। মরুভূমির মধ্যে দিয়ে তানিয়া আর আমি পাশাপাশি হেঁটে চলেছি। পিছনে আসছে পথপ্রদর্শক আর মালবোঝাই উট। দীর্ঘ মরুভূমি, চারদিকে শুধু বালিয়াড়ি আর তার উপর নীল কাঁটা। বেশ দুর্গম পথ। তানিয়া দেখলাম খুব ভাল পরিব্রাজক, ঐ পথ দিয়েও সে দিব্যি হেঁটে চলেছে। আলগা বালির মধ্যে পা ডেবে যায়। তারোপর বালির মারাত্মক উত্তাপে মুখ ঝলসে যাবার জোগাড় — দুপুরে জায়গাটার অবস্থা কল্পনা করে ভয়ে কেঁপে উঠলাম।

গোধূলির সময়টায় একটু জিরিয়ে নিয়ে আমরা একটা সাকসাউল কুঞ্জে এসে পেঁছলাম। মরুভূমি পার হয়ে যখন ওয়ার্মউডের ঝোপে ভরা পাথুরে স্তেপের শক্ত মাটিতে পা পড়ল তখন আমার ঘড়ির উজ্জ্বল কাঁটাদুটোয় রাত সোয়া বারটার নির্দেশ।

দূরে একটা উঁচু জায়গায় দেখলাম লাল উজ্জ্বল আলোর সোনালি আভা।

'ঐ আমাদের ক্যাম্পফায়ার,' তানিয়া বলল, 'ওরা এখনো ঘুময়নি দেখছি, বোধহয় আমার জন্যই জেগে আছে।'

অন্ধকারে একটা ছেলেমানুষী গলা শোনা গেল, 'মাৎভেই আন্দ্রেয়েভিচ, তানিয়া আসছে!'

ক্যাম্পফায়ারের আলোয় অধ্যাপককে প্রথম দেখতে পেলাম। বেঁটেখাট

গোলগাল মানুষটি, বেশ বুদ্ধিদীপ্ত চৌকো মুখ। পুরু কাচের চশমায় চোখদুটো ঢাকা। আমি পিছিয়ে পড়ে উটটাকে ক্যাম্পফায়ারের দিকে টেনে আনছিলাম। অধ্যাপক তানিয়ার সঙ্গে করমর্দন করে আমার উদ্দেশে চেঁচিয়ে বললেন, 'সেমিওনভ, লুকলে কোথায়? এস, একবার দেখা দাও। তাশখন্দের খবর কী?'

আলোর কাছে আমি এসে দাঁড়াতে অধ্যাপক ভীষণ চমকে উঠলেন। চশমাটা ঠিক করে নিয়ে তিনি তানিয়াকে জিজ্ঞেস করলেন, 'এ কে? সেমিওনভ কোথায়?'

'সেমিওনভ আসবে না,' দোষী দোষী ভাব করে তানিয়া গলাটা একটু চড়িয়ে বলল।

'আসবে না? তার মানে?' অধ্যাপক রেগে উঠলেন।

আমি তখন এগিয়ে এসে নিজের পরিচয় দিয়ে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললাম।

'কিন্তু এ অসম্ভব! আপনি একজন মেজর, মেডেল পাওয়া অফিসার ... অসম্ভব, এ কিছুতেই হতে পারে না,' তানিয়ার দিকে ক্রুদ্ধ চোখে তাকাতে তাকাতে অধ্যাপক বলে চললেন।

তানিয়া নিরুত্তর।

'তাছাড়া দেখতে পাচ্ছি আপনার হাতটাও জখম। কি করে আপনি কাজ করবেন?.. সত্যি বলছি, তানিয়া, তোমার কাছ থেকে এটা আশা করিনি!'

আমি হেসে উঠে উটের পিঠ থেকে নামান মস্ত একটা বোঝা মাথার অনেক উপরে তুলে ধরলাম। তানিয়া হাততালি দিয়ে উঠল। অধ্যাপকের চোখে ফুটে উঠল তারিফ।

'আপনাকে নিয়ে এখন কী করা যায়!'

'একবার আমায় কাজে লাগিয়ে দেখুন। যদি দেখেন আমায় দিয়ে চলবে না, তবে না হয় ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে মরুভূমির পথে ফেরৎ পাঠিয়ে দেবেন,' বিনীতভাবে বললাম।

তানিয়ার মুখে চাপা হাসি। তার দিকে ঘুরে তাকাতে অধ্যাপকের চশমাটা জ্বলে উঠল।

'সবমেয়েই একজাতের! যুদ্ধের কোন বীর সৈনিক না এসে পৌঁছন পর্যন্ত তারা ঠিক আছে। যাক, এখন তো একটু চাটা খেয়ে আরাম করে নিন, পরে আপনাকে নিয়ে কী করা যায় দেখা যাবে।'

সকালবেলা নুর-ই-দেশ্‌ৎ মানমন্দিরের জায়গাটা আমার খুবই ভাল লাগল। পাথুরে পাহাড়টার উপরে মানমন্দিরের কেবল অর্ধবৃত্তাকার দেয়ালটাই রয়েছে, তার ভিতর দিক থেকে উঠেছে একটা ছোট্ট মিনারেট। দেয়ালের প্রান্তগুলো শেষ হয়েছে মোটা ঘন পাথরের উপর দাঁড় করান বিরাট বিরাট গোল খিলানে। ঘন পাথরগুলোর মাঝখানে একটা আরবী পোর্টিকো, তাতে টার্কয়িজ বসান সোনালি লিপির চিহ্ন। খিলান আর মিনারের মাঝখানে একটা গভীর কুয়ো। কুয়োর গাটা তুফা পাথরের। তার অধিকাংশ জুড়ে রয়েছে কোণমাপার যন্ত্র কোয়াড্রাণ্টের শ্বেতপাথরের বাঁক। সেই বাঁকের সমান্তরালে নেমে গেছে ছোট্ট একটা সিঁড়ি। বাঁকের একপাশের গায়ে সুন্দর করে খোদাই করা ছোট আকারের অদ্ভুত সব চিহ্ন আর আঁকজোঁক।

অধ্যাপক আমাকে ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছিলেন। তিনি তখন মানমন্দির ছেড়ে বেরবার জন্য ব্যস্ত।

'এ দিকটায় আমাদের কাজ শেষ হয়ে গেছে,' অধ্যাপক জানালেন, 'এখন ঐ দিকটায় কাজ করতে হবে।' অধ্যাপক হাত নেড়ে দেখিয়ে দিলেন দেয়ালের ডান দিকটা। সেখানে একটা খিলানের ধ্বংসাবশেষ আর সরু উঁচু মিনারেট।

অধ্যাপক বললেন, 'আসল মানমন্দিরটা বেশ ভালই রয়েছে। অবশ্য কোয়াড্রাণ্টের ব্রোঞ্জ অংশ আর অন্যান্য যন্ত্রপাতি সেই মঙ্গোল আক্রমণের সময়েই চুরি গেছে। যে অংশটায় আমরা এখন অনুসন্ধান করব, সেখানে বোধহয় একসময় যন্ত্রপাতি, তারার নক্সা, বইপত্র জমা থাকত, জ্যোতির্বিদরাও বোধহয় ঐ দিকেই থাকতেন। বাড়িটা কিছুটা পাহাড় কেটে করা। কতগুলো পথ, কুয়ো আর মাটির নিচের খিলানছাদ পাওয়া গেছে। তবে তাদের উদ্দেশ্যটা এখনো ধরতে পারিনি। উপরের দালানটা ভেঙে পড়ে গেছে। নিচের পথগুলো সব বালি আর পাথরে ভরা। তাই বাড়িটার একটা স্পষ্ট ধারণা এখনো করা যায়নি। তবে বাড়িটার সঙ্গে মানমন্দিরের চেয়ে ছোটখাট দুর্গেরই মিল বেশি। চল, সুরু করা যাক!'

একথা বলেই অধ্যাপক ধুলো আর মরা ঘাসে ঢাকা খিলানটার নিচে

ঢুকে পড়লেন। তানিয়া, তানিয়ার ভাই, আর আমিও তাঁর অনুসরণ করলাম।

আধ-আলো চৌকো ঘরটার ভিতরটা চমৎকার ঠান্ডা। একটা কোদাল তুলে নিলাম, উজবেকী ভাষায় ঐ কোদালগুলোকে বলে "কেৎমেন"। তারপর অধ্যাপকের নির্দেশ অনুযায়ী পরের ভেঙে পড়া খিলানটার মাটি আর পাথরের স্তূপ সরাতে সুরু করলাম।

বলা বাহুল্য, এমন ভাবে কাজ করতে লাগলাম যেন অধ্যাপকের প্রশংসার উপরেই আমার জীবন মরণ নির্ভর করছে। আমি তখন ঘামে নেয়ে অস্থির, কিন্তু ঘরের দুপাশে মাটির স্তূপ বিরাট উঁচু হয়ে রয়েছে। অধ্যাপক আহ্লাদে আটখানা হয়ে আমার কেৎমেনটা কেড়ে নিয়ে আমায় একটু জিরিয়ে নিতে বললেন। তানিয়া তখন কিছুটা খুঁড়ে চলল। তারপর আবার আমি।

এইভাবে অনেকক্ষণ কাজ করে চললাম। আমাদের ঘামে ভেজা শরীরগুলো পুরু ধুলোয় ভরে গেছে। অবশেষে একটা নিচু, লম্বা ঘরের ভিতর দিয়ে আমরা এগতে সুরু করলাম। উপরের পাথরের ফাঁক দিয়ে ঘরে স্বল্প আলো এসে পড়েছে। এগতে এগতে তানিয়া আর অধ্যাপক এক কোণে পালিশ করা পাথরের গাদার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। অন্ধকার ফাঁকা ঘরটায় কৌতূহলজনক কিছু না পেয়ে আমি তার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য ঘরগুলো ঘুরে দেখতে লাগলাম। দরজাছাড়া সরু ফটকগুলো আরো তিনটে ঘরে গিয়ে পড়েছে। সে ঘরগুলোর ছাদ প্রথমটার চেয়ে উঁচু। এ সব ঘরও ফাঁকা। কেবল তৃতীয় ঘরটায় দেখা গেল মেঝে থেকে ছাদ পর্যন্ত ওঠা ছাই রঙা পাথরের তৈরী একটা গোল জিনিস। তাকে বেড় দিয়ে উঠেছে একটা অংশত ভাঙা সিঁড়ি। সিঁড়ির মাথাটা অদৃশ্য হয়ে গেছে জঞ্জালে ভরা একটা গর্তে। গোল স্তম্ভটার নিচে কয়েকটা খুব ছোট ছোট গর্ত, ইঁদুরও তার মধ্যে দিয়ে গলতে পারে না।

একটা ফুটোর ভিতর দিয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে থাকতে মনে হল যেন একটা ক্ষীণ আলো দেখতে পেলাম। আবার তাকালাম, আবার সেই অদ্ভুত আলো। অধ্যাপককে আমার আবিষ্কারের কথা জানালাম। ভদ্রলোক বেশ অনিচ্ছার সঙ্গেই তাঁর পাথরের স্তূপ ছেড়ে আমার সঙ্গে এলেন। গোল স্তম্ভটা তাঁকে দেখালাম, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা, জিনিসটা দেখে ভদ্রলোক এতটুকুও পুলকিত হলেন না।

তানিয়াও আমাদের পিছন পিছন এসেছিল। অধ্যাপক তাকে বললেন, 'বাইরে যে মিনারেটের মতো একটা স্তম্ভ রয়েছে এটা তার ভিৎ। ধ্বংসের হাত থেকে একমাত্র এইটেই রক্ষা পেয়েছে। তাতে অবাক হবারও কিছু নেই, কারণ জিনিসটা তৈরী শক্ত সবুজ পাথর দিয়ে।'

স্তম্ভের সেই আলোর কথা আবার বলতে অধ্যাপক হাত নেড়ে আমায় নাকচ করে দিলেন।

'ও কোন বার্নিশ করা টালি হবে আরকি,' অধ্যাপক বললেন, 'প্রাচীন জ্যোতির্বিদরা ঐ সিঁড়ি দিয়েই স্তম্ভের মাথায় উঠতেন। ভিতরটা যে ফাঁকা তার কারণ বাড়ি তৈরীর রসদ বাঁচানর চেষ্টা। কোন দরজাও নেই।'

ভদ্রলোক ফিরতে যাবেন, এমন সময় দেয়ালের গায়ে একটা সরু ফাটলের দিকে তাঁর চোখ পড়ল।

'আরে, এটা তো বেশ ভাল জিনিস পাওয়া গেছে!'

একটা খোলা জায়গা অধ্যাপক দেখিয়ে দিলেন। জায়গাটা নিশ্চয়ই একসময় দরজার কাজ করত। কারণ ভিতরে ধুলোবালি পাথরের আবর্জনার নিচে একটা সিঁড়ির মাথা দেখতে পাওয়া গেল।

'তানিয়া, তোমার মনে আছে নিশ্চয়, এখানে যে আরেকটা তলা, তার মানে একতলা একটা থাকতে পারে, সে কথা আমি আগেও বলেছিলাম। নিচে যাবার এই প্রথম সিঁড়ি পাওয়া গেল। এখানেই খুঁড়তে হবে। ইভান তিমোফেয়েভিচ, কটা বাজল বলুন তো?'

'পাঁচটা।'

'ও, তাই এত ক্ষিধে পেয়েছে! চল, উপরে যাই।'

উপরে ভীষণ গরম। চারদিক শুকনো খটখটে। রোদের প্রচণ্ড তেজ। নিচের ঘরের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে অনেকক্ষণ পর্যন্ত চোখে কিছুই দেখতে পেলাম না। আমি একটু পিছিয়ে পড়ে মানমন্দিরের পাহাড়ের মাথা থেকে চারপাশটা একবার দেখে নিলাম।

মানমন্দিরের বাঁয়ে পাহাড়ের একটা চ্যাপ্টা গায়ে আমাদের তাঁবুদুটো। মানমন্দিরটা দাঁড়িয়ে আছে একটা মস্ত গম্বুজের মতো চওড়া পাহাড়ের উপর। তার চারপাশে ওরকম আরো আটটা ছোট পাহাড়। তাদের গায়ে খাড়া শক্ত ঘাস। উত্তরাঞ্চলের নরম সরস ঘাসের সঙ্গে সে ঘাসের কোনই মিল

নেই। বড় বড় দানা বালি আর ঘাসের ভিতর থেকে বেরিয়ে আছে কালো কালো পাথর। মানমন্দিরের পাহাড়টার গায়ের পাৎলা মাটির স্তরের ভিতর থেকে যে পাথর দেখা যায় তাদের রং অনেকটা ফিকে। তার ফলে মানমন্দিরের পাহাড়টা তার কালো প্রতিবেশীদের থেকে আলাদাভাবে চোখে পড়ে।

বিশাল এক সমতল প্রান্তরের একধারে এই নটা পাহাড় একসঙ্গে দাঁড়িয়ে। প্রান্তরটা দক্ষিণদিকে ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে গেছে। পশ্চিমে দিগন্তের কাছে দেখা যায় করাতের মতো খাঁজ-কাটা বরফ-ঢাকা পাহাড়ের মাথা। সেইদিকেই আমার ডান হাতি একটা ছোট্ট সরু নদীর ধারা। পাহাড় থেকে বেরিয়ে এসে নদীটা প্রান্তরের ভিতর দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে। তারপর মানমন্দিরটাকে পাক দিয়ে চলে গেছে পূবে মরুভূমির ভিতর। নুর-ই-দেশ্তের কাছাকাছি স্তেপটার রং হলদে। আর তার বুকে দেখা দিয়েছে যত রুপোলি ওয়ার্মউড আর ফিকে-নীল কাঁটা ঝোপ। আরো উত্তরে সাকসাউল কুঞ্জের কালো রেখা।

শান্ত অসীম দৃশ্য। পাহাড়ের খোলা হাওয়া। মাথার উপরে উত্তপ্ত, নীল আকাশ ...

নুর-ই-দেশ্তে আসতে পারাটা অসীম সৌভাগ্যই বলতে হবে। গভীর শান্তির আনন্দে প্লাবিত আমার মন প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে তখন মিলিয়ে দিয়েছে। হৃদয়টা যেন এতদিন এর জন্যই তৃষিত ছিল।

'ইভান তিমোফেয়েভিচ,' তানিয়ার ভাই ভিয়াচিকের গলা শোনা গেল, 'খাবার তৈরী!'

'কোথায় লুকিয়ে ছিলেন?' তাঁবুর কাছে আসতে তানিয়া বলল, 'আমি কেমন চমৎকার স্নান করে এলাম। আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারলাম না বলে দুঃখ হচ্ছিল। নিন, খেয়ে নিন। নদী এখন বিকালের জন্য তোলা থাক।'

খাওয়ার পর একটু জিরিয়ে নিয়ে সুরু হল অধ্যাপকের খুঁজে পাওয়া সিঁড়িটা খুঁড়ে বের করার কাজ। সিঁড়িটা বালিপাথর খুঁড়ে তৈরী করা একটা চওড়া সুরঙ্গে গিয়ে পড়েছে। ভাঙা পাথরের আবর্জনায় সুরঙ্গটার মাথা পর্যন্ত গেছে ঢেকে। কাজ যা এগল তা এতই সামান্য যে বেশ বোঝা গেল শেষ করতে হলে অনেকদিনের সযত্ন প্রয়াসের প্রয়োজন।

কাজ শেষ হলে পর তানিয়াকে তার প্রতিশ্রুতি মনে করিয়ে দিলাম। নদীর ধার দিয়ে একটা সরু পথ ধরে তানিয়া আমায় নিয়ে গেল পাশের একটা পাহাড়ের পায়ের কাছে। নিঃশব্দে তানিয়ার পিছন পিছন এগতে লাগলাম। নিচে স্রোতের বুকের উপর দিয়ে বয়ে চলেছে সূর্যের আলো, ভেসে আসছে ছুটে চলা জলের শব্দ।

নদীর একটা বাঁকের মুখে এসে তানিয়া বলল, 'এখানে বসুন, আমি এক্ষুণি আসছি। বাঁকের মুখে ভিয়াচিক আর আমি একটা বাঁধ দিয়েছি। বেশ কোমর পর্যন্ত জল হয়েছে।'

বাঁকের আড়ালে তানিয়া অদৃশ্য হয়ে গেল। আমিও ঝিরঝিরে হাওয়ার দিকে মুখ করে ঘাসের উপর শুয়ে পড়লাম। জলের শব্দে কেমন ঘুম এসে গেল।

'ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি? তাড়াতাড়ি উঠুন! চমৎকার স্নানের ব্যবস্থা হয়েছে!'

চোখের সামনে দাঁড়িয়ে তানিয়া সজীব সতেজ। আলো জল বাতাসের সহযোগে ফুটে ওঠা যৌবনের নিখুঁৎ সৌন্দর্যে বিকশিত তানিয়া।

লাফিয়ে উঠে বাঁকটা ঘুরে দেখতে পেলাম একটা ছোট্ট তটের পাশে ছোট্ট বাঁধ। দুটো বাঁকা বেঁটে গাছ এই আদিম স্নানের জায়গাটাকে পাহারা দিচ্ছে। কয়েক মিনিট পরেই সেই অগভীর জলে শুয়ে পড়ে সাঁতার কাটতে শুরু করলাম। ঠাণ্ডা জল থেকে যখন উঠে এলাম তখন আমি একেবারে নতুন মানুষ।

ক্যাম্পে ফিরে এসে দেখি অধ্যাপক আর ভিয়াচিক গরম চা নিয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

'কেমন সাঁতার কাটলেন, ভাল?' অধ্যাপক বললেন, 'আচ্ছা, এবার আমাদের ভূবিজ্ঞানীকে একটা ধাঁধা জিজ্ঞেস করি! নদীটায় অদ্ভুত কিছু দেখতে পেলেন কি? মেজর সাহেব, যুদ্ধের ফলে আপনার ভূবিদ্যার সব বিদ্যে দেখছি উপে গেছে। প্রাচীন পুঁথিপত্তরে এই নদীটার নাম হচ্ছে "একিক"। একিক মানে হল কর্নেলিয়ান। নদীর ভিতর নুড়ির মধ্যে সত্যিই লাল কর্নেলিয়ান পাথর পাওয়া যায়। পরের বার যখন যাবেন তখন কথাটা যে সত্যি তার প্রমাণ নিশ্চয়ই পাবেন।'

খোঁড়ার কাজটা দেখা গেল যা ভাবা হয়েছিল তার চেয়ে অনেক কঠিন। সিঁড়ির উপর থেকে অনবরত মাটি আর পাথর ঝরে পড়ছে। চারদিন ধরে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করে চললাম। দু'হাতে তখন অসীম শক্তি অনুভব করছি। সত্তার কোন দূর কোণ থেকে উঠে আসছে বসন্তের ফুলের মতো সজীব আর চারপাশের ঐ পরিবেশের মতো শান্ত এক সুন্দর অনুভূতি। প্রাণের এক গভীর আনন্দ আমায় তখন তুলে ধরেছে। তার ফলে দূর হয়ে গেছে সব শ্রান্তি ক্লান্তি ভাবনা চিন্তা। অন্যান্য সুস্থ লোকেদের মতো আমারও সব শারীরিক গোলমাল মিটে গিয়ে সারা দেহ ভরে উঠেছে এক অসীম শক্তির অনুভূতিতে।

আমার এই অনুভূতির বিশ্লেষণ তখন সম্ভব হয়নি, তা সম্ভব হল কেবল এখন। সে সময়ে কেবল নূর-ই-দেশ্‌তের ছোট্ট জগতটার তারিফেই তার প্রকাশ ঘটেছিল। নগ্ন পাথুরে পাহাড়, সেই সঙ্গে লাল উত্তপ্ত সূর্য আর বালির অত্যাচারে শীর্ণ করুণ ধ্বংসাবশেষের রহস্যময় সৌন্দর্য নিয়ে তখন মাথা ঘামাচ্ছি।

তানিয়া আর অধ্যাপকের কাছে আমার মনের কথা প্রকাশ করতে দেখলাম তাঁরাও এ বিষয়ে সমান উৎসাহী।

'আপনার চেয়ে আমিও কম ধাঁধায় পড়িনি,' অধ্যাপক বললেন, 'এটুকুই কেবল বলতে পারি আর কোন জায়গায় এত ভালো বোধ করিনি।'

'শুধু তাই নয়,' তানিয়া বলে উঠল, 'জীবনে আর কখনো এরকম উচ্ছল আনন্দ অনুভব করিনি। এই মানমন্দিরটা যেন ... যেন, পৃথিবী, আকাশ আর সূর্যের মন্দির। এই আকাশ বাতাস ভরে যেন নামহীন মুক্ত অথচ সুন্দর কিছু একটা আছে। এই মানমন্দির যেন তারও মন্দির। এর চেয়েও সুন্দর জায়গা আমি অনেক দেখেছি। কিন্তু এই ধ্বংসাবশেষের মতো মোহনীয় আর কিছু কখনো চোখে পড়েনি যদিও এর মধ্যে দেখবার মতো তেমন কিছু নেই।'

আরেকটা কাজের দিন শেষ হয়ে সন্ধ্যা নামল। অথচ কারো ঘুমতে যাবার ইচ্ছা নেই। রাত্রে আমরা তিনজনে আগুন ঘিরে শুয়ে পড়লাম। মাথার উপরের বিরাট কালো গম্বুজটার মাঝখানে নীল হীরার মতো জ্বলছে অভিজিৎ নক্ষত্র। পশ্চিমে পেঁচার চোখের মতো তাকিয়ে আছে সোনালি আর্কটুরাস্‌। ওদিকে

গলান রুপোর মতো ছড়িয়ে আছে ছায়াপথের তারাকণিকা। দিগন্তের ঠিক উপরে দেখা যাচ্ছে বৃশ্চিক রাশিচক্রের হৃদয়। ডাইনে ধনু রাশিচক্রের নিষ্প্রভ ছুঁচলো ডগাটা দেখিয়ে দিচ্ছে নক্ষত্রমণ্ডলীর বিরাট তারকাচক্রের অক্ষ, আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রস্থ "সূর্য"। সে সূর্যকে আমরা কখনই দেখতে পাব না কারণ বিরাট কালো পর্দার আবরণে তার মুখ ঢাকা।

এই সংখ্যাতীত জগৎরাজ্যে জীবনের অস্তিত্ব অবশ্যম্ভাবী — অদ্ভুত অসীম বৈচিত্র্যে ভরা জীবন। ঐ দুর্গম আকাশরাজ্যেও চিন্তাশক্তির অধিকারী সজীব প্রাণী আছে। মানব জাতির সামনে যে কী বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে তার অস্পষ্ট আভাস মাত্রে আমার দেহমন কেঁপে উঠছে। আর বৃথাই তাকে দেখবার প্রাণপণ চেষ্টা করছি। মানুষের চিন্তা আর আকাংক্ষার অমূল্য সম্পদকে ধ্বংসের ভয় দেখিয়ে চলেছে যে অন্ধ পশু শক্তি পৃথিবীর সন্তানরা যেদিন তার হাত থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করতে পারবে সেদিনই এই বিরাট সম্ভাবনা রূপগ্রহণ করবে, তার আগে নয়।

'ইভান তিমোফেয়েভিচ, জেগে আছেন?' অধ্যাপক জিজ্ঞেস করলেন।

'হ্যাঁ, তারা দেখছি ...' জবাব দিলাম, 'তারাগুলোকে খুব কাছে আর স্পষ্ট বলে মনে হচ্ছে।'

'তা তো হবেই, মানমন্দির যারা তৈরী করেছে, তারা কি আর শুধু শুধুই এ জায়গাটা বেছেছিল। মধ্য এশিয়ার মধ্যেও এ জায়গাটার আবহাওয়া খুবই পরিষ্কার আর উজ্জ্বল। এখানকার লোকেরা চিরকাল জ্যোতিষে যে ভাল করে এসেছে, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। ধ্রুবতারাকে কিরগিজরা বলে আকাশের রুপোলি খোঁটা। তিনটে ঘোড়া তাতে বাঁধা। চারটে নেকড়ে বাঘ সর্বদা খোঁটাটার চারদিকে তাদের তাড়া করে চলেছে। কিরগিজদের ধারণা নেকড়ে বাঘরা যেদিন ঘোড়া তিনটেকে ধরে ফেলবে সেদিন সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে। সপ্তর্ষির আবর্তনের কেমন কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা দেখলেন তো?'

'এর চেয়ে ভাল আর হয় না, মাৎভেই আন্দ্রেয়েভিচ! এ শুনে দক্ষিণ গোলার্ধের আকাশ সম্বন্ধে একটা কথা পড়েছিলাম, মনে পড়ে গেল... অনেক উঁচুতে দক্ষিণ ক্রসের কাছে ছায়াপথের ভিতর ন্যাসপাতির আকারের একটা খুব কালো জায়গা আছে — বিরাট পরিমাণ কালো পদার্থ। জ্যোতিষীরা

বলেন, এ হচ্ছে কালো মাগেলানিক মেঘপুঞ্জ। প্রাচীন কালের নাবিকরা তার নাম দিয়েছিল, কয়লার বস্তা। অস্ট্রেলিয়ার এক পুরনো উপকথা অনুসারে ও জায়গাটা হচ্ছে একটা গভীর গর্ত, আকাশের গায়ের ফাটল। আরেক উপকথায় বলে, দক্ষিণ ক্রসের তারাদের নিয়ে যে গাছের সৃষ্টি হয়েছে এমু পাখির রূপ নিয়ে অমঙ্গল তার নিচে বসে আছে। কারণ গাছের ভিতরে একটা অপোস্সাম লুকিয়ে আছে। এমুর হাতে যেদিন অপোস্সামটা ধরা পড়বে, সেদিন সৃষ্টি ধ্বংস হবে।'

'গল্পদুটোয় বেশ মিল রয়েছে, কেবল জন্তুগুলো আলাদা,' অলসভাবে বললেন অধ্যাপক।

'আচ্ছা, অধ্যাপক, নুর-ই-দেশ্‌ৎ কাদের তৈরী, এমন জনমানুষ শূন্য জায়গাতেই বা তারা মানমন্দিরটা করল কেন?'

'এই মানমন্দির আরব সন্ন্যাসীদের শিষ্য, উইগুর জ্যোতিষীদের তৈরী। এজায়গাটা মরুভূমিতে পরিণত হয় মঙ্গোল আক্রমণের পর। চারপাশে অনেক ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। তা থেকে বোঝা যায় সাতশ বছর আগে এজায়গায় অনেক লোকজনের বসবাস ছিল। এরকম মানমন্দির তৈরী করতে হলে যথেষ্ট ধনদৌলত, উঁচুদরের সভ্যতার প্রয়োজন আর ...'

অধ্যাপকের গলা হঠাৎ মিলিয়ে গেল। কিছু একটা ঘটেছে, কিন্তু সেটা যে কী তা তখন তখনই বুঝতে পারিনি। আরেকটা ঝাঁকানিতেই পৃথিবী কেঁপে উঠল, যেন আমাদের তল দিয়ে বয়ে গেল একটা পাথুরে ঢেউ। পরমুহূর্তেই শুনতে পেলাম আমাদের নিচে পৃথিবীর গর্ভে বহুদূর থেকে উঠে আসা একটা চাপা গর্জন। তাঁবুর কাছে বাক্সের মধ্যে রান্নার জিনিসপত্রের ঠুংঠাং আওয়াজ, স্ফুলিঙ্গের ঝর্ণা তুলে আগুনের কাঠগুলো ছিটকে গেল এদিক ওদিক। তারপর সুরু হল একের পর এক ভূকম্পন।

ভূমিকম্পটা যেমন হঠাৎ সুরু হয়েছিল তেমনি হঠাৎই মিলিয়ে গেল। পরবর্তী চাপা নিস্তব্ধতায় শুনতে পেলাম কেবল পাহাড়ের গা বেয়ে আর মানমন্দিরের ভিতরে গড়িয়ে পড়া পাথরের শব্দ।

পরদিন মানমন্দিরে কতগুলো অপ্রত্যাশিত পরিবর্তন চোখে পড়ল। যেসব মাটি আর পাথর আমরা খুঁড়ে বের করেছিলাম ভূমিকম্পে সে সব ধসে গেছে। তার ফলে বেরিয়ে পড়েছে একটা অগভীর কুলুঙ্গি, তার উপরে

ছুঁচল মাথা খিলান। কুলুঙ্গির ভিতরে একটা চেপ্টা পাথর। তার গায়ে কিউফিক লিপিতে জড়িয়ে জড়িয়ে কী যেন লেখা। সাধারণ লোকের কাছে তা একেবারেই অর্থহীন।

এই নতুন জিনিসটা পেয়ে আমরা খুসি হলাম কিন্তু সেইসঙ্গে সিঁড়ির মাথাটা আবার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দুঃখও হল। যা হোক সঙ্গে সঙ্গেই পাথরটার শতাব্দী সঞ্চিত ধুলোবালি পরিষ্কারের কাজে লেগে গেলাম। পাথরের গাটা বেশ মসৃণ আর নীল। খোদাই করা লিপির গায়ে সবুজে মেশান কমলা রঙের সুন্দর এনামেল করা।

তানিয়া আর অধ্যাপক লিপির পাঠোদ্ধার সুরু করলেন। ভিয়াচিক আর আমি আবার লেগে গেলাম সিঁড়ির মাথাটা খুঁড়ে বের করার কাজে।

অধ্যাপক কিছুক্ষণ পর খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে সজোরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'নাঃ, এতে বিশেষ কিছুই নেই। আগে যা জেনেছিলাম তারই সমর্থন কেবল পাওয়া গেল। এতে বলা হয়েছে, অমুকের আদেশে অমুক সালে, কোভাস্ মাসে... কোভাস্ মানে তো আরবী ভাষায় ধনুরাশি তাই না, তানিয়া?'

'হ্যাঁ।'

'নভেম্বর মাসে, নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয় নুর-ই-দেশ্‌তে, একিক নদীর তীরে, ...পাহাড়ে। কী পাহাড়, তানিয়া?'

'ঠিক বুঝতে পারছি না... বোধহয় রোশ্‌নি পেয়ালা।'

'কবিত্ব! "রোশ্‌নি পেয়ালা" পাহাড়ে, যেখানে এককালে বাদশাহী রঙের সঞ্চয় ছিল... মেজর, এবার আপনার বিষয় এসে গেছে। বাদশাহী রংটা কী ব্যাপার বলুন তো?'

'তা তো জানি না!'

'আরে, সেকি! আপনি না এককালে ভূবিজ্ঞানী ছিলেন?' অধ্যাপক ঠাট্টা করে বললেন।

'সবকিছুরই সময় আছে, অধ্যাপক। সিঁড়ির কাজটা শেষ করেই আমি ছুটির দরখাস্ত দেব। কয়েক ঘণ্টা একটু বেড়িয়ে আসতে চাই। বলা যায় না, আমার ভূবিদ্যা এখনো হয়ত কাজে লেগে যেতে পারে। এখন পর্যন্ত তো কেবল নদী থেকে গম্বুজ আর গম্বুজ থেকে তাঁবুর রাস্তাটুকু চিনেছি।'

'ঠিক বলেছেন,' অধ্যাপক হেসে বললেন, 'প্রত্নতাত্ত্বিকের জীবনের স্বাদ এবার পেয়েছেন তো — আমাদের নাক সবসময় মাটিতে ঠেকান। কাল তবে আর খোঁড়ার কাজ নয়, ছুটি দিতেই হবে। তানিয়া ধোয়া মোছা করবে। কী তানিয়া? তুমি কী করবে বল, ভূবিদ্যার চর্চা?'

'পাথরের এই লিপিতে আর কী আছে?' তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম।

'লেখা আছে একটা খুব বড় গোছের ঘটনার স্মৃতিতে এই শিলালিপি রচিত, একটা ফুলদানীতে বাড়িটার বর্ণনাও দেওয়া হয়েছে।'

'মানমন্দিরটার পরিচয়ের জন্য তবে তো ফুলদানীটা খুঁজে বের করা প্রয়োজন।'

'নিশ্চয়ই, কিন্তু ফুলদানীটা যে কোথায় তা কিছু বলা নেই। ভিতের কাছেই যে কোথাও আছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সিঁড়িটাই খুঁড়ে বের করা যাচ্ছে না, ফুলদানী পাওয়া তো দূরের কথা।'

পরদিন সকালে বনমুরগি শিকারের আশায় ভিয়াচিকের শট্-গানটা চেয়ে নিলাম। তারপর অধ্যাপকের অনেক ঠাট্টা হজম করে তানিয়াকে নিয়ে নামতে লাগলাম পাহাড়ের উৎরাই বেয়ে। তানিয়া বলল ধ্বংসাবশেষের কাজ নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকায় আগে কখনো সে নুর-ই-দেশ্‌ৎ ছেড়ে বেশি দূরে যায়নি।

সে দিন অসাধারণ গরম পড়েছে। পাথরের গা থেকে ওঠা শুষ্ক তাপ দূর করার মতো হাওয়া একফোঁটাও নেই। চারিদিক সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। পাহাড়ের চড়াই উৎরাই ভেঙে আমরা অনেকক্ষণ বেড়ালাম। শেষকালে গরমের চোটে নদীর ধারে গিয়ে জল খেয়ে তেষ্টা মেটাতে হল। তারপর খালি পায়ে নদীর বুকের আলগা পাথরগুলোর উপর দিয়ে হাঁটতে সুরু করলাম। শান্ত জলের বুকে কালো আর ছাই রঙের নুড়ির মাঝে মাঝে চোখে পড়ল নানা রঙের চকচকে ওপ্যাল আর কাল্‌সিডনি।

সবকিছু ভুলে আমরা পাথর কুড়তে লাগলাম। পা ঠাণ্ডায় জমে যাবার জোগাড় হতে জল ছেড়ে উঠলাম। রোদে তেতে ওঠা পাথরের উপর বসে প্রথমে পা গরম করে নেওয়া গেল। তারপর সুরু হল আহরিত ধনসম্পদ বাছাইয়ের কাজ।

'লালগুলো, তানিয়া, এখানে রাখুন। এগুলো হল কর্নেলিয়ান। প্রাচীন

কালে লোকেরা এ পাথর খুব মূল্যবান বলে মনে করত, ওষুধ হিসাবে এদের বিশেষ খ্যাতি ছিল।'

'বেশির ভাগই তো দেখছি লাল পাথর। দেখুন, কী সুন্দর!' তানিয়া চেঁচিয়ে উঠল, 'আপনি পেয়েছেন বুঝি? কী স্বচ্ছ! মুক্তোর মতো ঝকমক করছে।'

'এ হচ্ছে আগুনে ওপ্যাল, সবচেয়ে দামী ওপ্যাল। তানিয়া, এটা আপনিই নিন, ব্রোচ বানাবেন।'

'না, ধন্যবাদ। চুড়ি ছাড়া ব্রোচ আংটি ও সব আমার একটুও ভাল লাগে না। অবশ্য যদি স্মরণ চিহ্ন হিসেবে দেন, তবে নেব। ধন্যবাদ। এই তিনটে পাথর নিয়ে কী করবেন — কীরকম ম্যাটমেটে, বিশ্রী দেখতে।'

'সেকি, তানিয়া, এগুলো তো সবচেয়ে ভাল পাথর। দেখুন!'

নিষ্প্রভ সাদা পাথরটাকে জলে ছেড়ে দিলাম। পাথরটা স্বচ্ছ হয়ে উঠে নীল আগুনের ছটায় ভরে গেল।

'কী সুন্দর!' অর্ধস্ফুট স্বরে বলে উঠল মুগ্ধ তানিয়া।

'সুন্দর না? অথচ এক মিনিট আগেই কী বিশ্রী দেখাচ্ছিল। প্রাচীন কালের লোকেরা এদের বলত যাদু পাথর। এরা হল হাইড্রোফেন, ওপ্যালের আরেক জাত। এদের গায়ে ছোট ছোট অজস্র ফুটো আছে। তাই শুকনো অবস্থায় এরা অনচ্ছ। কিন্তু জলে ডোবান মাত্র স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। তখন ভারি সুন্দর দেখায়। সিলিকারই রকমফের এরা। সিলিকার নানা রকম জাত আছে। রং, গুণ আর সৌন্দর্যের বৈচিত্র্যে তারা ভিন্ন।'

'আচ্ছা, আমাদের এই বেড়ানয় ভূবিজ্ঞানী হিসেবে কী ফল পেলেন বলুন।'

'এতক্ষণে চারপাশের জায়গাটার একটা মোটামুটি পুরো ছবি পাওয়া গেল। ভূবিজ্ঞানীর পক্ষে জায়গাটা যে খুব কৌতূহলপ্রদ তা অবশ্য বলা যায় না। খালি প্রাচীন গ্র্যানাইট আর স্ফটিকের স্তরওয়ালা কালো কোয়ার্ৎজাইট-এর আস্তর। "রোশ্নি পেয়ালা"টা অন্য পাহাড়গুলোর চেয়ে কিছুটা স্বতন্ত্র। খুব শক্ত কাচের মতো কোয়ার্ৎজাইট দিয়ে তৈরী। এই সুন্দর পাথরগুলো হচ্ছে নদীর জলে ধুয়ে যাওয়া কোয়ার্ৎজাইটের অবশিষ্ট। এখানে নিশ্চয় অনেক কাল্সিডনি আর ওপ্যাল পাওয়া যাবে।'

'কিন্তু শিলালিপির সেই বাদশাহী রঙের কী হল?'

'তা তো জানি না। নিজেই তো দেখলেন, ও রঙের কোন চিহ্নই কোথাও নেই। হয়ত মানমন্দিরের নিচে লুকন রয়েছে।'

'অধ্যাপক আবার ঠাট্টা-তামাশা করবেন,' তানিয়া বলল। 'ঐ দেখুন, সূর্য ডুবছে। চলুন, তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। অন্ধকার হবার আগেই পেঁছন চাই।'

সূর্যাস্তের লাল আলোয় পাহাড়গুলোর গোল পিঠ পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। হাওয়া নেই বলে আরো জমাট বেঁধেছে মরুভূমির গম্ভীর নিস্তব্ধতা। মানমন্দিরের পাহাড়ে যখন পেঁছলাম পশ্চিম আকাশে তখন সূর্যের আলো একেবারেই মিলিয়ে গেছে।

আমাদের দিকে নীরবে তাকিয়ে থাকা মানমন্দিরটা তারার আলোয় প্রায় অদৃশ্য। মাঝে মাঝে কেবল শোনা যায় পেঁচার ডাক। রাতটা কেমন একটা অদ্ভুত বিপদের আশংকায় ছেয়ে আছে। আমরাও পা টিপে টিপে চলেছি। কথা বলছি ফিসফিস করে যেন ভয় হয়েছে পাছে অন্ধকার দেয়ালগুলোর আড়ালে শুয়ে থাকা দৈত্যটার ঘুম যায় ভেঙে।

হঠাৎ মনে হল সারা দিনের ক্লান্তি যেন দূর হয়ে গেছে। তার বদলে একটা তেজের স্রোত আমার সারা শরীর ভাসিয়ে দিয়ে বয়ে চলেছে। দেয়াল থেকে বেরন প্রচণ্ড তাপ সত্ত্বেও নিস্তরঙ্গ শুকনো বাতাসটা আমাদের সজীব করে তুলেছে। আমার গায়ের উপর দিয়ে খেলে গেল আরামের স্বল্প শিহরণ।

'মনে হচ্ছে, একটুও যেন ক্লান্ত নই,' তানিয়া ফিসফিস করে বলল আমার খুব কাছে এগিয়ে এসে। আমাদের কাঁধে কাঁধ ঠেকে গেল, 'এ হাওয়ায় যেন কী আছে...'

'হ্যাঁ, মনে হচ্ছে যেন ডাইনামোর কাছে দাঁড়িয়ে আছি। চুলটা ঠিক করে নিন, তানিয়া, ঘেঁটে গেছে।'

তানিয়া চুলের উপর দিয়ে হাত বুলিয়ে নিল। তার আঙুলের আড়াল থেকে চমকে উঠল অজস্র নীল স্ফুলিঙ্গ।

'ঝড় আসছে নাকি?' তানিয়া বলে উঠল, 'না, আকাশটা তো বেশ পরিষ্কার দেখছি, গুমোটও নেই।'

'সেটাই অদ্ভুত! জায়গাটা বড় রহস্যময়...' কথার মাঝখানেই থেমে গেলাম। দেয়ালের ফাটলের ভিতর দিয়ে চোখে পড়ল একটা ক্ষীণ সবুজ আলো।

কোয়াড্রাণ্ট বসান মূল বাড়িটার দিকে আমরা এগলাম। ভালভাবে নজর করে দেখলাম পোর্টিকোর ভিতরের দেয়ালে যে সব অক্ষর লেখা রয়েছে তারই কতগুলো থেকে আলোটা আসছে।

'দেখুন!' তানিয়াকে ফাটলের কাছে এনে বললাম।

পরিষ্কার দেখতে পেলাম খিলানগুলোর কালো ছায়ায় সাপের মতো পাকান লিপি। তা থেকেই ঠিকরচ্ছে হলদে-সবুজ আলো।

'এটা কী ব্যাপার?' তানিয়া উৎকণ্ঠার সঙ্গে বলে উঠল, 'এখানে অনেক শিলালিপি, কিন্তু আলো তো তাদের গায়ে কখনো দেখিনি।'

'অন্যগুলো সবকটাই সোনার রঙে আঁকা, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'এটা... দাঁড়ান!'

পোর্টিকোর ভিতরে কোনরকমে ঢুকে দেশলাই জ্বালাতে ক্ষীণ আলোটা মুহূর্তের মধ্যেই গেল অদৃশ্য হয়ে। কেবল ফাঁকা দেয়ালটা দেখা গেল। কিন্তু দেশলাই কাঠিটা নিভে যাবার আগে চোখে পড়ল কমলা-সবুজ অক্ষরে ঢাকা একটা মসৃণ চকচকে টালির টুকরো।

'এটায় সোনার রঙের বদলে লাগান হয়েছে সিঁড়ির কাছের গম্বুজটায় যে এনামেল দেখেছি তাই!'

'তবে চলুন, ওখানে গিয়ে একবার দেখে আসি!' তানিয়া তাড়াতাড়ি বলে উঠল।

'চলুন। আপনি আর অধ্যাপক বুঝি রাত্রের দিকে এখানে কখন আসেননি?'

'না।'

'তবে শুনুন। আমরা এখন ক্যাম্পে ফিরে যাই। যা দেখলেন সে বিষয়ে একটি কথাও বলবেন না। খাবার পর সবাই যখন শুতে যাবে তখন আবার আমরা এখানে আসব। আপনি যদি ক্লান্ত হয়ে থাকেন তবে আমি একাই আসব।'

'না, না! আমি একটুও ক্লান্ত নই। ব্যাপারটা খুব রোমাঞ্চকর!'

'খুব ভাল। কিন্তু একটা কথা মনে রাখবেন — অধ্যাপককে এ বিষয়ে একটি কথাও বলা চলবে না। আমাদের সন্ধানের ফল কী হবে জানি না।

কিন্তু আমরা দুজনে যদি রহস্যটার সমাধান করতে পারি, তবে অধ্যাপক কালকে খুব অবাক হয়ে যাবেন।'

তানিয়ার উত্তপ্ত, শক্তিশালী হাতটা আমার হাত চেপে ধরল। আমরা ছুটে তাঁবুর দিকে নেমে গেলাম। সেখানে তখনো আগুন জ্বলছে। খাবার সময় এসে পেঁছতে পারিনি বলে অধ্যাপক একটু বিরক্তি প্রকাশ করলেন। তানিয়ার কথাই সত্যি হল। প্রাচীন রঙের সঞ্চয়টা খুঁজে পাইনি জানান মাত্র অধ্যাপক ঠাট্টা-তামাশা জুড়ে দিলেন।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে। তানিয়াকে নিয়ে কোথায় গিয়ে খোঁজ করছিলেন, তা আর আমায় জানানর দরকার নেই — নিশ্চয়ই কোন নির্জন জায়গায়! হাঃ হাঃ হাঃ! রাগ করবেন না! দেখি, আপনাদের পাথর ... ওঃ! অনেক রকমের কর্নেলিয়ান জোগাড় করেছেন দেখছি। একাজে পাঠালে আপনারা দেখছি বস্তা ভরে কর্নেলিয়ান আনতে পারবেন। বড়ই দুঃখের কথা, কর্নেলিয়ানকে এখন আর কেউ তেমন মূল্যবান বলে মনে করে না! আমরা আধুনিকেরা যে কেমন করে বহু শতাব্দীর সঞ্চিত জ্ঞান অবহেলায় নষ্ট করি এ হল তারই আরেকটি নিদর্শন। প্রাচীন কালে প্রাচ্য দেশে কর্নেলিয়ানের মতো দামী রত্ন আর ছিল না। এই পাথর দিয়ে চুড়ি, হার, বকলস বানান হত। সে যুগে লোকের বিশ্বাস ছিল, কর্নেলিয়ান দিয়ে নানারকম অসুখ সারান যায়। আশ্চর্যের কথা, এটা কিন্তু কোন কুসংস্কার নয়। এই সেদিন দেখলাম ...' অধ্যাপক চুপ করে গিয়ে ক্যাম্পফায়ারের আলোয় লাল পাথরটার দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবতে লাগলেন।

'কী দেখলেন, অধ্যাপক?' তানিয়া তাঁকে কথার খেই ধরিয়ে দিল।

'ওঃ, দেখলাম ডাক্তাররাও কর্নেলিয়ানের অসুখ সারানর ক্ষমতা নিয়ে পরীক্ষা করছেন। দেখা গেছে অল্প কয়েকটা ব্যতিক্রম বাদে কর্নেলিয়ান প্রধানত তেজস্ক্রিয়। অবশ্য খুবই স্বল্প পরিমাণে, মানুষের শরীরের তেজস্ক্রিয়তার সমান। কিন্তু ঐটুকু তেজস্ক্রিয়তার জন্যই স্নায়ুতন্ত্রের পক্ষে কর্নেলিয়ান উপকারী। কর্নেলিয়ান কীভাবে জানি না স্নায়ুর স্বাভাবিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনতে পারে।'

রেডিয়াম! কথাটা হঠাৎ মাথার মধ্যে চমকে উঠল। সেইসঙ্গে আরো অনেক কথা: ইলেক্‌ট্রিক ডিসচার্জ, আলোকোদ্ভাসিত লেখা, কমলা-সবুজ রং...

অধীর হয়ে লাফিয়ে উঠেই তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে দেশলাই খুঁজতে সুরু করলাম।

'কী হল, ইভান তিমোফেয়েভিচ?' অধ্যাপকের মনে সন্দেহ দেখা দিল, 'যাক, এবার শোবার সময় হয়েছে। কাল খুব সকালে আবার কাজ সুরু হবে। হয়ত রাত্রের আগেই নিচের তলায় আমরা ঢুকতে পারব। আপনারা যদি ঘুমতে না চান তো বসুন। ভিয়াচিক, এস!'

তানিয়া আর আমি আগুনের ধারেই বসে রইলাম। খালি সিগারেট ফুঁকছি, আর ভাবছি কখন অধ্যাপকের নাক ডাকতে সুরু করে। তা হলেই কয়েকটা মোমবাতি নিয়ে বেরিয়ে পড়ব নুর-ই-দেশ্‌ৎ মানমন্দিরের রহস্য সমাধানে।

অধ্যাপকের নাসিকাগর্জন কানে যেন মধুবর্ষণ করল। তানিয়া কয়েকটা মোমবাতি নিয়ে নিল, আমি একটা মোটা লোহার ডাণ্ডা।

'ওটা দিয়ে কী হবে?' তানিয়া জিজ্ঞেস করল।

'কাজে লাগতে পারে। ধরুন যদি কোন পাথর সরাতে হয় কিম্বা উল্টে দিতে হয়...'

মাটির নিচে কালি ঢালা অন্ধকার। রাস্তাটা ভাল করেই জানা ছিল, তাই মোমবাতি না জ্বালিয়েই আমরা এগলাম। ডান হাতি একটা সরু দরজা পার হয়ে পড়লাম গিয়ে সিঁড়ির মাথার কাছের কুলুঙ্গির ধারে। তানিয়া অস্ফুট স্বরে চেঁচিয়ে উঠল। বিরাট পাথরটায় প্রাচীন জড়ান কিউফিক বর্ণলিপি-গুলোর চাপা দীপ্তি। ঐ একই সোনালি দীপ্তি সিঁড়ির উপরের খিলানের সারা পথটা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে।

'দিনের বেলা এখানে খুব কম আলো থাকে,' আমি বললাম।

'একথার অর্থ?' অধীরভাবে জিজ্ঞেস করল তানিয়া।

'যতক্ষণ না উত্তর দেবার জন্য প্রস্তুত হই ততক্ষণ পর্যন্ত আমায় কোন প্রশ্ন করবেন না। চলুন, কোয়াড্রাণ্টটায় যাওয়া যাক — সেখানেও হয়ত আলোর লেখা পাওয়া যেতে পারে। দাঁড়ান! মোমবাতিটা আমায় দিন।'

গোল স্তম্ভটার সেই রহস্যময় আলোর কথা মনে পড়তে ভিতরে যাওয়াই ঠিক করলাম। হাওয়া চলাচলের জন্য সরু ফাঁকটার উপরের একটা পাথরে চাপ দিয়ে দেখলাম পাথরটা বেশ শক্ত করেই লাগান। কিন্তু লোহার চাপে

কিছুক্ষণ পরেই আলগা হয়ে এল। পরের পাথরটাও খুলে এল। যে ফাঁকটা হল তা দিয়ে আমার মাথা আর হাত অনায়াসেই ঢুকে যায়।

স্তম্ভের সরু গোল পেটের ভিতর মোমবাতিটা তুলে ধরতেই দেখলাম, ঘন কালো ছায়ার আড়ালে চওড়া পাথরের উপর দাঁড়িয়ে আছে ফুটোটার ঠিক উল্টোদিকেই একটা মস্ত, ঘাড় মোটা পাত্র। ঘন ধুলোয় ঢাকা।

'সেই ফুলদানীটা, তানিয়া! সেই ফুলদানী!' প্রায় চেঁচিয়ে উঠেই তানিয়াকে দেখতে দেবার জন্য একপাশে সরে দাঁড়ালাম।

'ভিতরে ঢুকতে পারছি না। ওটাকে বের করি কী করে?' উত্তেজিতভাবে বলে উঠল তানিয়া।

'দেখুন না কী করি!'

কিছুক্ষণের মধ্যেই আরো দুটো পাথর সরিয়ে কোনরকমে ঠেলেঠুলে স্তম্ভটার ভিতরে ঢুকতেই থমকে দাঁড়ালাম। ফুলদানীর বেদীটার ডাইনে আর পিছনে ছিল একটা কুয়ো। তার ভিতরে আবার একটা সরু সিঁড়ি মিশে গেছে গর্তের কালো গহ্বরে।

ফুটোর ভিতর দিয়ে ফুলদানীটা তানিয়াকে দিয়ে বললাম, 'আমার জন্য অপেক্ষা করুন। গর্তটায় কী আছে একবার দেখে আসি।'

'না! আমিও আপনার সঙ্গে যাব। শেষকালে যদি কিছু একটা ঘটে?' তানিয়ার গলা বুজে এল।

দুজনে দুজনের দিকে তাকালাম, তারপর আমি... মোট কথা, আমি দেয়াল ধরে তানিয়াকে সামলে সামলে গর্তটার নিচে নামতে সুরু করলাম।

গর্তটা বেশি গভীর নয়, পুরোপুরি খাড়াও নয়। আসলে সেটা পাথরের গায়ে একটা সুরঙ্গ। যতই নিচে নামি ততই ঠাণ্ডা হয়ে আসে। কিন্তু বাতাস সাধারণত গর্তের ভিতর যেমন হয়ে থাকে এখানে তেমন কনকনে, মরা নয়। পাহাড়ের মতই নির্মল খোলা হাওয়া ওজোনে ভরা। ফুট বারক নিচে সুরঙ্গটা একটা মস্তবড় গুহায় এসে মিশেছে। গুহাটা যেমন তেমন ভাবে তৈরী। দেয়ালগুলো ফাটা। এরপর কী আসবে তা বেশ বুঝতে পারছিলাম: কোয়ার্ৎজাইট আর সিলিকাস শিস্টের ফাটা দেয়ালগুলোর এখানে ওখানে কমলা আর ফিকে রঙের ছোপ।

'তানিয়া, এই হচ্ছে আপনার সেই রঙের খনি! এ রং সত্যিই বাদশাহী।'

আবার স্তম্ভে ফিরে এলাম। তানিয়া বলছিল ভোর হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। আমি সে কথায় কান না দিয়ে ফুলদানীটাকে বুকের কাছে চেপে ধরে সন্তর্পণে গম্বুজের তল থেকে বেরিয়ে এলাম। পোর্টিকোর কাছে দুর্মূল্য আবিষ্কারটাকে নামিয়ে রেখে আমরা মন্থরচালে মানমন্দিরটার চারদিকে ঘুরতে লাগলাম। ঠিকই আঁচ করেছিলাম: আরো কতগুলো আলোর লেখা পাওয়া গেল, দেখলাম কোয়াড্রাণ্টের লেখাগুলোও অল্প অল্প জ্বলছে।

নদীতীরে এসে আমরা খুব সন্তর্পণে ফুলদানীর ঢাকনাটা খুলে ফেললাম। ভিতরে ধুলো ছাড়া কিছুই নেই। বাইরেটা ধুয়ে নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে এসে ফুলদানীটা রেখে দিলাম অধ্যাপকের বালিশের কাছে। সকালবেলা উঠে ভদ্রলোক কী অবাকটাই না হবেন!

‘এবার আপনার তত্ত্বটা শোনান। সবকিছু না জানতে পারলে রাত্তিরে আমার ঘুম হবে না।’ কানে কানে ফিসফিস করে বলল তানিয়া।

নদীর কাছে ফিরে এসে দুজনে তার তীরে বসে পড়লাম।

‘রহস্যের কিছুই নেই, তানিয়া। এখানে ইউরেনিয়ামের আকর সঞ্চিত আছে, তার মানে রেডিয়ামও। ঐ যে হলদে ছোপগুলো দেখলেন, ওগুলো হচ্ছে ইউরেন-ওকার। চীনামাটির কাজে ওগুলোকে রং হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ইউরেন-ওকারে একটা দীর্ঘকালস্থায়ী পরিষ্কার চকচকে রঙিন ভাব হয় — কমলা, হলদে-সবুজ আর জলপাইয়ের রঙের আভা। ইউরেনিয়াম পাওয়া যায় কোয়াৎর্জাইটের ফাটলে। এখানে অবশ্য যা ছিল তা সবই প্রাচীন কালেই লোকেরা ব্যবহার করে শেষ করে দিয়েছে। হালকা কোয়াৎর্জাইটের সিলিকাস উপাদানে অল্প কিছু রেডিয়াম ছড়ান অবস্থায় পাওয়া যেতে পারে। আমার ধারণা কোয়াৎর্জাইটে তৈরী এই পুরো পাহাড়টাতেই রেডিয়াম নিঃসরণ হয়। কোয়াৎর্জাইটগুলোও কিছু পরিমাণে তেজস্ক্রিয়। রেডিয়ামের অক্সাইড যখন অন্য খনিজ পদার্থের সঙ্গে মেশে তখন অত্যন্ত টেঁকসই রং পাওয়া যায়, তার রোশনাইও খুব জোরদার। যুদ্ধের সময় এই রঙের খুবই প্রয়োজন।

‘প্রাচীন কালের জ্যোতির্বিদরা এই দীপ্ত রঙের গোপন খবর জানতেন। খুব সম্ভব পাহাড়ের এই রহস্যময় ঘটনার ফলেই “নুর-ই-দেশ্‌ৎ” বা “মরুভূমির আলো” নামটার জন্ম।

'রেডিয়াম জিনিসটা এখনো অনেকটা রহস্যময়। আমরা জানি রেডিয়াম বাতাসকে আইওনাইজ করে, বিদ্যুৎ আর ওজোন সঞ্চয় করে, বীজাণু মারে, বিষের তেজ কমিয়ে দেয়।

'নুর-ই-দেশ্‌তের এরকম বলকারী বাতাসের কারণটা এবার বুঝতে পারছি। বিরাট পরিমাণ তেজস্ক্রিয় কোয়ার্ৎজাইট এখানে খোলা পড়ে আছে। তার ফলে অনেকটা জুড়ে একটা স্তিমিত তেজস্ক্রিয় ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়েছে। তার তেজস্ক্রিয়তা খুবই কম, মানুষের শরীরের পক্ষে যতটুকু ভাল ঠিক ততটুকুই। কর্নেলিয়ান পাথর সম্বন্ধে অধ্যাপক যা বলেছিলেন তা মনে আছে? বাতাস না থাকায় রেডিয়াম নিঃসরণ আজ অন্যান্য দিনের চেয়ে বেশি হয়েছে। আজ রাত্রে এটা আমরা লক্ষ্য না করে পারিনি। আবিষ্কারটা বেশ অত্যাশ্চর্য, তাই নয়?'

তানিয়ার হাতের উপর আমার হাতটা রাখলাম।

'ঠিক,' তানিয়া উঠতে উঠতে মৃদুস্বরে বলল, 'চলুন, অনেক দেরী হয়ে গেছে, এবার একটু শোওয়া যাক...'

তানিয়ার এই অদ্ভুত ব্যবহারে অবাক হয়ে গেলাম। নদীতীরে বসে একা একা আমাদের এই অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারের কথাই ভাবতে লাগলাম। আমার মতের সমর্থনে আরো সব নতুন নতুন তথ্য মাথায় আসতে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে এসব ভাবতে ভাবতে হারিয়ে গেলাম রসায়নের গোলোক-ধাঁধায়। শেষ পর্যন্ত তাঁবুতেই ফিরে এলাম।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল অধ্যাপকের প্রচণ্ড চেঁচামেচিতে। ফুলদানীটাকে তাঁবুর বাইরে আনা হল। সবুজ-কালো এনামেল তার গায়ে লাগান। সেই সঙ্গে উজ্জ্বল কমলা, খয়েরী আর জলপাইয়ের রঙের ডোরা-কাটা। এরকম সুন্দর জৌলুষ ইউরেনিয়ামের উপাদান ছাড়া পাওয়া সম্ভব নয়। রাত্রের আবিষ্কারের নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল চোখ ধাঁধান দিনের আলোয়।

অধ্যাপককে আমার আবিষ্কারের কথা জানালাম। বুড়ো ভদ্রলোকের হতভম্ব চেহারাটা দেখে সত্যিই খুব আনন্দ হল! উৎসাহের চোটে বলে বসলাম, এখানকার আকাশ যে এত পরিষ্কার তার একটা কারণ হল রেডিয়ামের বিকিরণ!

'যত বাজে কথা,' অধ্যাপক বলে উঠলেন, 'কিন্তু এখানে আমাদের দেহে মনে যে একটা বিশেষ অনুভূতি হয় তার আপনি ঠিক ব্যাখ্যাই দিয়েছেন। এ জায়গাটা যে শুধু আলোর দেশ তা নয়, আনন্দেরও। কিন্তু তানিয়া তবে আজ এত বিমর্ষ কেন? কিছু হয়েছে বুঝি?'

'না,' তাড়াতাড়ি বলে উঠল তানিয়া।

রঙের খনিটা আরেকবার দেখে নিয়ে আমরা আমাদের সিঁড়ির কাছে চলে এলাম। দিনের শেষে একটা সরু পথ খুঁড়ে বের করা গেল। একজন একজন করে যাবার পক্ষে যথেষ্ট। নিচের তলাটায় অনেকগুলো ঘর। অধ্যাপকের কী মনে হল জানি না, আমার চোখে কিন্তু সেগুলো অন্য ঘরগুলোর মতোই ফাঁকা ঠেকল। কৌতূহলজনক কিছু চোখে পড়ল না।

সন্ধ্যার হাওয়া স্তেপের ওয়ার্মউড ঝাড়ের উপর দিয়ে গোলাপী ধুলো উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। অধ্যাপক আর ভিয়াচিককে এগতে দিয়ে তানিয়া পিছিয়ে পড়ল। আমি কাছে এসে তার হাতটা আমার হাতে টেনে নিলাম।

'আপনার কী হয়েছে তানিয়া? আপনার মতো সবসময় হাসিখুসি মেয়ে এরকম... আমাদের কালরাত্রের আবিষ্কার আপনাকে এত বিমর্ষ করে তুলল কেন?'

তানিয়া আমার দিকে চেয়ে রইল।

'আমার কথা আপনি বুঝতে পারবেন কিনা জানি না তবু বলব... নুর-ই-দেশ্‌ৎ আনন্দের জায়গা। আমি ভেবেছিলাম, সে আনন্দ বুঝি আমার নিজের অন্তরেই রয়েছে। ভেবেছিলাম, আমি শক্তসমর্থ, স্বাধীন, প্রফুল্ল। এমন সময় এলেন আপনি ...' তানিয়া একটু থামল, 'কঠোর, আত্মমগ্ন, যুদ্ধের আগুনে পোড়া। আপনিও ক্রমে ভারমুক্ত, হাসিখুসি হয়ে উঠলেন... শেষ পর্যন্ত দেখা গেল এসবের একমাত্র কারণ হচ্ছে রেডিয়াম। যদি রেডিয়াম না থাকত ...' তানিয়ার গলা অর্ধস্ফুট হয়ে উঠল, 'নুর-ই-দেশ্‌তের এই দিনগুলোর আনন্দ আমরা জানতেও পারতাম না।'

ঘুরে গিয়ে হাতটা এক ঝাঁকানিতে ছাড়িয়ে নিয়ে তানিয়া পাহাড়ের গা বেয়ে নিচে ছুটে চলে গেল। আমিও নুর-ই-দেশ্‌তের ধ্বংসাবশেষ দেখতে দেখতে ধীর পায়ে তার অনুসরণ করলাম। "মরুভূমির আলো"... সে আলো আমার স্মৃতিপটে চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে!

ক্যাম্পফায়ারের আগুনটা ধিকি ধিকি জ্বলছে। তানিয়া আর আমি পাশাপাশি বসে। কাছেই সেই পুরনো কালের ফুলদানীটা আর তার সোনালি আভা — দূর অতীতের, কিন্তু মানুষের মৃত্যুহীন আশার উজ্জ্বল পাত্র।

তারাভরা আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছিলাম বিজ্ঞানের জয়যাত্রার সঙ্গে সঙ্গে তেজস্ক্রিয়তার গোপন তথ্যের আরো গভীরে আমরা প্রবেশ লাভ করব। সেই সঙ্গে মহাজাগতিক আর অন্যান্য বিকিরণেরও। এই ঘন-নীল শূন্যের কোন গভীরে, কোন অতিদূর নক্ষত্রজগৎ থেকে ঝরে পড়ছে রহস্যময় শক্তির অবিশ্রান্ত ধারা।

তানিয়ার মুখ তখন আমার এত কাছে যে তার চোখে দূর জগতের ছোট ছোট রুপোলি ছায়ার চমকও আমার চোখে পড়ছে। অনেক উঁচুতে, ছায়াপথের তারামেঘের উপর দিয়ে ডানা মেলে উড়ে চলেছে রাজহংস* ভবিষ্যতের দিকে তার অনন্ত যাত্রায়।

---

* সিগ্‌নাস্‌ নক্ষত্রপুঞ্জ।

টাসকারোরার অতল তল
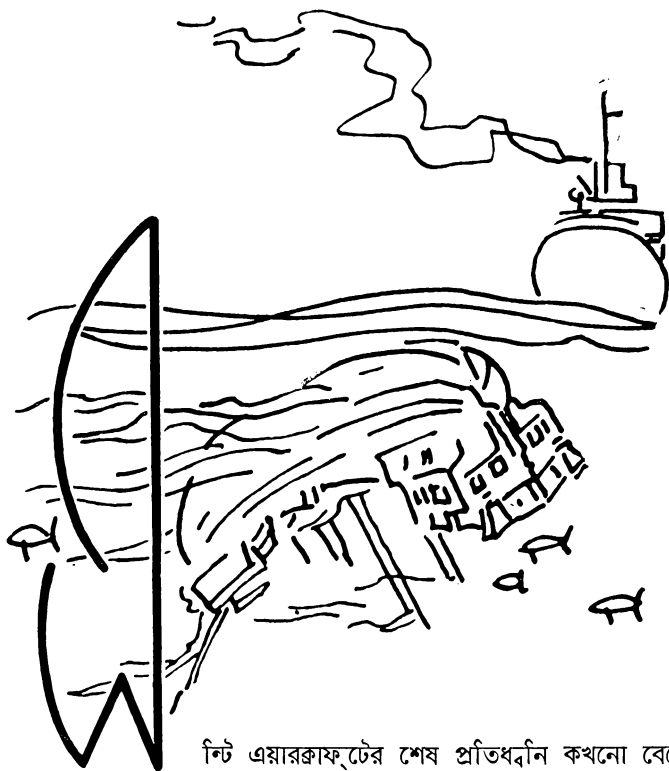
ন্টি এয়ারক্রাফ্‌টের শেষ প্রতিধ্বনি কখনো বেড়ে উঠে, কখনো কমে গিয়ে, শেষ পর্যন্ত মিলিয়ে গেল। সার্চলাইটগুলো সব গেল নিভে। দূরে কেবল তারার মতো ছোট ছোট আলোর কণা। বিমানযুদ্ধের আওয়াজ। বাতাসে বারুদ আর আগুনের গন্ধ। কালুগা স্ট্রীটের বড় বাড়িটার সাময়িক বাসিন্দা আমাদের ছোট দলটা যে যার ঘাঁটি থেকে ফিরে এসেছে। কেউ ছিল

ছাদে, কেউবা উঠোনে। স্থায়ী বাসিন্দাদের সঙ্গে সেখানে তারা বিমান প্রতিরোধের কাজে ব্যস্ত ছিল। দলের সবাই ফিরে এসে জমায়েত হল একটা চমৎকার আরামদায়ক ঘরে। ঘরটার মালিক আমাদের সবার বন্ধু। সবাই টেবিল ঘিরে হাতপা ছড়িয়ে বসে সিগারেট ফুঁকতে লাগল।

দুদিন আগে আমরা নতুন কাজের জন্য মস্কোয় এসেছিলাম। ঘটনাক্রমে তৃতীয় দিন সন্ধ্যাটা ছিল ফাঁকা। তাই একটা ছোটখাটো খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করা গিয়েছিল সবাইকে বিদায় জানানর জন্য। তখনই এই গল্পটা শুনি।

গল্পটা বলেছিলেন ইয়েভ্‌গেনি নিকোলায়েভিচ ইয়েলিসেয়েভ। ভদ্রলোক জাহাজের ক্যাপ্টেন। লম্বা, চওড়া লোক, ধূসর চোখ, গায়ে ঘন নীল বুক-খোলা জামা। তর্জনী আর মধ্যমা দিয়ে ধরে তিনি পাইপ খাচ্ছিলেন। পাইপের কুণ্ডলী পাকান নীলচে ধোঁয়া যেন তাঁর কথার মাঝে মাঝে বিরতি চিহ্নের কাজ করছিল।

তাঁর গল্পটা হচ্ছে এইরকম।

পূর্বের রাম্‌ব্‌ লাইনে ব্যাপারটা ঘটে। একটা পাঁচ হাজার টনী জাহাজের আমি ফার্স্ট মেট। ভ্লাদিভস্তক আর কাম্‌চাৎকার মধ্যে সেটা যাওয়া আসা করে। কখনো কখনো সাংহাইয়ের দক্ষিণে কিম্বা গেন্‌সান আর হাকোদাতে।

১৯২৫ সালের জুলাই মাস। আমরা আমাদের স্বাভাবিক যাত্রাপথ কাম্‌চাৎকার পেত্রপাভ্‌লভস্কে চলেছি। হাকোদাতে ছেড়েছি বিকেলের দিকে বেশ দেরী করে। পরদিন পড়লাম ভীষণ ঝড়ের মুখে—টাইফুন। সমুদ্রের এমন সাংঘাতিক অবস্থা হল যে নেমুরো পার হয়ে আমাদের আর বাঁধা পথের ঠিক রইল না। জাহাজের ডেকে রয়েছে দামী মাল আর ভিতরে খুবই ভঙ্গুর যন্ত্রপাতি। ক্যাপ্টেন বেগুনভ, লোকটি বেশ অমায়িক, কিন্তু বহুদিনের পুরনো কড়া জাহাজী, ব্রিজের উপর আমার সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করলেন জাহাজের মুখ ঘোরাতে হবে। ছুটে যেতে হবে প্রায় হাওয়ার আগে। জাহাজটা সঙ্গে সঙ্গেই ঘুরে গিয়ে প্রচণ্ড দুলুনি সত্ত্বেও আবার সহজভাবে চলতে সুরু করল। শিয়াশ্‌কোতান দ্বীপ ছেড়ে উত্তরে, কুরিল দ্বীপপুঞ্জের পুব মুখে নতুন পথ নিতে হল।

সারারাত ধরে ঝড়ের একটানা উদ্দামতা। পরদিন সকালবেলা দেখা গেল

স্বল্প শান্তভাব। কিন্তু তবু হাওয়া সারা দিন বেশ জোরেই বয়ে চলল। সে জোর কমল সন্ধ্যার দিকে। আমি তখন ভীষণ ক্লান্ত, তাই একটু তাড়াতাড়িই শুয়ে পড়লাম।

ও অঞ্চলে এরকম অদ্ভুত রাত কখনো দেখা যায় না। চাঁদ নেই, বাতাস নেই, উজ্জ্বল আকাশের নিচে শান্ত সমুদ্র। আমি তো মড়ার মতো ঘুমচ্ছি। বহুকালের অভ্যাসবশত, ঘণ্টা বাজতেই ঘুম ভাঙল। ঘণ্টা কবার বাজল তা না গুণলেও বুঝতে পারলাম হাতে এখনো আধঘণ্টা সময় আছে। আমার অনুমান সমর্থিত হল ঠিক সেই মুহূর্তেই বিরাট এক মগ্ কোকো নিয়ে স্টুয়ার্ডের প্রবেশে।

এক লাফে উঠে পড়ে জামাকাপড় পরে নিলাম। তারপর ঢকঢক করে কোকোটা মেরে দিয়ে পাইপ ধরিয়ে আবার একটুখানি বিছানায় গড়িয়ে নিলাম। ঠাণ্ডা, স্যাঁতসেঁতে, কুয়াশা-ভরা রাত্তিরে একা একা পাহারা দেওয়ার আগের ঐ দশ পনের মিনিটের তুলনা নেই। পাইপের কড়া ধোঁয়ায় টান মারতে মারতে শুনে চলেছি ঢেউয়ের আঘাতের ছন্দহীন শব্দ আর ইঞ্জিনের আওয়াজের বাঁধা তাল। ইঞ্জিনের প্রবল গুঞ্জন আর জাহাজের খোলের অল্প কাঁপুনি নরম সুরের গানের মতোই আরামদায়ক। কেবিনটা বেশ গরম; আমার ছোট টেবিলটার উপরে একটা আলো জ্বলছে। টেবিলের উপর পড়ে আছে একটা থ্রিলার, পাহারা শেষ হলে পড়ব বলে উদগ্রীব হয়ে আছি। কেবিনটার উপরে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম—প্রশান্ত মহাসাগরের ভয়াবহ সবুজ গভীরতার ফুট কুড়িক উঁচু দিয়ে ভেসে চলেছে ছোট্ট খুপরীটা। মনে মনে ভাবলাম জাহাজীদের কাজের একটা সুবিধে হচ্ছে চিন্তা করার বহু সময় পাওয়া যায়। আমি তো সবসময় নিজের মনে নানান কথা ভেবে চলি।

দরজায় টোকা পড়তে চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটল। দরজাটা খুলে যেতে দেখা গেল ক্যাপ্টেনের বিরাট শরীরটা।

‘এত আগেই উঠেছেন, সেমিওন মিত্রফানভিচ?’ বিছানা ছেড়ে উঠে একটা বড় আরামকেদারা ক্যাপ্টেনের দিকে ঠেলে দিয়ে বললাম, ‘এখনো তো ভোরও হয়নি।’

‘ভোর হয়ে গেছে! এক্ষুণি আলো নিভিয়ে দেওয়া হবে। আজ দিনটা খাসা।’

‘বেশ আয়েস করে ঘুমবার মতো দিন,’ আমি বললাম, ‘তা না আমি বেচারীকে এখন পাহারায় যেতে হবে, কিন্তু আপনি বিছানা ছেড়ে উঠলেন কেন?’

‘তোমরা, ছোকরারা, খালি আরামের জীবনেরই স্বপ্ন দেখ,’ ঠাট্টাচ্ছলে খোঁচা দিয়ে বলল ক্যাপ্টেন, ‘আমার বয়সে ঘুমের বেশি দরকার হয় না। এরমধ্যেই ডেকে গিয়ে ঝড়ের ফলে কী পরিমাণ ক্ষতি হল, তা দেখে এসেছি। ভাল কথা, ইয়েভ্‌গেনি নিকোলায়েভিচ, তোমার অর্থোড্রোমি দিনের বেলাতেই দেখে নিও, শুধু কমপাস আর লগের উপর নির্ভর করে থাকা ঠিক নয়।’ আমি তখন গলায় মাফলার জড়িয়ে ওভারকোট পরছি।

‘নিশ্চয়ই, সেমিওন মিত্রফানভিচ, আমরা এখন নতুন পথে এগচ্ছি,’ পাইপটা ধরাবার জন্য দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে বললাম।

হঠাৎ জাহাজটা ভীষণ জোর দুলে উঠল। ঠিক সেই সঙ্গেই শোনা গেল একটা কান-ফাটা আওয়াজ। ইঞ্জিনও স্তব্ধ। ক্যাপ্টেন আর আমি কয়েক মুহূর্ত দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে কান খাড়া করে রইলাম। আবার সুরু হল ইঞ্জিনের গুঞ্জন। তারপর আবার সেই কান-ফাটা আওয়াজ। পরমুহূর্তেই সবকিছু একেবারে নিস্তব্ধ। দেশলাই কাঠিটা তখনো হাতে ধরা, আঙুলে ছেঁকা লেগে গেল। তাড়াতাড়ি ক্যাপ্টেনকে পেরিয়ে ছুটে গেলাম।

সমুদ্রের সঙ্গে যার ভাল পরিচয় আছে, সেই আমার তখনকার মনের অবস্থা বুঝতে পারবে। বুঝতে পারবে সমুদ্রের বুকে হঠাৎ ইঞ্জিন থেমে গেলে যে ভয় দেখা দেয় তার মর্ম। ইঞ্জিন হল জাহাজের সবল হৃদয়, তার প্রাণ। জাহাজকে সে দেয় প্রাকৃতিক শক্তিকে বশ করার ক্ষমতা। সে হৃদয় থেমে গেলে জাহাজ মারা পড়ে, নিষ্ঠুর সমুদ্রের হাতে সে তখন অসহায়।

কম্প্যানিয়ন-ওয়ের দিকে ঘুরতেই পা হড়কে গেল, তখন দেখলাম, জাহাজটা একদিকে হেলে গেছে। ক্যাপ্টেনও তখন আমায় ধরে ফেলেছে। তার মনের উত্তেজনা প্রকাশ পাচ্ছে দ্রুত নিঃশ্বাসে। কিন্তু সমুদ্রে ঘুরে ঘুরে তার চুল পেকে গেছে—তাই উৎকণ্ঠার অন্য কোন চিহ্ন তার হাবে ভাবে প্রকাশ পেল না।

ডেকটা অন্ধকার। ভোরের প্রথম আলোয় জাহাজের পরিলেখটাই কেবল দেখা যাচ্ছে। চার্টহাউসের দরজাটা হাট করে খোলা। সেখান থেকে এক চিলতে আলো এসে পড়েছে ডেকের মেঝেতে। ব্রিজের উপর থেকে তিন নম্বর মেট্‌

উত্তেজিতভাবে চেঁচিয়ে উঠল, 'আচ্ছা ফ্যাসাদ, সেমিওন মিত্রফানভিচ, জাহাজ জলের নিচের পাহাড়ে ঠেকেছে, স্ক্রু মনে হচ্ছে চুরমার হয়ে গেছে, হালটাতেও লেগেছে ধাক্কা ...'

'বললেই হল, এখানে পাহাড় আসবে কোথা থেকে!' হুংকার দিয়ে উঠল ক্যাপ্টেন, 'এটা হচ্ছে সমুদ্রের সবচেয়ে গভীর অংশ!'

"সত্যিই তাই। এ জায়গাটা তো টাসকারোরার অতল তল," নিজেকে ভরসা দিয়ে বললাম।

ক্যাপ্টেন ব্রিজের উপর উঠল। আমি তখন ডেকেই দাঁড়িয়ে।

'বোসান্, নিচের পাহারার লোকটিকে ডাক। জল মাপার জন্য তৈরী হও,' আমি বললাম।

বহু কষ্টে দেখতে পেলাম ক্যাপ্টেন কথা বলার চোঙাটার উপর ঝুঁকে পড়েছে। আঁচ করলাম, ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে কথা বলছে। ইঞ্জিনের টেলিগ্রাফটা ক্ষীণভাবে বেজে চলেছে। জাহাজের নিচে আগের মতোই সেই আওয়াজটা আবার শোনা গেল। টেলিগ্রাফটা বাজতেই ইঞ্জিনটা থেমে গেল।

'ইয়েভ্গেনি নিকোলায়েভিচ, জলমাপার দস্তাটা স্টারবোর্ডে নামিয়ে দাও,' ক্যাপ্টেন বলে উঠল।

বোসানকে আদেশ জানিয়ে দিলাম। অন্ধকার থেকে শোনা গেল, 'এক বাঁও মেলে না!'

'গলুই ঘেঁষে, নোঙরের কাঠটার কাছে!' ক্যাপ্টেনের হুকুম এল।

বোসান জানাল, 'আড়াই বাঁও!'

'কী, চোদ্দ ফুট!' অবাক হয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম।

খোলের বাঁদিকের জল বার থেকে আঠার ফুট গভীর। জাহাজের পিছন দিকে—কুড়ি ফুট।

তখন ক্রমে আলো হয়ে আসছে। জাহাজের গা থেকে ঝুঁকে পড়ে তলের ফুঁসে-ওঠা অন্ধকার জলের ভিতরে দেখবার চেষ্টা করছি। সমুদ্র মন্থরভাবে বড় বড় ঢেউ তুলে চলেছে, ঝড়ের পর সাধারণত যেরকম হয়। একটা জিনিস লক্ষ্য করে খুব অবাক হয়ে গেলাম। বড় বড় ঢেউয়ের বুকে জাহাজটা ওঠানামা করছে, কিন্তু জাহাজ কিছুতে ঠেকলে পর তল থেকে যে ধাক্কা দেয় সে ধাক্কা মোটেই অনুভব করছি না।

ক্যাপ্টেন আমায় ব্রিজের উপর আসতে বলল। রেলিঙের উপর ঝুঁকে পড়ে ক্যাপ্টেনও জাহাজের বাঁদিকের জলে তাকিয়ে আছে। সার্চলাইট জ্বালান হয়েছে; জাহাজের কাছ থেকে ধূসর অন্ধকার সরে গেছে দূরে। দেখলাম এদিকের ঢেউগুলো অন্য ঢেউয়ের চেয়ে ছোট ছোট, কাটা কাটা, আর চ্যাপ্টা গোছের।

'ইয়েভ্গেনি নিকোলায়েভিচ, তোমার ডেড্ রেকনিঙের নির্দেশ দেখে বল, কোথায় রয়েছি, তাড়াতাড়ি!'

'এই বলছি,' চার্টহাউসের দিকে ছুটে চললাম।

'পিওতর,' ক্যাপ্টেনের চীৎকার শুনতে পেলাম, 'জলমাপার যন্ত্র নিয়ে নৌকোয় নেমে পড়!'

বুড়ো ক্যাপ্টেনের প্রতি শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেল। কী ঠাণ্ডা মাথায় লোকটা জাহাজের গোলমালের কারণ অনুসন্ধান করে চলেছে। খাসা লোক—চার্টের উপর কোণমাপার প্রসারকটা বসাতে বসাতে মনে মনে বললাম।

ক্যাপ্টেন চার্টহাউসে এসে ঢুকল। কাঁটাটা তখন বলছে, আমরা কুরিল দ্বীপপুঞ্জের বহুদূরে টাসকারোরার বিরাট দয়ে এসে পড়েছি, ক্যাপ্টেন তা দেখে শান্ত গলায় বলল, 'আচ্ছা...'

এমন সময় একটা কথা মাথায় এল। বলে উঠলাম, 'পেয়েছি! নিশ্চয়ই কোন ডোবা জাহাজে আমরা আটকেছি!'

'ঠিক,' ক্যাপ্টেন বলল, 'সম্ভাবনাটা অবশ্য লাখে এক, কিন্তু বিধি বাম! দেখা যাক পিওতর কী খবর দেয়!'

আবার ব্রিজের উপর গেলাম। যা ভেবেছিলাম তাই, ধারে কাছে কোথাও তল পাওয়া যাচ্ছে না।

সকালটা বেশ পরিষ্কার। মেরামতের প্রধান কর্মী আর বোসান ফিরে এসে বলল কোথাও কোন ফুটো হয়নি। তাদের পিছন পিছন এল উদ্ধারদলের দলপতি। আটকে-যাওয়া একটা জাপানী জাহাজ উদ্ধার করার জন্য দলটাকে সঙ্গে নেওয়া হয়েছে। দলপতি লোকটি অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ার। সে এরমধ্যেই জাহাজটা ঘুরে দেখে এসেছে।

'ক্যাপ্টেন, মনে হচ্ছে আমাদের নেমে দেখতে হবে,' লোকটি বলল।

'ভাল! তবে এক্ষুণি সুরু করে দিন!' ক্যাপ্টেন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল,

'জাপানী জাহাজ উদ্ধার করার জন্য আপনাদের নিয়ে চলেছি, এখন আমাদেরই উদ্ধার করা প্রয়োজন।'

লম্বা চওড়া দুজন ডুবুরী নামার জন্য তৈরী হতে লাগল। দুজনকেই দেখে মনে হয় গায়ে বেশ জোর আছে। আমি নিজে এক আধবার জলের নিচে অল্প স্বল্প নেমেছি, কিন্তু মাঝসমুদ্রে ডুবুরী নামা কখনো দেখিনি। তাই খুব আগ্রহভরে সব ব্যাপারটা দেখতে লাগলাম।

যে নৌকো পাঠান হয়েছিল সেটা একটা আধডোবা জাহাজের প্রস্থ কিছুটা আঁচ করে এসেছে। জাহাজের বাঁদিকের খোলে বেশ নিচুতে একটা ভারা বেঁধে সেখান থেকে নামিয়ে দেওয়া হল একটা সরু মই। ডুবুরীদের একজন একটা লম্বা লাঠি নিয়ে সোজা ঢেউয়ের মধ্যে নেমে পড়ার চেষ্টা করতে লাগল। লাঠিটা দিয়ে সে নিজেকে জাহাজের কাছ থেকে সরিয়ে রেখে এপাশ ওপাশ কিছুক্ষণ দুলে হঠাৎ মই ছেড়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। জলের বুকে রইল কেবল হাজার হাজার বুদ্‌বুদ।

উদ্ধারদলের দলপতি টেলিফোন নিয়ে ডেকের একেবারে ধার ঘেঁষে দাঁড়িয়ে। ক্যাপ্টেন আর আমাকে সে ইশারায় ডাকল। দিগন্তের বুকে সদ্য ওঠা সূর্যের আলোয় মনে হল নিচে যেন একটা কালো ছায়া দেখা যাচ্ছে।

'পিছনের গলুইয়ের দিকে যাও!' ইঞ্জিনিয়ার টেলিফোনে চেঁচিয়ে বলল, 'ঠিক আছে? এবার নিচে ঢুকে যাও! হয়েছে? সাবাস!'

'কী হল?' ক্যাপ্টেন অধীর হয়ে উঠল। ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু কোন জবাব দিল না।

টেলিফোনের ঝিল্লীটা গোঁগোঁ করে চলেছে। আমরা উৎকণ্ঠার সঙ্গে অপেক্ষা করে আছি। সময় যেন আর চলতেই চায় না।

'জাহাজটার রাউণ্ড-হাউস বা পেটের ভিতর ঢুকতে চেষ্টা কর,' ইঞ্জিনিয়ার নির্দেশ দিয়ে দ্বিতীয় ডুবুরীকে টেলিফোনটা দিল। 'ক্যাপ্টেন, অত্যাশ্চর্য ব্যাপার! একটা ভাঙা জাহাজ ঠিক আমাদের পথ ধরেই এগিয়ে আসছিল। আমরা পুরো বেগে তার উপরে পড়েছি। আপনাদের জাহাজের জলকাটার মুখটা ভীষণ ধারাল। ভাঙা জাহাজের খোলের ভিতর মুখটা একেবারে কুড়ুলের মতো কেটে এঁটে বসে গেছে। অন্য জাহাজটা হচ্ছে একটা খুব পুরনো বড় পালতোলা কাঠের জাহাজ। মাস্তুলগুলো স্বভাবতই ভেঙে বেরিয়ে গেছে।

এ জাহাজের সামনেটা ওটার রাউণ্ড-হাউসের ভিতর ঢুকে গেছে। আপনাদের স্ক্রু আর হাল পড়েছে ওর পালদণ্ডের খুঁটির উপর। ভগবানের দয়ায় কিছু ভাঙেনি, সেই যা রক্ষে। আপনারা ইঞ্জিন ঘোরানর চেষ্টা করায় স্ক্রুটা পালদণ্ডর গায়ে গিয়ে লাগে। ভাঙা জাহাজটা আশ্চর্য রকমের শক্ত।'

'একটা কথা বুঝিয়ে বলুন, কমরেড ইঞ্জিনিয়ার,' ক্যাপ্টেন জিজ্ঞেস করল, 'ও জাহাজটা সাবমেরিনের মতো জলের তল দিয়ে ভাসছে কেন?'

'তার কারণ জাহাজটা কাঠের, আর মালপত্রের ওজনও কম। ডুবুরীকে বলেছি ভিতরে কী আছে দেখে আসতে। জাহাজটা বোধহয় জলের অল্প উপর দিয়েই ভাসছিল। আপনাদের জাহাজ ওটাকে আরো ডুবিয়ে দিয়েছে... হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, ওকে উপরে আসতে বল,' কথার মাঝখানেই ইঞ্জিনিয়ার টেলিফোনের কাছে দাঁড়িয়ে-থাকা ডুবুরীটির উদ্দেশে বলে উঠল।

জাহাজের খালাসীরা সবাই, ক্যাপ্টেন আর আমি ডুবুরীর প্রত্যাগমনের অপেক্ষায় চেয়ে আছি, লোকটি যেন অজ্ঞাত জগতের দূত। ডুবুরী সাহসে ভর করে সমুদ্রের তলে ডুব দিয়ে ভাঙা জাহাজটার উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে আমাদের জাহাজের নিচে এল। ভাঙা জাহাজটা যে কত বছর ধরে সমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছে তার আর হিসেবনিকেশ নেই। ডুবুরী তার শিরস্ত্রাণ খুলে ফেলল। তার প্রফুল্ল, দুষ্টুমিভরা চোখদুটিতে একটুও ক্লান্তির ছাপ নেই, যদিও তখন সে নিশ্চয়ই অত্যন্ত ক্লান্ত।

ডুবুরীকে চার্টহাউসে নিয়ে যাওয়া হল। ভাঙা জাহাজটার খোলের একটা মোটামুটি ছবি তার কাছ থেকে পাওয়া গেল। জাহাজটার খুব পুরনো ধরনের চেহারা দেখে অবাক হলাম। জাহাজের ইতিহাস নিয়ে নাড়াচাড়া করা আমার একটা শখ। বিশেষ করে পালতোলা জাহাজের। ক্যাপ্টেনের সে কথা অজ্ঞাত ছিল না বলে জাহাজটার সময় আর জাত নির্ণয় করতে পারব কিনা জানতে চাইল। ডুবুরীর ঐ ছবি দেখে অবশ্য তা বলা খুব কঠিন, তবে এটুকু বুঝতে পারলাম যে সেটা খুবই বড়, চওড়া, তিনমাস্তুলী জাহাজ, গলুইয়ে গ্যালারী। অন্তত একশ' বছরের পুরনো বলেই মনে হল। ডুবুরীর কাছে শুনলাম জাহাজটার খোল খুব শক্ত কাঠ দিয়ে তৈরী। খোলের ভিতরে কর্কের মতো দেখতে চাপ চাপ কী যেন রয়েছে। জিনিসগুলো ওজনে খুবই হালকা।

ইঞ্জিনিয়ার কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল, ভাঙা জাহাজটার স্টারবোর্ডের

দিকটা উড়িয়ে দেওয়াই ভাল, তাহলে ভাসমান মালগুলো বেরিয়ে যাবে। ভাঙা ভারী খোলটাও তখন ডুবে গিয়ে আমাদের জাহাজকে ছেড়ে দেবে।

'তাই করুন, ইঞ্জিনিয়ার, তাই করুন!' ক্যাপ্টেন অধীর হয়ে উঠল।

ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু আবার কী যেন ভাবতে লাগল।

'কী হল আবার?' সন্ত্রস্তভাবে জিজ্ঞেস করল ক্যাপ্টেন।

'একাজে দুজন লোক প্রয়োজন। তবে তাড়াতাড়ি হবে, আর আসল কথা তাতে বিপদও কম। জাহাজটার পেটের দিক থেকে যদি পাশে যাওয়া সম্ভব না হয়, তবে বাইরের দিকে একটা ফুটো করতে হবে। স্রোতের মুখে কাজটা খুবই কঠিন। সৌভাগ্যক্রমে সমুদ্র এখন বেশ শান্ত। তা না হলে মুশকিলে পড়তে হত।'

'দুজন ডুবুরী তো আপনার রয়েছে,' আমি বললাম।

'তাতে তো হবে না, একজনকে যে পাম্প চালাতে হবে।'

মনে পড়ল ডুবুরী হিসেবে আমার স্বল্প অভিজ্ঞতার কথা: একবার চেষ্টা করে দেখলে কেমন হয়? মাঝসমুদ্রে ডুব দেওয়া খুব ভয়ের ব্যাপার, কিন্তু তবু নিজের উপর বেশ একটা বিশ্বাস হল, মনে হল আমিও ডুবুরী হিসাবে কাজে লাগতে পারব। তাই নিজেই ইঞ্জিনিয়ারকে বললাম আমায় নিতে। তার সন্দিগ্ধ হাসি দেখে ডুবুরীর কাজ সম্বন্ধে আমার যা জানা ছিল তা সবই বললাম।

'ঠিক আছে, ডুবুরী নিজেই ঠিক করুক তোমায় সঙ্গে নেবে কিনা,' শেষ পর্যন্ত বলল ইঞ্জিনিয়ার।

ডুবুরীর পোষাক ব্যবহার করার কায়দা কানুন সম্বন্ধে ডুবুরী আমায় অনেক সব প্রশ্ন করল। তারপর আমার উত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে আমায় সঙ্গে নিতে রাজী হয়ে গেল। কিন্তু সেই সঙ্গে সাবধান করে জানিয়ে দিল, জাহাজের খোলে ধাক্কা লেগে কিছু ঘটলে তার দায়িত্ব আমারই। ডুবুরীর নানা উপদেশ মন দিয়ে শুনলাম। মনে মনে ভাবতে লাগলাম, ধাক্কা খেলে পর এসব উপদেশ অবশ্য কোন কাজেই আসবে না।

জাহাজের খালাসীরা তো আমার ডুব দেওয়ায় মহা উৎসাহী। ডুবুরীদের পোষাক পরতে পরতে শুনতে পেলাম নানা রকম সব সরেস হাসিঠাট্টা চলেছে, জাহাজীরা যাতে খুবই দক্ষ।

ডুব দেওয়ার জন্য তো তৈরী হলাম। শিরস্ত্রাণটা লাগান মাত্রই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম পরিচিত জগৎ থেকে। ডুবুরী তখন জাহাজের তলে মিলিয়ে গেছে। আমি অদ্ভুতভাবে ভারী পাদুটো টেনে টেনে মই বেয়ে নামতে সুরু করলাম। আমার পুরো মন নিচের আন্দোলিত সবুজ জলের দিকে। মাথার পিছনে একটা ভাল্‌ভ্‌। সেটা টিপে যতটা পারি হাওয়া বের করে দিতে হবে আর ঠিক সেই সঙ্গেই ভেঙে-যাওয়া ঢেউয়ের তলে ঝাঁপ দিতে হবে। এটুকু বেশ ভালভাবেই করলাম। পরমুহূর্তেই শিরস্ত্রাণের মুখের দিকে ঘনিয়ে এল একটা সবুজ ছায়া। বাঁপাশে স্রোতের ভীষণ চাপ। বহুকষ্টে প্রাণপণ শক্তিপ্রয়োগ করে একটা শক্ত মতো কিসের উপর যেন পা ফেললাম। জিনিসটা ডাইনে একটু কাৎ হয়ে গেল।

চারদিকে তাকালাম। উপরের উজ্জ্বল রোদ একটা চাপা আলো ফেলেছে। চাপা হলেও যথেষ্ট। ভাঙা জাহাজটার মোটামুটি চেহারাটা চোখে পড়ল, তার উপরে আড়ভাবে পড়েছে উপরের জাহাজটার কালো ছায়া। তারপর দেখা গেল একটা বের করা চৌকো মত জায়গা, নিশ্চয়ই ডেক জাতীয় কিছু একটার ধ্বংসাবশেষ। তার পিছনেই একটা মোটা খুঁটি (পরে বুঝেছিলাম, মাস্তুল), তার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ডুবুরী।

ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে গেলাম, তারপর তার পিছন পিছন এগিয়ে পেঁছিলাম জাহাজটার পাশের দিকে। কিন্তু ভিতরে নামা বেশ কঠিন ব্যাপার কারণ জাহাজের গাটা জলজ উদ্ভিদ, শামুক আর শ্যাওলায় ভরা। তবে আমাদের দিকে ছুটে-আসা জলে কিছুটা সুবিধা হল। আগেই ঠিক করা হয়েছিল, ভাঙা রাউন্ড-হাউসের ভিতর দিয়ে আমরা পেটের ভিতর ঢুকতে চেষ্টা করব।

জাহাজের পাশের সীমানাটা বেশ ভালভাবে পরিষ্কার করে তৈরী। কিন্তু উপরের আলো তার ওদিকে আর আসছে না। ওদিকটা অন্ধকার—কালো জলে ভরা ভীষণ গহ্বর। জাহাজের সীমানার ওপারে পাঁচমাইল গভীরতা, কথাটা ভাবতেই গা শিউরে উঠল।

ডেকের উপর টুকরো টুকরো আলো ঢেউগুলোকে তাড়া করে চলেছে। সেই নিষ্প্রভ, সবুজ আলোর আভা দেখতে দেখতে জাহাজটা এককালে কীরকম ছিল সেটাই কল্পনা করার চেষ্টা করলাম। আমার সহায়তায় এগিয়ে এল স্মৃতিপটে সঞ্চিত যত পালতোলা জাহাজের ছবি। ঝিনুকের ঘন আস্তর আর

জলজ উদ্ভিদের আন্দোলিত শুঁড়ের ভিতর দিয়ে একটা খুব শক্ত সমর্থ, তিন মাস্তুলওয়ালা চওড়া জাহাজের চেহারা মনে মনে আঁচ করে নিলাম। নিচু, ভোঁতা মুখ আর পিছনের উঁচু গলুই দেখে বোঝা গেল জাহাজটা অষ্টাদশ শতাব্দীর। ভাঙা, মোটা পালদণ্ডটা দেখে আঁচ করা যায় এককালে সেটা ছিল খুবই লম্বা। অষ্টাদশ শতকের জাহাজের সেটাও একটা বৈশিষ্ট্য। খোলটা অসাধারণ রকম সুরক্ষিত, এমনকি পেটের কাঠের ঢাকনাটাও অক্ষত রয়েছে। প্রধান মাস্তুলটার ঠিক সামনেই একটা ফাটল, আমাদের জাহাজটা ঐখানেই ধাক্কা মেরেছে। ডেকটা ভেঙে গেছে, চারিদিকে বেরিয়ে আছে দুমড়নো ভাঙা কাঠ। তার ফলে জাহাজের এদিকটার অত্যন্ত বিষণ্ণ বিধ্বস্ত চেহারা হয়েছে। তার গায়ের ফাটলের হাঁ করা কালো মুখগুলো সে বিষণ্ণতা আরো বাড়িয়ে তুলেছে।

সেই ভাঙা কাঠের গোলোকধাঁধায় হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। ডুবুরী ততক্ষণে একটা জোরাল টর্চ জ্বালিয়ে জাহাজের বাঁদিকে সরে গেছে। আগেই আঁচ করেছিলাম, পুপ-হাউসের স্টারবোর্ড করিডরের দরজাটা এখানেই হবে। পুপ-হাউসটা কী করে যেন ধাক্কার হাত থেকে বেঁচে গেছে। আমিও আমার টর্চ জ্বালালাম। তারপর ডুবুরীর গায়ে গা ঠেকিয়ে সাবধানে কাঠের পাটা বেছে বেছে পা ফেলে সেই ভীষণ অন্ধকারের ভিতর ঢুকলাম।

ডাইনে দেখা যাচ্ছে চাপা ধূসর আলো। পিছনের পোর্ট-হোল মানে তার যতটুকু অবশিষ্ট আছ তার ভিতর দিয়েই বোধহয় এসেছে। প্রবেশপথ যদি কিছু থেকে থাকে তবে সেগুলো জাহাজের পেটের ভিতরেই। তা ফেলে এসেছি উঁচু গলুই বেয়ে নিচে নামার সময় স্টারবোর্ডে। আমার মন তখন কৌতূহলে অধীর হয়ে উঠেছে। তাই চট করে মনে হল আলোটা নিশ্চয়ই ওয়ার্ডরুমের ভিতর দিয়েই আসছে। উল্টোদিকেই তবে ক্যাপ্টেনের ঘর। ডাইনের দেয়ালে একটা ধূসর আলো নাচছে। কেবিনের প্রবেশপথ নিশ্চয় ঐখানেই। জাহাজের গোপন পরিচয় লুকিয়ে আছে ঐ কেবিনেরই ভিতরে। ডাইনে বেঁকে গেলাম। জলের গায়ে টর্চের লাল আলোটা ভেসে গেল ফাঁকা খয়েরী-কালো দেয়ালের উপর দিয়ে। পিছল পাটার উপরে রবারের দস্তানা-পরা হাতটা বুলিয়ে বুলিয়ে দরজার কব্জা পাওয়া গেল।

দরজাটা তবে ঐখানেই হবে মনে করে কাঁধ দিয়ে জোর ধাক্কা দিলাম। কোন ফল হল না। লোহার শিক দিয়ে মারলাম। চারবারের বার শিকটা সোজা কাঠ ফুটো করে ঢুকে গেল। আরেকটু হলেই হাত ফসকে দরজার ওপাশের ফাঁকায় মানে জলেই পড়ে যেত হয়ত। দরজাটা খোলার চেষ্টা করছি এমন সময় আমার পিছনে ডুবুরীর টর্চের মুখটা দেখা গেল। ডুবুরীর শিরস্ত্রাণটা ঠেকল আমার শিরস্ত্রাণের গায়ে। আধ-আলোয় দেখতে পেলাম ডুবুরীর মুখে কেমন একটা হতভম্ব দুশ্চিন্তার ভাব। দরজাটা আঙুল দিয়ে দেখাতে ডুবুরীও মাথা নেড়ে সমর্থন জানাল।

এমন সময় শুনতে পেলাম উদ্ধারদলের দলপতির গলার স্বর। ইঞ্জিনিয়ার উৎকণ্ঠার সঙ্গে জিজ্ঞেস করে চলেছে, 'কমরেড ফার্স্ট মেট, কী হয়েছে? উত্তর দিচ্ছেন না কেন?' সংক্ষেপে জানালাম, আমরা পুপ-হাউসে ঢুকেছি, সব ঠিক আছে, শীগ্গিরই জাহাজের পেটের ভিতর ঢুকব। টেলিফোনের ওধারের গলাটা নিশ্চিন্ত হয়ে থেমে গেল। আবার ক্যাপ্টেনের দরজার দিকে ফিরলাম। দরজাটা যে ক্যাপ্টেনের ঘরের সে বিষয়ে আমার এতটুকুও সন্দেহ ছিল না।

দরজার উপরে হাত লাগিয়ে ডুবুরী দরজা আর কব্জার মাঝখানে তার লোহার শিকটা চালিয়ে দিল। মনে মনে ভাবলাম দরজাটা আবার বাইরের দিকে খুলতে হবে। ডুবুরীর ঐ প্রচণ্ড শক্তির সঙ্গে আমিও যোগ দিলাম। মিনিটখানেক পরেই আমরা এসে পড়লাম দুর্ভেদ্য অন্ধকারে। এককালে যেখানে ক্যাপ্টেনের কেবিন ছিল সেইখানে। কেবিনটা বড়। আমাদের টর্চের আলোয় কিছুই ভাল করে দেখা গেল না। মেঝেটা সমান আর পিছল। আসবাবপত্রের ভগ্নাবশেষ যত টুকরো টুকরো কাঠ ছড়ান। বুটের ডগাটা কিসে যেন হোঁচট খেল। টর্চের আলোয় দেখতে পেলাম একটা চৌকো বাক্সের কোণা। কেবিনের বাঁদিকের দেয়ালের কাছে বাক্সটা পড়ে আছে একপাশে কাৎ হয়ে।

'আরে!' আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গেই যেন অন্য এক জগৎ থেকে ইঞ্জিনিয়ারের গলা ভেসে এল, 'কী হল!'

'কিছু না, ঠিক আছে,' তাড়াতাড়ি জবাব দিয়ে বাক্সটা তুলে নেবার জন্য ঝুঁকে পড়লাম। বাক্সটা বেশি ভারী নয়, কিন্তু এই অনভ্যস্থ কাজে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, তার ওপর আবার যন্ত্রপাতির ভার। তাই বাক্সটা বইতে বেশ কষ্ট হল।

ডুবুরীও ততক্ষণে ঘরটার চারদিক ঘুরে দুটো ছোট ছোট বাক্স বগলে পুরে ফিরে এসেছে। আমার বাক্সটা দেখে সে মাথা নেড়ে সন্তোষ প্রকাশ করল। ঘরের ভিতর উল্লেখযোগ্য আর কিছু না পেয়ে আমরা ঠিক করলাম এরপর কী করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করব। তাই উপরের জাহাজের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলা হল। তারপর ডেকের উপর বাক্সগুলো রেখে আমরা ফিরে এলাম করিডরে। সৌভাগ্যক্রমে জাহাজের পেটের ভিতরে ঢোকার পথটা পেতে এতটুকুও দেরী হল না।

এর পরের কাজের বিবরণটা একটু ছাড়া ছাড়াই হবে। সেই সরু আর ঠাসা করিডরের অন্তহীন অন্ধকারে কাজ করা হাড় ভাঙা পরিশ্রমের ব্যাপার। যা হক শেষ পর্যন্ত কাজটা তো শেষ হল। পালতোলা জাহাজটার স্টারবোর্ডের পাশে আর তলে বারুদের চার্জ বসান হল। তারের সংযোগটাও পরীক্ষা করে নিলাম। আমার শরীরে কিন্তু তখন আর একফোঁটাও শক্তি নেই। পিছনের গলুইয়ের কাছে মস্ত এক খুঁটির উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আমার দুরবস্থা দেখে ডুবুরী আমায় দম সঞ্চয় করে নেবার সুযোগ দিল। সূর্যের চাপা কম্পিত আলো আবার দেখতে পেয়ে খুব স্বস্তিবোধ করলাম। ডোবা জাহাজের ডেক, স্টারবোর্ডের কিনারা আর ভাঙা পালদণ্ডটা একবার শেষ-বারের মতো দেখে নিলাম। তারপর সিগ্ন্যাল দিলাম "উপরে তোল।" কিছুক্ষণ পরেই এসে পড়লাম চোখ ধাঁধান আলোর রাজ্যে। ঢেউগুলো আবার গায়ে বাড়ি মারতে লাগল। সমুদ্রের বুকের ঔজ্জ্বল্য যেমন আকস্মিক তেমনি আনন্দদায়ক বলে মনে হল। অন্যেরা আমার শিরস্ত্রাণ আর মোটা বর্ম খুলতে খুলতে ডুবুরীকেও তোলা হল।

কেভেল-হেডের উপর নেমে এসে মুগ্ধ দৃষ্টিতে ডুবুরীর দিকে তাকিয়ে রইলাম। দুটো ডুবের পরেও সে এতটুকুও কাহিল হয়নি।

'আপনার ফার্স্ট মেট বেশ শক্ত লোক,' ক্যাপ্টেনকে জানাল ডুবুরী, 'চমৎকার কাজ করেছেন। তাছাড়া আমরা, আসলে ফার্স্ট মেটই বলা উচিত, ক্যাপ্টেনের ঘর আবিষ্কার করে এগুলো পেয়েছি।' ঘাড় নেড়ে সে আমাদের পুরষ্কারগুলো দেখিয়ে দিল। বাক্সগুলো আগেই উপরে তোলা হয়েছিল।

'আচ্ছা, ও সব পরে দেখা যাবে,' ইঞ্জিনিয়ার বলল, 'আগে জাহাজটাকে উড়িয়ে দেওয়া হক।'

ডেকের সবার চোখ ইনডাকটারের ছোট্ট খয়েরী বাক্সটার উপর। ইঞ্জিনিয়ার হাঁটু গেড়ে বসে বাক্সটার হাতল জোরে ঘোরাতে ছোট্ট যন্ত্রটার সুন্দর গুঞ্জন উঠল। প্রত্যেকে তখন দমবন্ধ করে চেয়ে আছে। চারদিক নিস্তব্ধ কেবল অনেক নিচে জাহাজের গায়ে ভেঙে পড়ছে সমুদ্রের ঢেউ। ইঞ্জিনিয়ারের সরু আঙুল প্রায় অদৃশ্যভাবেই বোতামটা টিপে দিল — আমাদের উত্তেজিত স্নায়ুতন্ত্রে জোরে এসে বাজল জালের নিচের বিস্ফোরণের চাপা আওয়াজ। আমাদের জাহাজটা দুলে উঠল। লোহার খোলটা রণিত হল বিরাট পিয়ানোর মতো। বাঁপাশে সমুদ্রটা দুলে উঠল অনেক উঁচুতে। ঢেউ ভেঙে পড়ার সময় দেখা গেল কালো কালো কাঠ। কিছুক্ষণ পর কালো কর্ক-বোর্ডে জল ছেয়ে গেল, জাহাজের ভিতরের মালপত্র সব বেরিয়ে পড়েছে। এরপরে কী ঘটে তা দেখার জন্য ক্যাপ্টেন থেকে রাঁধুনে পর্যন্ত সবাই উৎকণ্ঠিত হয়ে চেয়ে। শোনা গেল একটা চাপা ঘষা আওয়াজ। তারপর একটা স্বল্প ধাক্কায় জাহাজটা একটু উপরে উঠে গেল। অপেক্ষা করেই আছি কিন্তু কোন শব্দ শোনা গেল না। কেবল ঢেউ ঘা দিয়ে চলেছে। আর খোলের গায়ে ধাক্কা মারছে বিস্ফোরণের ফলে ছড়িয়ে পড়া মালপত্র।

ইঞ্জিনিয়ারের শান্ত গলার স্বরে নিস্তব্ধতা ভেঙে গেল, 'ক্যাপ্টেন, এবার ইঞ্জিন চালান।'

'কী, হয়ে গেল?' হঠাৎ যেন প্রাণ ফিরে পেল ক্যাপ্টেন।

'আপনার কী মনে হয়!'

ক্যাপ্টেন দৌড়ে ব্রিজের উপর উঠে গেল। টেলিফোন বেজে উঠল, ইঞ্জিনের গুঞ্জন সুরু হলে নিচে আর কোন চাপা গর্জন শোনা গেল না। জাহাজ বেঁচে উঠে চলতে সুরু করল। সামনের গলুইয়ের নিচে জলের বুকে দেখা দিল আলোড়ন। জাহাজ তার পথ ধরে এগতে সুরু করলে আমরা সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'ওয়া ইঞ্জিনিয়ার কী ফতে!'

'যে যার জায়গায় যাও!' ক্যাপ্টেনের হুকুম শোনা গেল। খালাসীরা সবাই ছড়িয়ে পড়ল। নিজের নিয়ম অমান্য করে ক্যাপ্টেন নিজেই তখন ব্রিজের উপরে পাইপ ফুঁকে চলেছে।

গভীর অনিচ্ছার সঙ্গে উঠে দাঁড়ালাম কেভেল-হেড ছেড়ে। তারপর ডুবুরীর কাছে গিয়ে তার হাতটা জড়িয়ে ধরলাম। পিছন ফিরে তাকিয়ে

দেখতে পেলাম জলের উপর ভাসছে জাহাজের ভাঙা কাঠকুটো। কেমন একটা অনুশোচনা হল। নিজেকে খুনী বলে মনে হতে লাগল: বহু বছর ধরে সময় আর সমুদ্রের সঙ্গে লড়াই করে যে জাহাজ মহাসমুদ্রের বুকে ভেসে বেড়িয়েছে সে আজ ডুবতে বসেছে। গত কয়েক ঘণ্টার মানসিক উত্তেজনায় টানটান স্নায়ুগুলো ক্রমশ শিথিল হয়ে এল। সারা দেহমন জুড়ে নামল এক গভীর অবসাদ। ডেকের এক খালাসীকে আমাদের ধনরত্ন, তার মানে বাক্স-গুলো, চার্টহাউসে নিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়ে কোনরকমে এগিয়ে গেলাম ব্রিজের দিকে।

ক্যাপ্টেন দুটো হাতই বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'সত্যিই তুমি বাহাদুর, ইয়েভ্‌গেনি নিকোলায়েভিচ। তোমার কাজে অত্যন্ত খুসি হয়েছি। অবশ্য আমাদের আসল রক্ষাকর্তাকে ভুললেও চলবে না ...' উদ্ধারদলের ইঞ্জিনিয়ারকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল ক্যাপ্টেন, 'আজ তুমি বিশ্রাম নাও। তোমায় দেখেই মনে হচ্ছে খুবই বিশ্রাম দরকার।'

কোনরকমে তো বেয়ে বেয়ে নীচে নামলাম। স্নান করে ঢুকে পড়লাম নিজের কেবিনে। বাঙ্কে লম্বা হয়ে পড়ার পরও কিছুক্ষণ পর্যন্ত জলের নীচের চাপা আলো, রোদের চমক, বিষণ্ণ খোলটা চোখে ভাসতে লাগল। ইঞ্জিনের সঙ্গে তাল রেখে কেবিনটা তখন কাঁপছে। জাহাজটা প্রত্যয়ের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে তার পথ ধরে। দিনের যত ঘটনা মুছে যেতে লাগল, মিনিটখানেক পরেই গভীর ঘুমে ঢলে পড়লাম।

সন্ধ্যাবেলা ঘুম থেকে উঠতেই মনে হল একটা খুব জরুরী কাজ আমার অপেক্ষায় পড়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই বাক্সগুলোর কথা মনে পড়ল। জামাকাপড় পরে কোনরকমে নাকে মুখে দুটি গুঁজে ক্যাপ্টেনের কাছে গেলাম। ক্যাপ্টেনের কেবিনে তখন চমৎকার আড্ডা জমেছে। সুস্বাদু রামের প্রভাবে সবাই বেশ তুরীয় — আমিও যে রামের ভক্ত সে কথা স্বীকার করতে আমার লজ্জা নেই। ক্যাপ্টেনের আদেশে কম্বলের উপর একটা তেরপল বিছন হল। সুরু হল বাক্সগুলো খোলার কাজ। শক্ত কাঠের বড় বাক্সটা এমনিতে খোলা গেল না। কুড়ুল চালিয়ে সেটা ভাঙতে একটা উৎকট কড়া গন্ধে ঘর ভরে গেল।

কিন্তু ভীষণ হতাশ হলাম। একগাদা জীর্ণ কাগজ আর চামড়া ছাড়া বাক্সটায় আর কিছুই নেই — জাহাজের দিনপঞ্জীর অবশিষ্ট। ডুবুরী আর

আমার হতভম্ব মুখ দেখে ক্যাপ্টেন, উদ্ধারদলের ইঞ্জিনিয়ার আর জাহাজের ইঞ্জিনিয়ার না হেসে থাকতে পারল না।

তারপর ডুবুরীর আনা ছোট বাক্সদুটোর একটা খোলা হল। একটা পুরনো ধাঁচের ব্রোঞ্জ সেক্‌স্‌ট্যান্ট পাওয়া গেল। তার গায়ের কলঙ্ক ঘষে তুলতে লাতিনে লেখা একটা নাম পাওয়া গেল — ডেনিয়েল কী যেন, গ্লাসগো, ১৭৮৪। সেক্‌স্‌ট্যাণ্টটা যে তৈরী করেছে তার নাম। নামটা পেয়ে কিছুই লাভ হল না, পুরনো কালের প্রায় সব জাহাজেই ইংরেজদের তৈরী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হত। আর তারা বহুবছর কাজ দিত।

তৃতীয় বাক্সটা খুলতে আমরা আবার উৎসাহী হয়ে উঠলাম। বাক্সটা আমাদের হাতেই টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল। বেরিয়ে পড়ল একটা ছোট্ট টিনের আধার। জলের ফোঁটায় সেটা ছেয়ে গেছে, জোর ইলেকট্রিক আলোয় কেমন ম্যাটমেট করছে। আধারটার উপরে একটা পুরু ঢাকনী। সেটা আবার খুব জোরে আঁটা। কিছুতেই টেনে খোলা গেল না। শেষকালে করাত দিয়ে কেটে ফেলতে হল। প্রথম ঢাকনীটার নিচে আরেকটা চ্যাপ্টা ঢাকনী, তার মাঝখানে একটা আংটা। দ্বিতীয় ঢাকনীটা খুলতে বেশি কষ্ট হল না। ভিতর থেকে বিজয়গর্বে বের করা হল এক বাণ্ডিল কাগজ। কাগজগুলোয় জল ঢোকেনি, কেবল একটু স্যাঁতসেঁতে হয়ে গেছে।

সেদিন দ্বিতীয় বার আরেক দফা আনন্দের সাড়া উঠল।

এক বাণ্ডিল পুরু, ধূসর জীর্ণ কাগজ অযত্নে পাকান আর দুমড়োন। প্রত্যেকের মন তখন ঐদিকেই। ভাল করে দেখবার চেষ্টায় সবাই টেবিলের উপর দিয়ে ঝুঁকে পড়েছে। হয় কোন রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নয়ত আর্দ্রতার ফলে প্রতি পাতার আরম্ভের আর শেষের দিকের লেখা গেছে মুছে। বাইরের দিকের অনেকগুলো কাগজের লেখাও নষ্ট হয়ে গেছে। কেবল ভিতরের কাগজগুলো আর দু'ভাঁজকরা একটা ফিকে হলদে রঙের কাগজের লেখাগুলো ঠিক আছে। ঐ ভাঁজকরা কাগজটাতেই ডোবা জাহাজটার গোপন পরিচয়ের সূত্র পাওয়া গেল।

কাগজটা বড় বড় অসমান তেরচা লাইনে ভরা। পুরনো ধাঁচের ইংরেজী বেশ কষ্ট করেই আমায় পড়তে হল। অনুবাদের কাজটা বেশির ভাগ

উদ্ধারদলের দলপতি আর আমি করলাম। কঠিন কঠিন জায়গাগুলোয় আরো কেউ কেউ সাহায্য করল।

কাগজটায় লেখা ছিল:

"১২ই মার্চ, ১৭৯৩, সন্ধ্যা ছ'টা। সকালের অবেক্ষণ অনুসারে অক্ষাংশ ৩৮°২০´ দক্ষিণ, দ্রাঘিমা ২৮°৪৫´ পূব। আমার এই শেষ সময়ে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার দয়া যেন পাই। অজানা পাঠকরা, আপনারা আমার শেষ নমস্কার গ্রহণ করবেন আর সঙ্গের কাগজের জরুরী কথাগুলো পড়ে দেখবেন।

"আমি এফ্রেম্ জেসেলটন। এই সুন্দর জাহাজ "সেণ্ট এন"এর মালিক। আমি এখন এই জগতে আমার শেষ মুহূর্তগুলো গুণছি আর তাড়াতাড়ি আমার মৃত্যুর ঘটনাটা লিপিবদ্ধ করে চলেছি।

"১০ই মার্চ ভোরে আমি কেপটাউন ছেড়ে বোম্বাই অভিমুখে রওনা হই। পথে জাঞ্জিবার ঘুরে যাবার কথা। দিনের বেলা "হারিকেন অন্তরীপ" পার হয়ে ভীষণ দুলুনিতে পড়ি। রাত্রের দিকে উত্তর-পূব থেকে ছুটে আসে প্রবল ঝড়। বাধ্য হয়ে আমাদের সামনের বড় পাল তুলে ঝড়ের মুখে দক্ষিণ দিকে যেতে হয়। পরের সারাটা দিন "সেণ্ট এন"কে লড়তে হয় প্রবল ঝড়ের সঙ্গে।

"ভোরের দিকে ঝড় এক অজ্ঞাতপূর্ব অবিশ্বাস্য ভয়ানক রূপ নিল। একের পর এক ভেঙে পড়ল সবকটা মাস্তুল। খালাসীরা সাহসের সঙ্গে অনেকবার জাহাজটাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করল। কিন্তু যে দুঃখের পেয়ালা বিধি আমাদের জন্য সাজিয়ে রেখেছেন তা তখনো ভরে ওঠেনি। পাহাড়ের মতো বড় বড় ঢেউ এসে পড়ছে জাহাজের উপর। এই অসম সংগ্রামে খালাসীদের মতো জাহাজটাও ক্লান্ত। সামনের গলুই আর ডেক ফুটো হওয়ায় "সেণ্ট এন"এর ভারসাম্য গেল নষ্ট হয়ে। বিকাল পাঁচ'টায় জাহাজের সামনের গলুইয়ে এসে পড়ল বিরাট এক ঢেউ। তার ফলে জাহাজ একপাশে উল্টে গিয়ে ডুবতে সুরু করল। সেই চরম দুর্যোগের মুহূর্তে আমি ছিলাম আমার কেবিনে। আমি সবে নিচে নেমে এসে চেষ্টা করছি ..."

পরের লাইনটা আর পড়া গেল না। তারপর দেখলাম লেখা রয়েছে:

"ঝড়ের শব্দ আর ঢেউয়ের গর্জন কিছুক্ষণের জন্য ডুবে গেল জাহাজ ভাঙার আওয়াজে আর খালাসীদের চীৎকার গালাগালে। পড়ে গিয়ে আমার মাথাটা ভীষণ জোর ঠুকে গেল। গড়িয়ে চলে গেলাম ভিতরের দেয়ালের দিকে। লাফিয়ে উঠে ঠিক উপরেই দেয়ালের মাঝখানের দরজাটা জোর করে খোলার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু যতই চেষ্টা করি দরজা কিছুতেই খোলে না। দম ফুরিয়ে গেল। ঘামে নেয়ে উঠলাম। ভীষণ অবসাদে মৃত্যুর হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে আবার মেঝেতে পড়ে গেলাম।

"কিছু শক্তি ফিরে পেয়ে আবার উঠে দরজা ভাঙার চেষ্টা করতে লাগলাম। প্রথমে চেয়ারের সাহায্যে তারপর টেবিলের একটা পায়া দিয়ে। চেয়ার টেবিলগুলোই ভাঙল, দরজাটা নড়ল না। দরজা ধাক্কাতে ধাক্কাতে প্রাণপণে সাহায্য চেয়ে চীৎকার করলাম। বুঝতে পারলাম দলের আর সবাই মারা গেছে। নিজের মৃত্যুর জন্য তখন প্রস্তুত হতে সুরু করলাম।

"তারপর অনেক সময় পার হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে ঘণ্টায় একফুটের মতো জল উঠে আমার কেবিন ভরে দিয়েছে। দুর্যোগের আঘাতে একথা খেয়াল হয়নি যে জাহাজের মাল হালকা আর "সেণ্ট এন"এর খোলও অত্যন্ত শক্ত, তাই জাহাজটা সহজে ডোববার নয়। মাল বলতে ছিল কেবল পোর্তুগাল থেকে আনা কর্ক। তার ফলেই মৃত্যুর আগে আমার আবিষ্কারের কথা বলে যাবার সময় পাচ্ছি। এই সুযোগে মানুষের কাছে আমার আবিষ্কারের কথা জানিয়ে যেতে চাই। আগে যে তা করিনি তার কারণ কিছুটা আমার উদাসীনতা, কিছুটা আবিষ্কার সম্পূর্ণ করে তোলায় আমার বিরামহীন প্রচেষ্টা।

"অস্ট্রেলিয়া আর আফ্রিকার মধ্যবর্তী সমুদ্রগভীরে আমার যে অনুসন্ধান তার খসড়া একটা বিশেষ পাত্রে ভরে রেখেছি। সেই পাত্রেই আমার এই শেষ লেখা রেখে যাব। আশা রইল, আমার জাহাজের ভগ্নাবশেষ মহাসমুদ্রের বুকে ভাসতে ভাসতে একদিন তীরে গিয়ে ঠেকবে। নয়ত মাঝ সমুদ্রে কারো চোখে পড়বে। স্বভাবতই কাগজপত্র আর দামী জিনিসের জন্য ক্যাপ্টেনের কেবিনটা খোঁজা হবে...

"লণ্ঠনের তেল — দৈবক্রমে সেটা নষ্ট হয়নি — ফুরিয়ে আসছে। ঘরের ভিতর এখন ফুট তিনেকেরও বেশি জল। ঝড়ের গর্জন আর জাহাজের আন্দোলন এতটুকুও কমেনি। "সেণ্ট এন"এর ডেকের উপর দিয়ে শুনতে পাচ্ছি সমুদ্রের ঢেউ চলে যাচ্ছে। বিধ্বস্ত জাহাজের ভিতরে আমি আটকা পড়েছি। সমস্ত আশা ধূলিসাৎ হয়েছে। অপেক্ষা করে রয়েছে নিষ্করুণ মৃত্যু। মানুষের অক্ষমতা আর নশ্বরতা সত্ত্বেও সামনে দেখতে পাচ্ছি একটুকরো আশার আলো। যদি মারা পড়ি তবুও আমার এই লেখা লোকের চোখে পড়ার কিছু সম্ভাবনা থেকে যাবে। আমার কাজও তবে আমার পরেও বেঁচে থাকবে।

"আর সময় নষ্ট করা চলে না। জল ক্রমেই আরো জোরে ভিতরে ঢুকছে। যে কাঠের আলমারির উপর উঠে বসেছি, শীগ্‌গির সেটাও ডুবে যাবে। বিদায়, অজানা বন্ধুরা। আমার গোপন কথা এই হতভাগ্য নির্বোধ লোকটার মতো চেপে রাখবেন না। জগতের কাছে তা প্রকাশ করবেন। ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ হক। আমেন!"

অনুবাদের শেষ কথাটা উচ্চারণ করল ইঞ্জিনিয়ার। এত বড় একটা দুঃখের ঘটনার এরকম সরল বর্ণনায় অভিভূত আমরা অনেকক্ষণ চুপ করে রইলাম। বহুকাল পরলোকগত মানুষটির নির্ভীকতা আমাদের মুগ্ধ করল।

জাহাজের ইঞ্জিনিয়ারই প্রথম নিস্তব্ধতা ভেঙে বলে উঠল, 'একবার কল্পনা করে দেখুন — জাহাজটা ডুবছে, ঘরের মধ্যে বন্দী লোকটা নিভে-আসা আলোয় এই কথাগুলো লিখে চলেছে। এইসব প্রাচীন নাবিকদের মনের জোর ছিল প্রচণ্ড!'

'পৃথিবীতে সাহসী লোকের অভাব কখনো হয় না,' ক্যাপ্টেন বলল, 'এই লেখা ১৭৯৩ সালের। তার মানে আমাদের হাতে পড়ার আগে একশ তেত্রিশ বছর কেটে গেছে।'

'এর চেয়েও বিস্ময়কর হচ্ছে আরেকটা জিনিস,' উদ্ধারদলের দলপতি বলে উঠল, 'দুর্ঘটনার অক্ষাংশ আর দ্রাঘিমাটা দেখুন। দুর্ঘটনাটা ঘটেছে দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূলে আর আমাদের সঙ্গে "সেণ্ট এন"এর দেখা হল কুরিল দ্বীপপুঞ্জে।'

'এর কারণ খুবই সাধারণ,' সমুদ্রস্রোতের একটা মস্ত ম্যাপ বের করে

ক্যাপ্টেন বলল, 'এই দেখুন, নিজের চোখেই দেখুন।' ফিকে নীল সমুদ্র জোড়া ঘননীল, কালো আর লাল রেখাগুলোর উপর বেঁটে মোটা আঙুল ক্যাপ্টেন বোলাতে লাগল। 'এই হচ্ছে দক্ষিণ অক্ষাংশের সবচেয়ে জোরাল স্রোত। দুর্ঘটনা যে কেপ'এর দক্ষিণ-পূবে ঘটেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। স্রোতটা পূবমুখে বহুদূরে চলে গেছে, প্রায় দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম কূল পর্যন্ত। তারপর উত্তরে ঘুরে মিশেছে জোরাল নিরক্ষীয় স্রোতে। নিরক্ষীয় স্রোত আবার পশ্চিমমুখে ফিলিপিন দ্বীপপুঞ্জের কাছাকাছি গেছে। মিনদানাওয়ের উল্টোদিকে এইখানে নানাদিক থেকে নানা স্রোত এসে মিশে একটা জটিল আবর্তের সৃষ্টি হয়। কোন কোন স্রোত উত্তরে ঘুরে গিয়ে কুরোশিও অনুবাহে মেশে। কাজেই ভাসমান কফিনটার পক্ষে এ পথে আসা কিছুই কঠিন না।'

ডুবুরী আমার পাশেই বসেছিল। সে হঠাৎ উত্তেজিতভাবে তার দলপতির উদ্দেশে বলে উঠল, 'আচ্ছা, ক্যাপ্টেন যে মারা যাওয়া পর্যন্ত তার কেবিনেই ছিল সেটা কি ঠিক?'

'সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।'

'তবে আমরা তার হাড়গোড় কেন খুঁজে পেলাম না?'

'খুব সোজা কথা। নোনা জলে হাড় যে গলে যায়, তা তো জানই। একশ তেত্রিশ বছর সে কাজের পক্ষে যথেষ্ট দীর্ঘ সময়।'

'নির্মম সমুদ্র!' ডুবুরী বলল, 'প্রথমে শেষ করল মানুষটাকে, তারপর তার হাড়গোড়কে।'

'নির্মম নয়,' আমি জবাব দিলাম, 'মাটির চেয়েও সে বরং আরো ভালভাবে মানুষকে আত্মসাৎ করে নেয়। অস্ট্রেলিয়া আর সাখালিনের মধ্যে সলিলসমাধিতে যদি সবকিছু মিশে যায় তাতে ক্ষতি কী?'

'ওকে থামাও, নইলে আমি ডুবে মরব!' ঠাট্টা করে বলে উঠল ক্যাপ্টেন।

তা শুনে কেউ কিন্তু হাসল না। সবাই স্থিরদৃষ্টে চেয়ে রইল ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া অন্য কাগজগুলোর দিকে। কারো মুখে কথা নেই। একই হাতের লেখা কিন্তু অক্ষর ছোট আর আরো সমান। বেশ বোঝা যায়, ঠাণ্ডা মাথায় মন দিয়ে কাগজগুলো লেখা হয়েছে। আসন্ন মৃত্যুর মুখোমুখি বসে নয়।

আর্দ্রতার ফলে লেখা যেখানে অংশত নষ্ট হয়েছে সেগুলো দেখা গেল পাঠোদ্ধার করা সম্ভব নয়। কালি হয় মুছে গেছে নয়ত গেছে ধেবড়ে। তারোপর অপ্রচলিত শব্দ আর অপরিচিত কথার ভঙ্গী বোঝার মতো ইংরেজী জ্ঞানও আমাদের নেই। যে পাতাগুলো পড়া যায় সেগুলো আলাদা করে ফেলা হল। সংখ্যায় তারা বেশি না হলেও বেশ পরপর ছিল। একেবারে মাঝখানের পাতা বলে বেঁচে গিয়েছে। কাজেই কিছুটা লেখা পাওয়া গেল পুরো। এখনো আমার স্মৃতিতে তারা ফোটোস্ট্যাটিক কপির মতো মুদ্রিত রয়েছে।

"...চতুর্থবার জল মাপার কাজ অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠল। ক্রেন বেঁকে গিয়ে ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ উঠছে। উইনশের খালাসীরা পঞ্চাশজনই একেবারে কাহিল। কড়িবরগার জোর দেখে আমার ভারী আনন্দ হল। "দুরন্ত চল্লিশ অক্ষাংশে"র কঠিন পাড়ির উপযোগী জাহাজ গড়ে তোলার জন্য আমার সার্থক পরিশ্রম সফল হয়েছে। নিজেকে মনে মনে অভিনন্দন জানালাম।

"জল আর অন্যান্য সামুদ্রিক জিনিসের নমুনা সংগ্রহের জন্য একটা ব্রোঞ্জের সিলিণ্ডার তৈরী করেছিলাম। চার ঘণ্টার প্রচণ্ড পরিশ্রমের পর বিরাট সিলিণ্ডারটা ঢেউ ছেড়ে উঠল। ক্রেনচালক তাড়াতাড়ি সিলিণ্ডারটাকে ডেকের উপর টেনে তুলল। সিলিণ্ডারটা এদিক ওদিক দুলছে আর ভিতরের প্রচণ্ড চাপে তার খাঁচার তল থেকে ক্ষীণ ধারায় জল ঝরে পড়ছে। এমন সময় বোসান ব্রেক-লেভারটা ছুঁড়ে দিতে সেটা দৈবাৎ পড়ল গিয়ে লিনহ্যাম নামে এক খালাসীর কানের ঠিক উপরটায়। লিনহ্যাম তখন নিচু হয়ে জাহাজের কাছি গুছিয়ে তুলছিল। কানের উপর অত জোর ঘা খেয়ে সে তো অজ্ঞান হয়ে পড়ল। ক্ষতের মুখ থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। লিনহ্যাম চোখ পাকাতে লাগল। ঠোঁটদুটো তার হয়ে উঠল রক্তহীন। দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল। তার অবস্থা যে খুবই সঙিন তা বেশ বোঝা গেল। সাউণ্ডিং-সিলিণ্ডারের নিচেই লিনহ্যাম পড়ে আছে। সিলিণ্ডারের জল চুঁয়ে চুঁয়ে এসে পড়ছে তার ক্ষতের উপর।

"দৌড়ে গিয়ে আমরা লিনহ্যামকে তুলে নিলাম। রক্তপড়াটা দেখলাম অদ্ভুতভাবে বন্ধ হয়ে গেছে। রোগীদের জায়গায় তাকে নিয়ে যাওয়া হল। আশ্চর্যের ব্যাপার, খুব অল্প সময়ের মধ্যেই লিনহ্যাম সেরে উঠল। মাথা

ধরা ছাড়া দুর্ঘটনার কোন উপসর্গ তার রইল না। মাথা ধরার কারণ নিশ্চয়ই ব্রেন কনকাশন। পরের দিনই ক্ষতটা পুরোপুরি শুকিয়ে গেল।

"এত তাড়াতাড়ি সেরে ওঠার ব্যাপারটার সঙ্গে প্রথমে গভীর সমুদ্রের জলের সম্বন্ধটা আমার মাথায় আসেনি। খালাসীদের মধ্যে হঠাৎ দেখি একটা গুজব ছড়িয়ে পড়েছে — সমুদ্রের তল থেকে ক্যাপ্টেন মৃতসঞ্জীবনী জল নিয়ে এসেছে। পরদিন সকালে স্মিথ এল তার হাতের বিষফোঁড়াটা সারিয়ে দেবার আর্জি নিয়ে। আগের দিন আনা গভীর সমুদ্রের জলে রুমাল ভিজিয়ে তাকে দিলাম। তারপর আবার জল বিশ্লেষণের কাজ নিয়ে পড়লাম।

"সাধারণ সাগরজলের চেয়ে এই জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব অনেক বেশি। স্বচ্ছ কাচের গেলাসের ভিতর দিয়ে রংটা মনে হল নীলচে-ধূসর। এছাড়া আর কোন বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ল না। এমনকি স্বাদটাও সাধারণ সাগরজলের চেয়ে ভিন্ন নয়। এবারডীনে আমার এক পণ্ডিত রাসায়নিক বন্ধু আছে। তাকে জলটা দেখাব বলে একটা বোতলে কিছুটা ভরে রাখলাম।

"কাজটা শেষ হবার পর হঠাৎ নিজের মধ্যে খুব একটা জোর আর উৎসাহ অনুভব করলাম। সমুদ্রের গভীরের জল কিছুটা পেটে গিয়েছিল। মনে হল সেটাই এই অনুভূতির কারণ।

"স্মিথের ফোঁড়াও দুদিনেই সেরে গেল। এই মায়া জলের একশিশি তখন থেকে সর্বদাই রইল আমার সঙ্গে। সে জল দিয়ে কাটা ছেঁড়া থেকে সুরু করে গ্যাস্ট্রিক গণ্ডগোল পর্যন্ত সারাতে লাগলাম।

"জলটা নেওয়া হয়েছিল ৪০°২২´ দক্ষিণ অক্ষাংশ আর ৩৯°৩০´ পূর্ব দ্রাঘিমার গভীর অতল থেকে। সমুদ্র এখানে উনিশ হাজার ফুট গভীর।

"সমুদ্রগর্ভে এটাই আমার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। এর আগে পর্যন্ত ধারণা ছিল "হ্যারিকেন অন্তরীপের" উত্তর-পশ্চিমে, সতের হাজার ফুট নিচে প্রাপ্ত তীব্র অম্লপূর্ণ লাল কেলাসই হচ্ছে আমার সবচেয়ে বড় আবিষ্কার।

"আরো দুটো বাঁধা সমুদ্রযাত্রার পর যথেষ্ট টাকা পাওয়া যাবে — টাকা নিয়েই যত ঝামেলা! — তখন কেপ'এর দক্ষিণে চল্লিশ অক্ষাংশের উপরে সমুদ্রগর্ভ খুঁজে দেখা যাবে। ক্যাপ্টেন এট্রাব্রিজ সেখানে অনেকটা জায়গা জোড়া একটা গহ্বর পেয়েছেন। এই রহস্যেভরা গভীরতায় প্রাচীন পদার্থের

সঞ্চয় পাব বলে আমার ধারণা। এই সব গভীরে স্রোত বা ঢেউ নেই। তাই এদের সঞ্চয় কখনো সমুদ্রের উপর ভেসে উঠতে পারে না।

"আমার আবিষ্কারে লা প্যারুজ কী খুসিই না হতেন। লা প্যারুজ তাঁর তত্ত্ব আমার কাছেই সব প্রথম প্রকাশ করে যান। দক্ষিণ অক্ষাংশের সমুদ্রগর্ভের প্রতি আমার কৌতূহল জাগিয়ে তোলেন। কিন্তু মৃত্যু তাঁকে আমাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে। আমার এই আবিষ্কারের কথা এখনো প্রকাশ করার সময় আসেনি। ক্যাপ্টেন এট্রাব্রিজ বর্ণিত সমুদ্রগর্ভ খুঁজে দেখার আগে তা করব না।"

শেষ পাতাটায় লেখা "আগস্ট ২০, ১৭৯১", তারপর:

"কাফ্‌ফারারিয়ার পূর্বতীর ছেড়ে পুবমুখো আরো একশ মাইল এসে দেখা হল একটা দু'মাস্তুলী ওলন্দাজ জাহাজের সঙ্গে। জাহাজের ক্যাপ্টেন জানাল সে আসলে যাচ্ছে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে কেপটাউন। কিন্তু ঝড় এড়াবার জন্য তাকে বাধ্য হয়ে পশ্চিম মুখে যেতে হচ্ছে। আমাদের সঙ্গে দেখা হবার তিন দিন আগে একজায়গায় সে দেখেছে — বিরাট বিরাট ঢেউ খাড়া উঠছে। যেন অদৃশ্য কোন গোল বেড়া দিয়ে জায়গাটা ঘেরা। ঢেউয়ের চোটে জাহাজের সে কী দুলুনী। খোলের জোড় আর দড়ির বাঁধুনীগুলির জন্য ভয় হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সত্যিই জাহাজটায় জল ঢুকতে সুরু করে। সৌভাগ্যক্রমে জায়গাটা বেশি বড় নয়, অল্প কয়েক মাইল মাত্র। পিছন থেকে আবার নতুন হাওয়াও বইতে সুরু করে। তার ফলে তারা বেশ তাড়াতাড়িই জায়গাটা পার হয়ে আসে।

"এক সাধারণ কল্পনাশক্তিহীন নাবিকের কাছে এমন দুর্লভ ঘটনার কথা শুনে আমার কৌতূহল আরো বেড়ে গেল। এরকম ঘটনা আমিও দেখেছি। সবসময় একটা গোল জায়গাতেই এরকম ঘটে। তার ফলেই বোঝা যায়..."

পাতাটা এখানেই শেষ হয়েছে। বাকি পাতাগুলো আর পড়া যায় না। পরে জেনেছি দুর্লভ প্রাচীন সমুদ্রগর্ভে নানা রকমের খনিজ দ্রব্য আর গ্যাস পাওয়া যায় যাদের জৈব আর রাসায়নিক ধর্ম খুবই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, পৃথিবীর বুক থেকে তারা বহুকাল আগেই লোপ পেয়েছে।

ভ্লাদিভস্তকে ফিরে এসে আরেকটা জাহাজে আমি ফার্স্ট মেটের কাজ

পেলাম। ন'হাজার টনী এই জাহাজটা জাপান থেকে লেনিনগ্রাদে যাচ্ছিল। টাসকারোরা গর্ভে আগের জাহাজটাকে রক্ষা করার পুরষ্কার। আগের জাহাজ, তার ক্যাপ্টেন আর খালাসীদের ছেড়ে যেতে খুবই কষ্ট হল। দুবছর ওদের সঙ্গে কাজ করেছি। কিন্তু নতুন চিত্তাকর্ষক দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রার আকর্ষণও কম নয়। কিন্তু তবু বিদায় ভোজের দিন ক্যাপ্টেন আর আমার অন্য বন্ধুদের ছেড়ে যেতে মন চাইছিল না।

নতুন জাহাজটা সাংহাইয়ে কাঠ নিয়ে যাবে। তারপর সিঙ্গাপুরে গিয়ে নেবে টিন। সেখান থেকে যাবে গিনি উপসাগরের পোঁয়াৎ-নোয়ার'এ, সস্তা দরে আফ্রিকার তামা নিতে। ঐ তামা তখন সবে বাজারে চালু হয়েছে। তাই সুয়েজ দিয়ে না গিয়ে আমাদের কেপটাউন আর আফ্রিকা ঘুরে যেতে হবে। "সেণ্ট এন" যেখানে বিপদে পড়ে সেখান দিয়েই। এই যাত্রায় যে আমার একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল সে কথা বলাই বাহুল্য।

আমার অল্প যা জিনিসপত্র নিয়ে নিলাম। ক্যাপ্টেন জেসেলটনের দামী পাণ্ডুলিপিটাও টিনের আধারে আমার সঙ্গেই রইল। সব নিয়ে তুললাম নতুন জাহাজে ফার্স্ট মেটের চমৎকার কেবিনটায়। তারপর লেগে গেলাম নতুন কাজকর্ম বুঝে নিতে।

যাত্রার কথা আর কিছু বলব না। সাতসমুদ্র পার হয়ে দিবারাত্র কত জাহাজই না আসা যাওয়া করছে। তাদের সঙ্গে আমাদের পথ চলার কোনই তফাৎ নেই। অপরিচিত জলের উপর দিয়ে পথ ঠিক করার কাজেই ক্যাপ্টেন আর আমার অনেকটা সময় যায়। মাল ওঠানামার কাজও দেখতে হয়। "দুরন্ত চল্লিশ অক্ষাংশ" আমাদের সঙ্গে বেশ ভদ্র ব্যবহারই করল। একটা ছোট দরের ঝড়ের পরেই আমাদের ছেড়ে দিল। কিন্তু তবু কেপটাউন পেঁছে স্বস্তি বোধ করলাম। কিসের জন্য যেন দেরী হওয়ায় তিন দিন সহরেই থাকতে হল। আমিও সেই সুযোগে সুন্দর সহরটা ঘুরে দেখে নিলাম।

জাহাজীরা সাধারণত কেপটাউনে নেমে এডারলি স্ট্রীটের নানা দেশী লোকের ভীড়ে মিশে পড়ে। আমি কিন্তু তা না করে চলে গেলাম সহরের বাইরে। আকণ্ঠ পান করে নিলাম তার মহিমান্বিত সৌন্দর্য আর নির্জনতা। টেব্‌ল্ পাহাড়ের উপর থেকে চেয়ে রইলাম টেব্‌ল্ উপসাগরের তীরে সহরটার দিকে। নিচে উপদ্বীপের চ্যাপ্টা মাথা টিলাগুলো। বহুদক্ষিণে চলে

গেছে ছোট উপসাগর। তাদের জলে সূর্যের উজ্জ্বল আলোর প্রতিফলন। সোনালী কাস্তের মতো বালিভরা সৈকতে সাদা ফেনার পাড়। উত্তরে আমার পিছনে ছড়িয়ে আছে ফিকে-নীল পাহাড়ের সারি। সহর আর সী-পয়েণ্টের মাঝখানে খাড়া হয়ে উঠে আছে সিংহ পাহাড়ের বাঁকা মাথাটা। সেখানে সমুদ্রের বুকের বিরাট ঢেউগুলো অনেক দূর থেকেও দেখা যায়। উপদ্বীপের অন্যদিকে মুইজেনবার্গে গিয়ে এগালাস স্রোতের নরম উষ্ণ নীল ঢেউয়ে ডুব দিয়ে স্নান করে নিলাম।

মুইজেনবার্গ যাবার পথে ভেইনবার্গের বিখ্যাত ভান ডের স্টেল আঙ্গুরক্ষেতে একশ বছরের পুরনো চমৎকার মদও খাওয়া গেল। খোলা মোটর গাড়িতে চড়ে যেতে যেতে ওলন্দাজ বাড়িগুলোর অদ্ভুত ধরনের পুরনো স্থাপত্যের সৌন্দর্যে আমি অভিভূত। বাড়িগুলো বিরাট বিরাট ওক আর পাইনগাছের আড়ালে প্রায় অদৃশ্য। বাতাসে ওক আর পাইনের এক বিচিত্র, জোরাল গন্ধ।

কেপটাউনে আমার শেষ দিন। সকাল বেলা একটা ট্যাক্সি করে মেরিন ড্রাইভ ধরে ছুটে চলেছি। এই সুন্দর পথটা তৈরী সী-পয়েণ্টের দক্ষিণে পাথর কেটে। চ্যাপম্যান পাহাড়ের লাল রং খাড়া গা নেমে গেছে দুরন্ত ঢেউয়ের মধ্যে। "ক্যাম্প" বে আর "বার এপষ্টল্‌স্‌"এর তল দিয়ে যাবার সময় ঠাণ্ডা হাওয়া মুখে নোনা জল ছিটতে লাগল। বাতাসের স্পর্শ আর মহাসমুদ্রের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে ঠিক করলাম সী-পয়েণ্টের উপকণ্ঠের একটা সরাইখানায় সন্ধ্যাটা কাটাব। জায়গাটায় আমি আগেও একবার এসেছিলাম।

তখন বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে। অদৃশ্য সমুদ্রের নিরবচ্ছিন্ন গর্জনে ভরে আছে বাতাস। এস্‌ফল্টের একটা ছোট রাস্তা ধরে এগিয়ে গিয়ে ডাইনে বেঁকলাম। ছোট থামের উপর দুটো ঘসা কাচের গোল আলো বসান পরিচিত ফিকে-সবুজ দরজাটার দিকে এগিয়ে গেলাম। নিচের ঘরটায় খালাসীরা প্রায়ই আসে। সিগারেটের ধোঁয়া, মদের গন্ধ আর হল্লায় ঘরটা ভরে উঠেছে। নাবিকদের মন কীসে ছোঁয় সরাইয়ের মালিক তা ভাল করেই জানে, তাই বেহালায় শোনা যাচ্ছে ব্রাহ্‌মসের মিঠে সুর।

এক অদ্ভুত অথচ আনন্দদায়ক দুঃখে আমার মন ভরে উঠল। বিচিত্র অথচ সুন্দর জায়গাকে বিদায় জানাতে গিয়ে এই দুঃখ অনুভব করেনি এমন

কে আছে? কাল জাহাজ ছাড়বে। চিরদিনের মতো হয়ত এই সুন্দর সহর ছেড়ে চলে যাব। ভারমুক্ত, দায়মুক্ত নির্লিপ্ত বিদেশীর মতো এখানে এসে দেখে গেলাম বাইরের এই অপরিচিত জীবনযাত্রা। সে জীবনযাত্রা বিদেশীর চোখে আসলের চেয়ে বোধহয় কিছু বেশি প্রাণোচ্ছল বলেই মনে হয়েছে...

বিষণ্ণ মনে দেয়ালের দিকের একটা ছোট টেবিলে গিয়ে বসলাম। আমার পোষাকের চকচকে সোনালী ফিতে দেখে একজন ওয়েটার হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এল। বিদায়যাত্রার উপলক্ষ্যটা পালন করার জন্য ভাল করে খাবারের অর্ডার দিলাম। তারপর পাইপ ধরিয়ে চেয়ে রইলাম খালাসী আর তাদের পুতুলের মতো সাজ-করা বান্ধবীদের উচ্ছ্বসিত মুখের দিকে। কমলার রস মেশান বেশ কিছুটা রাম পেটে পড়তে মনটা খুশ হল। সুরু হল এ দেশের বিচিত্র জীবনযাত্রা নিয়ে রোমন্থন, সেই সঙ্গে বিদেশীর অবস্থা নিয়েও, চারপাশের অপরিচিত জনতা আর তার জীবনের সঙ্গে বিদেশীর যোগ নেই বলে যে তার চেয়ে নিজেকে বড় মনে করে আনন্দ পায়।

বেহালায় নতুন গানের সুর বেজে উঠল, সারাসাতের জিপসী রাগিণী। সুরটা আমার খুবই প্রিয়। শুনলে ভেসে আসে সুদূরের ডাক, বিদায়ের বেদনা, অজানার জন্য অবোধ আকুতি।

বাজনা শেষ হল। হঠাৎ স্বপ্ন ভেঙে জেগে উঠে দেশলাইটার জন্য পকেটে হাত ভরলাম। এমন সময় স্টেজের উপর এসে দাঁড়াল একটি ছিপছিপে পাৎলা মেয়ে। মেয়েটির সুকুমার সৌন্দর্য সরাইয়ের আবহাওয়ার সঙ্গে এতই বেমানান যে বড় কষ্ট হল। মেয়েটির বর্ণনা দেওয়া অসম্ভব। তার প্রয়োজনও নেই। স্টেজের সামনে এগিয়ে এসে গান ধরতে আনন্দের একটা গুঞ্জন শোনা গেল। মেয়েটির গলায় জোর কম কিন্তু মিষ্টি। গান সুরু হতে সবাই চুপ করে যেতে তা দেখে বোঝা গেল মেয়েটি সরাইখানার খরিদ্দারদের খুবই প্রিয়।

কয়েকটা ছোট ছোট গান মেয়েটি গাইল। সবই আবেগবিহ্বল প্রেমের গান। তবে সুরের পরিবেশনে মেয়েটির মৌলিক ভঙ্গী আর সূক্ষ্মবোধ বেশ ভাল লাগল। মেয়েটি স্টেজ ছেড়ে চলে গেলে পর প্রচণ্ড হাততালি আর আনন্দধ্বনিতে ঘর ভরে উঠল। তার ফলে তাকে আবার আসতে হল। এবার সে খুব অল্প পোষাক পরে একটা ট্যাপ ডান্স্ দেখাল আর গাইল কতগুলো ছোট ছোট স্থূলরসের গান। শ্রোতারা তো তা শুনে হেসেই অস্থির। নাচ আর

গানের কথার সঙ্গে মেয়েটির সৌন্দর্যে এতই বেমানান যে মনে মনে রেগে গিয়ে মুখ ঘুরিয়ে মদের পাত্রের দিকেই চেয়ে রইলাম।

মেয়েটি আবার সাজ বদলে এল। এবার তার পরনে পুরনো ধাঁচের কালো ভেল্‌ভেটের পোষাক, তাতে লেসের কলার। পোষাকটা মেয়েটির সুন্দর চেহারার সঙ্গে চমৎকার মানিয়েছিল। আমি তখন পাইপ ধরাতে ব্যস্ত। তাই গানের প্রথম কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারিনি। কিন্তু হঠাৎ "সেণ্ট এন" নামটা শুনে চমকে উঠলাম। কান খাড়া করে গানের কথাগুলো শুনতে লাগলাম। ভেবে দেখ কী অদ্ভুত কাণ্ড, গানটা ক্যাপ্টেন জেসেলটনকে নিয়েই রচিত। তার লম্বা মাস্তুলওয়ালা জাহাজ, রহস্য দ্বীপের কাছে তার মৃতসঞ্জীবনী জল আবিষ্কার — সে জল খেয়ে জ্যান্ত মানুষ আনন্দে ভরে ওঠে, মরা মানুষ প্রাণ ফিরে পায় — তারপর জাহাজ আর তার ক্যাপ্টেনের হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যাওয়া — সবকিছুই রয়েছে।

গান শেষ হতে মেয়েটি মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানাল। স্টেজ ছেড়ে বেরিয়ে যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াতেই হতভম্ব ভাবটা কাটিয়ে আমি লাফিয়ে উঠে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'এনকোর!' আমার উৎসাহ দেখে অন্য সবাই অবাক হয়ে ঘুরে তাকাল। মেয়েটিও ফিরে তাকিয়ে হাসল। তারপর মাথা নেড়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। পরে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে নিজেকে বড় বোকা বোকা লাগতে লাগল, কারণ সাধারণত মনের ভাব আমি চেপেই রাখি। কিন্তু মেয়েটির গান তখনো আমার মন আচ্ছন্ন করে রেখেছে। খালি ভেবে চলেছি কেপটাউনের সরাইয়ের গায়িকার সঙ্গে "সেণ্ট এন"এর কী সম্পর্ক থাকতে পারে। মনের আকুলতাটা যখন মেয়েটির কাছে গিয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে প্রকাশ করব ভাবছি এমন সময় চোখ তুলে দেখি সে সামনেই দাঁড়িয়ে।

'নমস্কার! আমার গান আপনার ভাল লেগেছে?' মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করল মেয়েটি।

দাঁড়িয়ে উঠে তাকে আমার টেবিলেই বসতে বললাম। ওয়েটারকে ডেকে বললাম তাকে ককটেল দিতে। তারপর তার মুখের দিকে তাকালাম। ক্লান্ত, ফ্যাকাশে মুখ। অবক্ষয়ের প্রথম ছাপ তাতে পড়েছে। তাচ্ছিল্যের ভাবে মেয়েটির নাকটা উঁচু করে রাখা। এই সুন্দর ভঙ্গীটি তার সলজ্জ হাসির

সঙ্গে চমৎকার মানিয়েছে। মসৃণ ভেল্‌ভেট পোষাকটা তার উঁচু বুক ঘিরে চেপে বসেছে।

'ক্যাপ্টেন, আপনি তো দেখছি বেশি কথা বলেন না,' ঠাট্টার সুরে আমার পদমর্যাদা বাড়িয়ে দিয়ে মেয়েটি বলল, 'আপনি কে, কোথা থেকে এসেছেন বলুন।'

সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে এসেছি শুনে মেয়েটি অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে উঠল। তার নাম জিজ্ঞেস করতে সে যে নাম উচ্চারণ করল তাতে চমকে উঠলাম — "এন জেসেলটন"।

মেয়েটি আমার দেশ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করে চলল। আমার উত্তর হল সংক্ষিপ্ত। টাসকারোরার সেই জাহাজের সঙ্গে মেয়েটির সম্বন্ধের এই অদ্ভুত ঘটনাচক্রের কথাই তখন ভাবছিলাম।

সুযোগ পাওয়া মাত্রই মেয়েটির বাবামার কথা জিজ্ঞেস করলাম। গানের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক আছে কিনা সেকথাও। এন'এর মুখের ভাব সঙ্গে সঙ্গে বদলে গিয়ে তাতে ফুটে উঠল উদাসীনতা আর রুক্ষতা। আমার প্রশ্নের কোন উত্তরই সে দিল না। আমিও ছাড়লাম না। ক্যাপ্টেন জেসেলটনকে নিয়ে আমার কৌতূহল যে অকারণ নয় তা অভাসে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলাম। জানালাম, একটা অসাধারণ ঘটনার ফলে একথা জানার অধিকার আমার রয়েছে।

মেয়েটি খাড়া হয়ে বসে তার বড় বড় চোখের শীতল দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইল, 'আমার ধারণা ছিল রুশরা খুব বিচক্ষণ, কিন্তু আপনি দেখছি আর পাঁচ জনেরই মতো,' হাত নেড়ে ধোঁয়ায় ভরা ঘরটার আর সবাইকে দেখিয়ে দিয়ে এন বলল।

'কিন্তু শুনুন,' আমি বলে উঠলাম, 'কেন জিজ্ঞেস করছি তা যদি জানতেন ...'

'সে যাই হক,' এন আমায় থামিয়ে দিল, 'আপনার সঙ্গে এখানে বসে, আমার ব্যক্তিগত কথা নিয়ে আলোচনা করতে পারব না, আমি যখন ...' এন থেমে গিয়ে আবার বলতে সুরু করল, 'যদি মনে করে থাকেন টাকার জোরে আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলাবেন তবে চললাম। আমি বড় ক্লান্ত। বাড়ি যাই!'

মেয়েটি উঠে পড়ল। নিজের মুণ্ডপাত করতে করতে আমিও উঠলাম। আমার বিচলিত অবস্থা দেখে এনের মন নরম হয়ে এল। তার সঙ্গে আমায় তার বাড়ি যেতেও বলল। সরাইয়ের বিল চুকিয়ে দিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

আমাদের ঘিরে ফেলল সমুদ্রের গন্ধ আর গর্জন। এনের হাত ধরে চওড়া রাস্তাটা পেরলাম। বাঁয়ে, উজ্জ্বল আলোয় ভরা বাড়ির মাথা আর সহরের আলোয় আলোকিত গ্রীন-পয়েণ্টের ঘন গাছের পিছনে দেখা যাচ্ছে সিগন্যাল টিলার আলোকস্তম্ভ। দুপাশে ছোট ছোট গাছের সারি একটা অন্ধকার রাস্তায় এসে পড়লাম। কোন ভূমিকা না করেই এন'কে আমার গত সমুদ্রযাত্রা আর ডোবা জাহাজের সব কথা জানালাম। একথাও বললাম যে ক্যাপ্টেন জেসেলটনের লেখা কাগজগুলো এখনো আমার কেবিনে পড়ে আছে। এন কথাটা খুব মন দিয়েই শুনল। তারপর হঠাৎ সে একটা ছোট্ট বাগানের গেটের কাছে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাগানটার একপ্রান্তে একটা অন্ধকার বাড়ি। রাস্তার লম্বা ল্যাম্পপোস্ট থেকে গাছের ফাঁক দিয়ে আলো এসে পড়েছে। এন'এর বড় বড় করুণ চোখদুটো বেশ ভাল করেই দেখতে পাচ্ছি।

এন একদৃষ্টে আমার দিকে চেয়ে। গলার স্বরের বিদ্রুপ ভাবের সঙ্গে তার চোখের অভিব্যক্তির কোনই মিল নেই, 'মাথা খাটিয়ে এমন রোমাঞ্চকর গল্প ফেঁদেছেন—আপনি দেখছি আসল খালাসী।'

একটু হেসে আমার জামার একটা বোতাম ধরে আঙুলের ডগায় ভর দিয়ে উঠে আমায় চুমু খেল। তারপরেই গেট পার হয়ে মিলিয়ে গেল বাগানের অন্ধকারে।

'এন! এক মিনিট!' চেঁচিয়ে উঠলাম। কিন্তু কোন উত্তর এল না।

একমুহূর্ত হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। মনের মধ্যে এক অস্পষ্ট হতাশার ভাব। তারপর রাস্তার দিকে ঘুরে কয়েক পা এগিয়েছি, এমন সময় শুনতে পেলাম এন'এর গলা, 'ক্যাপ্টেন, আপনার জাহাজ কখন ছাড়ছে?'

ঘড়ির দিকে চেয়ে একটু রুক্ষভাবেই বললাম, 'আর চার ঘণ্টা পরে। কিন্তু একথা কেন জিজ্ঞেস করছেন?'

এন কোন উত্তর দিল না। কানে এসে পেঁছল দরজা বন্ধ করার আওয়াজ।

জাহাজে ফেরার পক্ষে তখনো হাতে অনেক সময় রয়েছে। সরাইয়ে

ফিরতেও ইচ্ছে করছিল না। সমুদ্রের ধার দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে হাঁটতে সিগন্যাল পাহাড়ের উপরে চমকান তারাটার দিকে এগিয়ে গেলাম। পাহাড় পার হয়ে জাহাজঘাটায় যাওয়ার পথটা মাইল তিনেকের বেশি হবে না। মনটা অত্যন্ত খারাপ হয়ে আছে, মনে হচ্ছে কী যেন একটা অপূরণীয় ক্ষতি হয়ে গেল।

গ্রীন-পয়েণ্টের ঢালুতে এসে পেঁাছতেই সমুদ্রের হাওয়া জোর হয়ে উঠল। মহাসমুদ্রের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুঃখ আর হতাশার ভারটা এল কমে। এরকম আগেও অনেকবার হয়েছে। ভোরবেলা পেঁাছলাম ভিক্টোরিয়া ডক্ আর মিউল পয়েণ্টের মাঝখানের চওড়া রাস্তাটায়। আধঘণ্টা পর এসে দাঁড়ালাম ভোরের রাঙা আলোয় রঙিন জাহাজঘাটায়। মন তখন শান্ত। ঢেউয়ের দিকে চেয়ে অপেক্ষা করে আছি নৌকোর জন্য। আমাদের জাহাজ আগের দিনই সমুদ্রের বুকে গিয়ে দীর্ঘযাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে।

জাহাজে আমার কেবিনে গিয়ে সোফায় শুয়ে পড়লাম। বন্দর ছাড়ার কাজের তদারকীর ভার ছিল ক্যাপ্টেনের উপর। কিন্তু কিছুতেই ঘুম এল না। এক কাপ গরম কফি খেয়ে শেষ বারের মতো সহরটাকে একবার চেয়ে দেখার জন্য পুপ-ডেকের মাথায় উঠলাম। দুবার এসে সহরটা আমার বড় ভাল লেগে গেছে। এই নীল সিন্ধুজল ধৌত বিরাট পাহাড়ের কাছে আরো কিছুক্ষণ থেকে যেতে ইচ্ছে করছে। ঢেউ আটকান বাঁধের সোজা রেখায় দ্বিধাবিভক্ত উপসাগরের নীল আয়নাটার এম্‌ফিথিয়েটরের মতো সাজান পারে সাদা সাদা বাড়ি। তার উপরে বড় বড় গাছের একটুকরো ঘন বন। আরো উঁচুতে শয়তানের চূড়া আর টেবিল পাহাড়ের ধূসর-নীল খাড়াপাথর। এই পাহাড় দুটোই যেন সারা এম্‌ফিথিয়েটরের বিরাট চাল। ডাইনে তীরের তীক্ষ্ণ বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেছে সী-পয়েণ্ট।

জোরে ঘণ্টা বেজে উঠল—"নোঙর তোল"। জাহাজ ভোঁ করে উঠল। চাকার আওয়াজ। তারপর শোনা গেল, "নোঙর ঠি-ক!" জাহাজটা ঘুরে গিয়ে গতিসঞ্চয় করতে লাগল।

সময় বয়ে চলল। ডেকের উপর চড়া রোদ। জাহাজ উত্তরের দিকে ঘুরল। কেপটাউনের পাহাড় তিনটের ছায়া ক্রমশ সমুদ্রের বুকে নেমে পড়ে ঢেউয়ের ভিতর মিলিয়ে গেল। ক্যাপ্টেনের পর আমার পাহারার পালা।

ব্রিজের উপর দাঁড়িয়ে আছি। কিছুক্ষণ পরেই ক্যাপ্টেন আকর্ণ বিস্তৃত হাসি হাসতে হাসতে আমার দিকে এগিয়ে এল। হাতে তার একটা কাগজ।

'এইমাত্র পেলাম। সহরে তুমি যতক্ষণ ছিলে তাতে মনে হচ্ছে এটা তোমারই।'

কিছুই বুঝতে না পেরে, রেডিওগ্রামটা নিলাম: "রুশ জাহাজের ক্যাপ্টেন। কালকের জন্য অত্যন্ত দুঃখিত, আবার দেখা হওয়া চাই, পরের বার যখন আসবেন তখন নিশ্চয়ই দেখা করবেন। এন।"

মেয়েটির সুন্দর মুখটি মনের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল। আবার জেগে উঠল সেই হারানর বেদনা। কিন্তু তাকে দমিয়ে দিয়ে বেশ ধীরস্থির শান্তভাবে রেডিওগ্রামটাকে ধীরে ধীরে ভাঁজ করলাম। কেপটাউনে যে আর বহুবছর আসা হবে না সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। হয়ত আর কখনই হবে না। এন'কে কোন জবাব দেবারও উপায় নেই, কারণ সে তার ঠিকানা জানাতে ভুলে গেছে। হাতটা তুলে আঙুলগুলো মেলে দিলাম। সমুদ্রের হাওয়া রেডিওগ্রামের কাগজটা ছিনিয়ে নিয়ে শূন্যে সেটাকে পাক দিতে দিতে একসময় জাহাজের পিছনের ফেনা ওঠা জলে ডুবিয়ে দিল।

চাঁদের পাহাড়
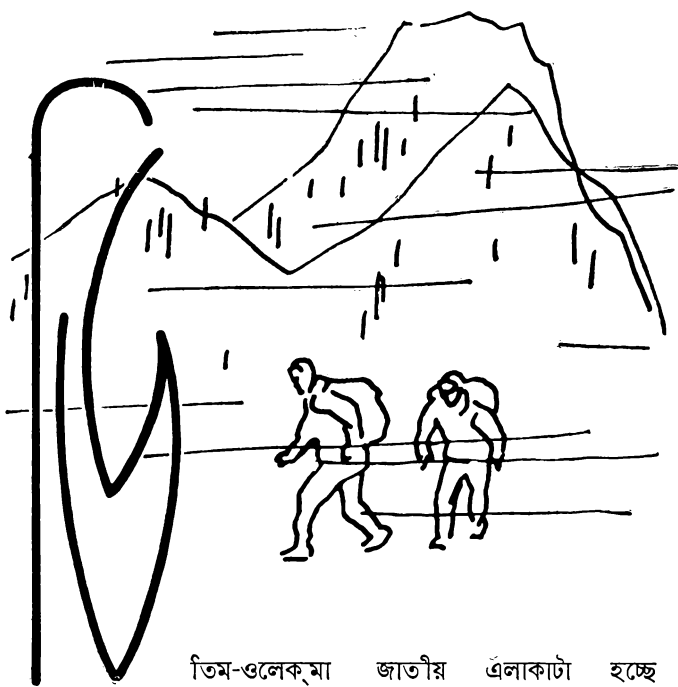
তিম-ওলেক্মা জাতীয় এলাকাটা হচ্ছে পূর্ব সাইবেরিয়ায়। দক্ষিণ ইয়াকুতিয়ার গায়ে লাগা এই বিরাট পাহাড়ে অঞ্চলটার উত্তরাংশ গায়ে গায়ে লাগান অজস্র পর্বতশ্রেণীতে ভরা। সাইবেরিয়ায় বোধহয় এর চেয়ে উঁচু পাহাড় আর নেই। দুর্গম বুনো জায়গাটা একেবারেই পাণ্ডববর্জিত। এই সেদিন পর্যন্ত জায়গাটা ছিল অনাবিষ্কৃত। পনের বছর

আগে আমিই প্রথম মানচিত্রের এই ফাঁকা জায়গাটায় পা দিই। "প্রথম" মানে আবিষ্কারকদের মধ্যে প্রথম। এদেশের আদিবাসী তুংগুস আর ইয়াকুৎরা আগেই শিকারের সন্ধানে এ অঞ্চলের চারিদিকে ঘুরে বেড়িয়েছে। তুংগুস শিকারীদের কাছ থেকে নানা মূল্যবান খবর পেয়েছি। দূর দূর প্রান্তের সন্ধান তারা আমায় দিয়েছে। নদী, নদীর উৎস আর পর্বতমালার ম্যাপ ভাল করে এঁকে দিয়েছে। এখানকার খুব ছোট ছোট নদীও আগেই নামকরণ হয়ে গেছে। যাযাবররা প্রধানত নদীতীরেই ঘুরে বেড়িয়েছে। পাহাড়ের বেলা কিন্তু তা ঘটেনি। বাস্তব বুদ্ধিসম্পন্ন তাইগার শিকারীরা কখনো তাদের চলাচলের পথ আর ছাউনীর জায়গার সঙ্গে সম্পর্কহীন অপ্রয়োজনীয় তথ্যের ভার স্মৃতির উপর চাপায় না। তার ফলে আমাকেই এই পাহাড়গুলোর — ওখানে যাকে বলে "গলেৎস" — নামকরণ করতে হয়েছে।

১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসে আমি তখন তক্কো নদীর তীরে। ইয়াকুতিয়া ছেড়ে তক্কোর তীর ধরে ভিতিম-ওলেক্‌মা জাতীয় এলাকায় যাব বলে প্রস্তুত হচ্ছি। আমার বিরাট অভিযাত্রী দলের অল্প কয়েকজনকে কেবল সঙ্গে রেখেছি। বাকি সবাইকে আল্‌দান আর লেনা নদীর দিকে পাঠিয়ে দিয়ে আবিষ্কারের ক্ষেত্রটাকে অনেক ছড়িয়ে দিয়েছি।

ভীষণ শীত। আমাদের রসদও কম। কিন্তু তবু এই সময়েই পাহাড় পেরব বলে ঠিক করেছি। কারণ শীতকালে দুরন্ত নদী জমে যায় বলে ভীষণ গিরিবর্ত্মগুলো সহজেই বল্‌গা-হরিণের স্লেজে চড়ে পার হওয়া যায়।

আমার সঙ্গে যে তিনজন রয়েছে তারা প্রত্যেকেই নিজের নিজের কাজের জন্য অপরিহার্য। একজন হচ্ছে গাবিশেভ। লোকটি ইয়াকুৎ। আমাদের পথপ্রদর্শক আর বল্‌গা-হরিণগুলোর মালিক। আরেকজন হচ্ছে আলেক্সান্দ্রভ, ভূবিজ্ঞানী। আর আছে আলেক্সেই। সে হচ্ছে একাধারে সব: রাঁধুনে, স্বর্ণসন্ধানী আর শিকারী। তিনজনেই ঝানু তাইগা পর্যটক। সাইবেরিয়ার দুর্গমতম জায়গায় এরা আমার সঙ্গে ঘুরেছে।

যাত্রারম্ভের পর প্রায় ন'মাস কেটে গেছে। এখনও একটা দুর্গম পথ পার হতে হবে। সাতটা স্লেজ আর চারটে বাড়তি বল্‌গা-হরিণের ক্যারাভানটা তক্কো উপত্যকার বিস্তীর্ণ অঞ্চলের ভিতর দিয়ে বেশ দ্রুতগতিতেই এগিয়ে চলেছে, বরফ-জমা নদীর তীর ধরে। কিছু পরেই নদীর দুমড়োন মোচড়ান

আঁকাবাঁকা গতি (তুংগুস ভাষায় “তক্কোরিকান” কথাটার মানেও তাই) বদলে গেল। নিজের নামটাকে অর্থহীন করে দিয়ে নদীটা সোজা খাতে বয়ে চলল। দিনের পর দিন মানচিত্রের গায়ে নতুন নতুন অংশ সংযোজিত হতে লাগল। বহুদিন ধরে প্রাণপণ খেটে আঁকা হয়েছে দক্ষিণে নদীর উৎসের দিকে এগিয়ে যাওয়া এই দীর্ঘ আর বিস্তৃত উপত্যকার মানচিত্র। হরিণের পায়ের খুটখাট আর স্লেজের একটানা আওয়াজে এ অঞ্চলের অসীম নিস্তব্ধতা ভেঙে দিয়ে আমরা প্রতিদিন এগিয়ে চলেছি সামনের কালো পাহাড়গুলোর দিকে। ঢেউয়ের মতো পাহাড়গুলো দাঁড়িয়ে আছে নিচু ঢিবির পেছনে। ঢিবিগুলো “সপ্‌কা” নামে পরিচিত।

লেনা মালভূমির দক্ষিণাঞ্চলে পেঁছিলাম। একঘেয়ে ফাঁকা জায়গা। মালভূমিটা নিচু। চারদিকে সারি সারি বন্ধুর সপ্‌কা সবকটাই প্রায় সমান উঁচু ফারগাছের কালো রেখায় ভরা। দিন এখন ছোট। তাই দিন থাকতে থাকতেই যত তাড়াতাড়ি পারা যায় এগিয়ে চলেছি।

২১শে ডিসেম্বর সপ্‌কার বদলে দেখা দিল দীর্ঘকায়, ছুঁচলো মাথা ঢিবি। লালচে-ধূসর গাছগাছড়ায় ভরা। ঘন রঙের ফার আর দেবদারুর গায়ে তারা পরিষ্কার ফুটে উঠেছে। তার মানে চূণাপাথরের ক্লান্তিকর মালভূমি ছেড়ে আমরা গ্র্যানাইট আর নীস অঞ্চলের কাছাকাছি এসে গেছি। এ অঞ্চলের প্রাচীন মাটি ভূত্বকের সাম্প্রতিক নড়াচড়ার ফলে এখানে উঁচু উঁচু ঢিবির সৃষ্টি করেছে। এ কথা আরো বোঝা গেল আমাদের ভূবিজ্ঞানীকে খাড়া হয়ে বসতে দেখে। এতক্ষণ সে গলায় টোপোগ্রাফিক প্লেনটেবলটা ঝুলিয়ে ‘ভ’ মুখ করে বসেছিল।

মেঘের ঘন পর্দাটা দক্ষিণে সরে গেছে। পাহাড়ে অঞ্চলের প্রবেশপথের কাছে তারা আড়ভাবে ঝুলে আছে। শীত এখানে আরো তীব্র। স্লেজের আওয়াজ হয়ে উঠেছে আরো জোর আর চড়া। বল্‌গা-হরিণগুলোর দ্রুত নিঃশ্বাসের ফলে ক্যারাভানটার উপর দিয়ে ভেসে চলেছে ধোঁয়ার মেঘ। বড় স্লেজটায় আমি বেশ আরাম করে মালের উপর বাঁ পাটা মুড়ে বসে আছি। ডান পাটা ঝুলে আছে। কখনো ব্রেক কখনো বা হালের কাজ করছে। থেকে থেকেই লাগামটা হাত বদল করছি আর পায়ের আঙুলগুলো নেড়ে চেড়ে দেখছি। তুষার কামড়ের কোন উপসর্গ দেখা দিল কিনা সে বিষয়ে আমি খুবই সতর্ক।

এতটুকু উপসর্গ দেখা দিলেই স্লেজ থেকে লাফিয়ে পড়ে পাশে পাশে দৌড়তে সুরু করব। মাখন সব আগেই শেষ হয়ে গেছে। তার ফলে শীত সওয়ার ক্ষমতাও আমাদের কমে গেছে।

সামনের ধূসর মেঘ লালচে হয়ে এল। তুষারপ্রান্তরের গহ্বরগুলো ঢেকে গেল ফিকে নীল ছায়ায়। নদীর একটা বাঁকের ওপারে দেখা যাচ্ছে একটা মস্তবড়, খাড়া গলেৎস। সেটাকে বেড় দিয়ে এগতে দেখতে পেলাম উপত্যকাটা একটা লম্বা সপ্‌কার ফলে দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে। সপ্‌কার ধারগুলো খাঁজ কাটা। বুঝতে পারলাম এখানে এসেই তক্কোর সঙ্গে মিশেছে তার বড় উপনদী চিরোদা। আরো এগিয়ে তক্কো উপত্যকা সরু হয়ে এসে একটা গিরিবর্মে পড়েছে। গিরিবর্ত্মটা দক্ষিণ-পশ্চিমে বেঁকে গেছে চারা নদীর উৎসের দিকে। ঐখানে দুটো বড় পাহাড়ের মাঝখানের বিরাট খাদে একটা ছোট্ট বসতি আছে। সে বসতিতে রয়েছে একটা কেনাবেচার আড়ৎ আর একটা বেতার কেন্দ্র। ঐ বসতিতে গিয়ে আমাদের রসদ নিতে হবে।

সূর্যাস্তের পর রাতের আস্তানার জন্য থামলাম। আমরা একসঙ্গে অনেক দিন থেকেই ঘুরছি। তাই সব কাজই বেশ চটপট সেরে ফেলি, যেন বহুবছর ধরে একসঙ্গে কাজ করার তালিম-পাওয়া অভিনয়ের দল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। আমরাও খুঁটি বেঁধে বরফ পরিষ্কার করে তাঁবু খাটিয়ে ফেললাম। কাঠ কাটা হয়ে গেল। আলেক্সেই চুল্লী ধরিয়ে রান্না চড়িয়ে দিল। তাঁবুর মুখের কাছে চুল্লীর চিমনি থেকে ক্ষীণ শিখা উঠেছে। বাইরে বরফের গায়ে কালো ছোপের মতো পড়ে আছে স্লেজ। শেষবার তাদের পরীক্ষা করে আমরা সবাই লাল গনগনে চুল্লীটা পার হয়ে তাঁবুর ভিতর ঢুকলাম। সারাদিন বাইরের ভীষণ শীতে ঘোরাঘুরির পর গরমে আরাম করার মতো আনন্দের আর কী আছে? কিন্তু প্রথমে গলার বরফে ভরা মাফলারটা খুলতে হবে, তারপর টুপিটা। হরিণের চামড়াটা পাততে হবে বরফ-ঢাকা মাটিতে বিছনো গাছের ডালপালার উপর। মুখ খুলতে হবে শোবার থলেটার। তারপর মোটা জামা কাপড়গুলো খুলে বেশ বড় করে একটা সিগারেট পাকান যেতে পারে, সারা শরীর দিয়ে অনুভব করা যেতে পারে আগুনের উত্তাপ।

তাঁবুর ভিতরে আমরা পা মুড়ে বসে আছি সিদ্ধ মাংসের আশায় আর খেয়ে চলেছি গেলাসের পর গেলাস গরম ধোঁয়া-ওঠা চা। ভীষণ ঠাণ্ডায়

গরমের মতোই শরীর টেনে যায়। দিনের বেলা আমরা স্বভাবতই জল বা চা কিছুই খাইনি। সন্ধ্যাবেলা তাই তেষ্টা আর কিছুতেই মিটতে চায় না। চুল্লীর কাঁপা গোলাপী আলো আর চমৎকার উত্তাপে ঠাণ্ডায় জমে-যাওয়া কঠোর মুখ ধাতস্থ হয়ে এল। কড়া ভাঁজগুলোও এল নরম হয়ে।

জ্বালানী কাঠ শেষ হয়ে যেতেই কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া তাঁবুর ভিতরে ঢুকতে লাগল। তুলোর জামা আর ফারের মোজা আবার চড়িয়ে শোবার থলেতে ঢুকতে হল। সব ফুটোফাটাগুলো আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধ করে দিলাম। চুল্লীর নিভে-আসা আগুনটা হিমশীতল নিস্তব্ধতার মধ্যে চমকে চমকে উঠতে লাগল। তাতে কখনো ফুটে উঠল শুকবার জন্য উপরে ঝোলান স্নোবুট, দস্তানা, মাফলার, কখনো বা সকালের জন্য জমা-করা জ্বালানী কাঠ নয়ত আমাদের গাড়ির থলেগুলো। অবশেষে আগুনটা নিভে গেল। ঝিমতে ঝিমতে শুনতে পেলাম বাইরের জগতের আওয়াজ: দূরে ধসে-পড়া বরফের শব্দ, ঠাণ্ডায় গাছ ফেটে যাচ্ছে, বল্গা-হরিণগুলো নিজেদের গরম রাখার জন্য লাফালাফি করছে।

পরের দিন ছিল দক্ষিণ-অয়নান্ত। শান্ত আবহাওয়া। কিন্তু ঠাণ্ডা আরো মারাত্মক। বিবর্ণ আকাশটা অনেক উঁচুতে উঠে গেছে, আগের চেয়ে অনেক পরিষ্কার। সকালের স্তব্ধ আবহাওয়ায় আমাদের মুখের হাওয়া বাইরে বেরনমাত্র বরফ কুচিতে জমে যাচ্ছে। সেই বরফকুচির ঘর্ষণের ফলে এক রকম অদ্ভুত খসখস আওয়াজ উঠছে। ইয়াকুৎরা এই মর্মরধ্বনিকে বলে "তারাদের ফিসফিস"। ঠাণ্ডা যখন শূন্যের নিচে ৪৫° সেণ্টিগ্রেড তখনই এই শব্দ শোনা যায়। রাত্রে বাইরে রাখা থার্মোমিটারটাকে খালি হাতে ধরতেই আলেক্সান্দ্রভ চমকে চেঁচিয়ে উঠল। থার্মোমিটারের কাচটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে গেল। জমে-যাওয়া গোল পারাটা লেগে রইল আলেক্সান্দ্রভের আঙুলে। স্লেজের থলের ভিতর থেকে এলকোহল ভরা থার্মোমিটারটা বের করা হল। কিছুক্ষণ পরেই থার্মোমিটারের এলকোহল এসে পৌঁছল একটা ভয়াবহ সংখ্যায় ৫৭° সেণ্টিগ্রেড।

জ্বালানী সংগ্রহ করে চা খেয়ে সবাই গরম হয়ে নিলাম। তারপর সুরু হল কাজকর্ম। ভূবিজ্ঞানী তার স্লেজ নিয়ে চলে গেল চিরোদায়। পথপ্রদর্শক সুরু করল হরিণের তদারকী, আলেক্সেই বেরিয়ে পড়ল সোনার সন্ধানে।

আমি ঠিক করলাম কাছের একটা গলেৎসে উঠে জায়গাটা দেখে নিয়ে ম্যাপে এঁকে রাখব।

একটা সহজগোছের চড়াই বেছে নিয়ে গলেৎসে উঠতে সুরু করলাম। পরিষ্কার, কুড়মুড়ে বরফের উপর জুতোর মসৃণ সুকতলা পিছলে যায়। গাছের গুঁড়ি ধরে কোনরকমে নিজেকে সামলে রাখি। হিমের জন্য ভাল করে নিশ্বাস নেওয়া যাচ্ছে না। তার ফলে গলেৎসে ওঠা আরো কঠিন হয়ে উঠেছে। আমার মুখ ঘিরে ফার টুপির গায়ে জমে-ওঠা ঘামের বড় বড় ফোঁটা। তা সত্ত্বেও একটা গলেৎসের ছোট্ট চ্যাপ্টা মাথায় উঠলাম। সেখানে শ্যাওলা-ঢাকা দুটো বড় গ্র্যানাইট পাথর, বাতাসের আঘাতে চকচকে পালিশ করা। তার একটায় উঠে চারদিকটা চেয়ে দেখলাম।

আমাদের ফাঁকা তাঁবুটা বেঁটে বেঁটে গাছের আড়ালে আধখানা লুকিয়ে আছে। খুব ছোট্ট দেখাচ্ছে, বিরাট বিরাট পাথরের মাঝখানে প্রায় হারিয়েই গেছে। পিছনে গলেৎসটা খাড়া নেমে গেছে। তার নিচে যেন বিছনো রয়েছে রোঁয়া-ওঠা গালিচা, তাতে ঘনসবুজ আর তুষারশুভ্র আলপনার নক্সা। বাঁয়ে একটা খাড়া সপ্‌কার পিছনে চিরোদার জমে-ওঠা জলের সাদা রেখা। ডাইনেও ঐ একই রকমের সাদা রেখা — তক্কো নদী। প্রায় ত্রিশ মাইল দক্ষিণে, রোদে-ভরা নীল দূরত্বে, রুপোলি কুয়াশায় ঢাকা উদোকান পাহাড়। পাহাড়টার একপাশ হঠাৎ পুবমুখে ওলেক্‌মার দিকে বেঁকে গেছে। বাঁকের কাছে বিরাট বিরাট গলেৎসের সার। ও অঞ্চলে ওর চেয়ে উঁচু গলেৎস আর দেখিনি। একেবারে কাছের গলেৎসটার দিকে তাকিয়ে দেখলাম — বিরাট একটা স্তম্ভ, মিনারেটের মতো মাথাটায় তিনটে বড় বড় দাঁত।

বহুকষ্টে চারপাশের জায়গাটার একটা ছবি এঁকে নিলাম। কমপাসের মাপও টুকে রাখলাম। কিন্তু ঠাণ্ডায় জমে-যাওয়া হাতে পেন্সিল ধরা অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার।

চারদিকের ঘন গভীর নিস্তব্ধতায় বাতাসের এতটুকু স্পন্দন নেই। মাথার উপরে অনেক উঁচুতে নির্মল নীল আকাশ। গভীর নিস্তব্ধ। হিমশীতল নিষ্ঠুর জগৎ। পাথরের মতো মূক। গরমের দেশের জন্য মনটা আকুল হয়ে উঠল।

ছেলেবেলা থেকেই আমি আফ্রিকার স্বপ্ন দেখে এসেছি। ভ্রমণকাহিনী আর এড্‌ভেঞ্চারের বই পড়ে এই অনাবিষ্কৃত "অন্ধকার মহাদেশ" আর তার

রহস্যের প্রতি গভীর আকর্ষণ অনুভব করেছি। স্বপ্ন দেখেছি তার রোদে-ধোওয়া প্রান্তরের বুকে নিঃসঙ্গ গগনচুম্বী গাছ, বিরাট বিরাট হ্রদ, কেনিয়ার ভীষণ বন, দক্ষিণের উঁচু দেশের শুকনো পোড়া জমি। পরে ভূগোল আর প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আফ্রিকাকে দেখেছি আরেক চোখে। জেনেছি ওদেশ থেকেই মানুষ উত্তরের দিকে ছড়িয়ে পড়েছে, সেই সঙ্গে তার অনেক জীবজন্তুও। আফ্রিকা সম্বন্ধে আমার ছেলেমানুষী স্বপ্ন — উদার বিস্তৃত উচ্চভূমির সর্বজয়ী প্রাণ, বড় বড় নদী আর দুপাশে দুই মহাসমুদ্রের বাতাস-ধোওয়া তটরেখা — একটা দৃঢ় ভিৎ পেয়েছে আমার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসায়।

"অন্ধকার মহাদেশ" আবিষ্কারের স্বপ্ন আমার সফল হয়নি। আমার দেশের উত্তরাঞ্চল আফ্রিকার মতোই বিরাট। তার মানচিত্রেও রয়েছে অনেক ফাঁকা জায়গা। তাই আমি সাইবেরিয়া আবিষ্কারক হয়েছি। ক্রমশ উত্তরের জনমানবহীন, অনন্ত শূন্যতাকে ভালবেসে ফেলেছি। কিন্তু মাঝে মাঝে যখন তার শীত শরীর আর সইতে পারে না, কঠোর নিষ্ঠুর প্রকৃতিতে মন অবসন্ন হয়ে পড়ে তখন মনে পড়ে আফ্রিকার কথা। স্বপ্নে দেখি সেই রোমাঞ্চকর মন কেড়ে-নেওয়া দেশ আমার কাছে যার দ্বার রুদ্ধ।

ভীষণ ঠাণ্ডা আবার আমায় বাস্তবে ফিরিয়ে আনল। নিচে নেমে তাঁবুর দিকে এগতে লাগলাম। সূর্য তখন পাহাড়ের আড়ালে ডুব মেরেছে, কিন্তু আমার বন্ধুরা কেউ ফেরেনি। আগুন ধরিয়ে জমে-যাওয়া চায়ের কেটলিটা চড়িয়ে দিলাম। তারপর হরিণের চামড়ার উপর বসে পড়লাম, তাঁবুটা যথেষ্ট গরম হলে পর জামাকাপড় ছাড়ব।

পরের দুটো দিন, ২৩শে আর ২৪শে ডিসেম্বর, খুব কষ্টে কাটল। তক্কো উপত্যকাটা যেন কুঁকড়ে গিয়ে কাঁধ তোলা বড় বড় পাহাড়ে ঘেরা খাদের আকার নিল। গিরিবর্ত্মের ভীষণ হাওয়া প্রবল গর্জন তুলে বরফের গা থেকে তুষারকণা উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। নদীর ছোট ছোট জলপ্রপাত আর খরস্রোতের অনুকৃতি ধরা পড়ে গেছে জমাট বরফে। একেক জায়গায় বরফভেদ করে উঠে গেছে পাথরের তীক্ষ্ন দাঁত। বরফ ভাঙার দূর গর্জন আর চাপা গোঙানি প্রতিধ্বনিত হচ্ছে গিরিবর্ত্মে।

পদে পদে পিছলে গিয়ে সাবধানে চলা যেমন অদ্ভুত তেমনি ভয়াবহ। পায়ের নিচেই ফুটখানেক ঘন স্বচ্ছ বরফের চাপের তল দিয়ে দেখা যাচ্ছে প্রবল

বেগে ছুটে চলেছে নদী উজ্জ্বল শ্যামল জলধারায়। বেগে ফেনা ছিটিয়ে অথচ এতটুকু শব্দ নেই। সেটাই আরো ভয়াবহ ব্যাপার। যেন হিমশীতল সন্ধ্যা গিরিবর্ত্মের উপর হানা দিয়ে জলধারার গলা চেপে ধরেছে।

খালি বরফের বুকের উপর দিয়ে স্লেজ চালিয়ে যাওয়া এক পিঠ ভাঙা ব্যাপার। বরফের শক্ত মসৃণ বুকে হরিণগুলো অসহায়, প্রাণপণে তারা এগতে চায়, কিন্তু প্রতি পদেই পা ফসকে গিয়ে পড়ে যায়।

গিরিবর্ত্মের গহ্বর থেকে একটা চাপা আওয়াজ শোনা গেল। ক্রমশ সে আওয়াজ বেড়ে উঠে পরিণত হল গর্জনে। অত্যন্ত দুরন্ত কোন জলস্রোতের দিকে আমরা এগিয়ে চলেছি। শূন্যের নিচে পঞ্চাশ ডিগ্রী ঠাণ্ডাতেও পাগলা ঝোরাটা পোষ মানেনি। কালো-ধূসর স্লেটের গিরিবর্ত্মের খাড়া দেয়ালের প্রায় আধাআধি উঁচুতে উঠে গেছে সাদা কুয়াশা। সাদা বরফের গায়ে জলের কালো রেখা। বাঁকা ঢেউ তুলে জল প্রায় ফুট দশেক উঁচুতে উঠেছে। তারপর নিচে নেমে পাথরের গায়ে আছড়ে পড়ে ফেনা আর জল ছিটিয়ে সগর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ডান তীরে। সেখানে বিরাট বিরাট পাথর ঝুঁকে পড়েছে জলের স্রোত কাটা কালো গহ্বরের উপর। বাঁ তীরটাও খাড়া। মসৃণ জমাট বরফর বিরাট খণ্ড সেখান থেকে নেমে মিশে গেছে জলস্রোতে। সেটা পার হয়েই আমাদের যেতে হবে। সংকীর্ণ বিপজ্জনক পথ, কিন্তু ওছাড়া আর কোনও পথ নেই।

সবার সামনে ছিল ভূবিজ্ঞানী। ভুরু কুঁচকে, হরিণের বল্‌গা টেনে ধরে রেখে ধীরে ধীরে সে এগল। তারপর আমার পালা। দুটো হরিণের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি আলেক্সান্দ্রভকে দেখছি, হরিণরা তখন এগবার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আলেক্সান্দ্রভকে সাহায্য করার আমার উপায় নেই, কারণ নিজের হরিণটাকে সামলাতে হবে। গোড়ায় দেয়ালের কাছে যেতে পারার উপর অনেক কিছু নির্ভর করবে। ভূবিজ্ঞানীর হরিণ যতই এগয় ততই পা পিছলে জমাট বরফের ধারে চলে আসে, একেবারে ফেনার ধোঁয়া-ওঠা দুরন্ত জলের কাছে। হরিণদুটো পড়ে যায়, আবার ওঠে। মাত্র এক গজ দূরেই মৃত্যু, আধ গজ দূরে... বাঁদিকের হরিণটা পা পিছলে পড়লেই হয়ে গেল। কিন্তু পড়ল না, ঠিকই রইল। একমিনিট পরেই চেঁচিয়ে আলেক্সান্দ্রভকে অভিনন্দন জানালাম, কিন্তু জলের শব্দে কিছুই শোনা গেল না।

আমার হরিণটা নাক দিয়ে আমার পিছনে খোঁচা মারতে মারতে অধীরভাবে শিং নাড়তে লাগল। বাঁদিক থেকে হরিণটাকে গিরিবর্ত্মের পাথরের দিকে ঠেলে রেখে এগতে লাগলাম। তার ফলে জলটা কিছু দূরে রইল। গাবিশেভ আর আলেক্সেই আমায় অনুসরণ করল। কিছু পরেই মালের স্লেজটাকে আমরা ধরে ফেললাম।

সন্ধ্যার আগে আরো একটি ঝোরা পার হতে হল। রাত্রে তার গর্জনই আমাদের ঘুম পাড়াল।

পরদিন সকালে মাইল দুয়েক চলার পর একটা বাঁক ফিরতেই ভীষণ হাওয়ার মুখে পড়লাম। মারাত্মক বরফের কুচির হাত থেকে আশ্রয় নেবার মতো কোন জায়গা নেই। চোখা পর্যন্ত মুখ ঢেকে কুঁজো হয়ে আমরা এগতে লাগলাম। হরিণগুলোও প্রায় বরফে মুখ ঠেকিয়ে হাঁটতে লাগল। শূন্যের নিচে ষাট ডিগ্রী ঠাণ্ডার সঙ্গে জোর হাওয়া মানুষের সহ্যের অতীত। কয়েক মিনিট পরেই মনে হল আমার শরীরের সামনের দিকটা যেন একেবারেই অবশ হয়ে গেছে। যতক্ষণ না সামনের দিকটা একটু গরম হল ততক্ষণ পর্যন্ত হাওয়ার দিকে পিছন ফিরে চললাম। হাওয়ার গর্জনে অন্য সব শব্দ ডুবে গেল...

সন্ধ্যার দিকে ভীষণ গিরিবর্ত্মটা পার হয়ে ধুঁকতে ধুঁকতে এসে পড়লাম একটা চওড়া খাদে—চ্যাপ্টা পেট একটা গহ্বর, প্রায় চারপাশেই খাঁজ-কাটা পাহাড়। সামনে সন্ধ্যার অন্ধকারে জ্বলছে কালো বনের ঘের-দেওয়া বরফ-ঢাকা সমান মাঠ। গিরিবর্ত্মের গর্জনের পর এই দৃশ্য শান্ত। গহ্বরটা আমরাই প্রথম আবিষ্কার করলাম। নাম রাখা হল "উত্তর তক্কো খাদ"। গভীর হিমবাহ পার হয়ে বনের ধারে এসে পেঁছলাম। ফুরল আরেকটা একঘেয়ে ঘটনা বিরল দিন।

পথপ্রদর্শক ভোর না হতেই আমাদের তুলে দিল। ভোরের নীল কুয়াশা দেখে বোঝা গেল আবহাওয়া শান্ত থাকবে। গিরিদ্বার বেয়ে উঠতে সুরু করলাম — বরফ-ঢাকা গলেৎসের দু'মাথার মাঝখানে উঠতে হবে। পালা করে আমরা একেকজন সামনে পথ দেখিয়ে চললাম। কেবল জাম্‌পার পরে শী দিয়ে আমরা স্লেজের পথ কেটে কেটে চললাম। সামনের লোকটির মাথার কাছে বাষ্প জমে উঠেছে, পিঠ তার হিমে ভরা। বহুকষ্টে গিরিদ্বার পেরলাম। ক্লান্ত হরিণগুলো সঙ্গে সঙ্গেই মাটিতে বসে পড়ে বরফ চাটতে লাগল। সিগারেট

খেয়ে নিয়ে আমরা আবার স্লেজে চড়ে পাহাড়ের চওড়া গা বেয়ে নিচের ঢালু সমতলের দিকে নামতে লাগলাম। বেশ কয়েক মাইল চওড়া সমতলটা চারার উপনদী তারিন্নাখের দিকে এগিয়ে গেছে।

এমন সময় আমাদের ডানদিকে দুটো কালো ফোঁটা দেখা দিল। গাবিশেভ তখন ছিল সামনে। ছুটে-চলা হরিণটাকে সে টেনে ধরল। আমি তাড়াতাড়ি তেরপলের তল থেকে বন্দুকটা বের করে নিলাম। খয়েরী ফোঁটাদুটো তখন একজোড়া অপূর্ব কস্তুরীমৃগয় পরিণত হয়েছে। বন্দুকের বোল্ট্‌টা পিছনে ঘুরিয়ে দিলাম—খারাপ রাস্তায় আমি কখনো বন্দুক গুলি ভরা অবস্থায় রাখি না। হরিণদুটো চমকে উঠল। তাদের উৎসুক কালো চোখদুটি আমাদের প্রতিটি ভঙ্গী লক্ষ্য করে চলেছে, সরু সরু টান টান পাদুটো মুহূর্তের মধ্যে বিপদের এলাকা ছেড়ে সরে পড়তে প্রস্তুত। লকটা যত জোরেই টিপে ধরি গুলির প্রান্তের বেশি আর কিছুতেই যায় না। সযত্নে তেলটা মুছে ফেললাম। কিন্তু ঘন হিমে বন্দুকের অবস্থা কাহিল। গুলি করার খুবই চেষ্টা করলাম — হরিণগুলো দৌড়ে গাছের আড়ালে চলে গেল।

ক্যারাভ্যান আবার গাছেভরা ঢালু বেয়ে নামতে লাগল।

'তোখতো!' (থাম!)

হঠাৎ চীৎকারে প্রায় লাফিয়েই উঠলাম। পথপ্রদর্শকের স্লেজটা ততক্ষণে বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেছে। একমুহূর্ত না ভেবে আমি স্লেজ থেকে লাফিয়ে পড়ে গাড়িটাকে থামাবার জন্য তার পিছনটা চেপে ধরলাম। গাড়ি তখন ভীষণ জোর ছুটছে; হরিণটা টান মেরে লাফিয়ে উঠল, আমি শূন্যে উঠে প্রাণভয়ে স্লেজটাকে চেপে ধরে রইলাম। পর মুহূর্তেই হরিণটা আমার হাত মাড়িয়ে দিল। পরে দেখলাম গাবিশেভের পাশে শুয়ে আছি।

'তোখতো!' আবার চীৎকার শোনা গেল।

আলেক্সান্দ্রভের স্লেজদুটোও বাঁক পেরিয়ে তীরবেগে ছুটে এল। কিছুক্ষণ পরেই হরিণ মানুষ স্লেজ সব একসঙ্গে জড়াজড়ি হয়ে আমরা ঢালু বেয়ে গড়াতে লাগলাম নিচের দিকে।

এরপর আর অসাধারণ তেমন কিছু ঘটল না — কেবল ঢালুটা হয়ে উঠল আরো খাড়া।

সবাই গড়িয়ে নিচে পড়লাম। আমি তো বরফের উপর এত জোর পড়লাম যে দম বেরিয়ে যাবার জোগাড়। আলেক্সেইকে এবার ঢালুর মাথায় দেখা গেল, সে বহু পিছনে পড়েছিল। নিচে আমাদের চিৎপাৎ অবস্থা দেখে সে ঘাবড়ে গিয়ে স্লেজ থেকে লাফিয়ে না পড়ে স্লেজটাকে জোরে জড়িয়ে ধরল। তার হরিণটা এক প্রচণ্ড লাফ মারল। ঢালুটার ঠিক পায়ের কাছেই পড়েছিল আলেক্সান্দ্রভ। আলেক্সেই'এর স্লেজটা তার মাথার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে বরফের উপর পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। ভয়ে আর বিস্ময়ে আলেক্সেই তার মালপত্রের উপর বসে চোখ পিটপিট করতে লাগল। হরিণটা স্লেজ খুলে বেরিয়ে গিয়ে আরো দুচারবার লাফালাফি করে শান্ত হয়ে দাঁড়াল।

দেখা গেল হরিণ আর মালপত্র সব অক্ষতই রয়েছে। প্রাণ খুলে একবার হেসে নিয়ে ঠিক করলাম যেখানে হরিণদের চরার জায়গা পাওয়া যাবে সেখানেই রাত্রের জন্য আস্তানা গাড়ব। কিছু পরেই পেঁৗছলাম তারিন্নাখের দিকে একটা দীর্ঘ, বিস্তৃত ঢালু মাঠের মাথায়। সেখানেই ছাড়া ছাড়া গাছের আড়ালে তাঁবু ফেলা হল। অনেক কাল আগে জায়গাটা দাবাগ্নিতে পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছিল। এখন আবার নতুন বার্চ আর লার্চ গজিয়েছে। বুড়ো গাছগুলোর ডালপালা বাকল কিছুই নেই। জ্বালানী কাঠ হিসেবে তারা খুবই ভাল। অনেক কাঠ কেটে আগুন ধরান হল, স্লেজগুলো মেরামতের জন্য খুঁটি তৈরী করা হল।

আলেক্সান্দ্রভ আর আলেক্সেই কাছের ঝর্ণাটায় গিয়ে সোনার সন্ধান সুরু করল। গাবিশেভ আর আমি লেগে গেলাম স্লেজ মেরামতের কাজে।

অন্ধকার হয়ে এল। খাবারদাবার চা শেষ করে বসে আছি তবু সঙ্গীদের দেখা নেই। খোঁজে বেরলাম। দিনের বেলার কুয়াশা কেটে গেছে। চাপা আলোয় পাহাড়ের অনেক উপরে দাঁড়িয়ে আছে চাঁদ। একটু পরেই দেখতে পেলাম দুটো কালো ছায়া আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

'ওখানে সোনা আছে বলেই মনে হচ্ছে। আলেক্সেই তুমি কী বল?' বলল ভূবিজ্ঞানী আলেক্সান্দ্রভ।

'আমারও তো তাই মনে হয়,' আলেক্সেই সায় দিল।

আমরা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে মন্ত্রমুগ্ধের মতো কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে

রইলাম। হিমেভরা চাঁদনী রাত তখন পৃথিবীকে রুপোলি আলোয় ভরে দিয়েছে।

'ওগুলো তো আপনার সেই ভয়ানক গলেৎস তাই না, গেওর্গি পেত্রভিচ?' তারিন্নাখ উপত্যকাটা দেখিয়ে আলেক্সান্দ্রভ বলল। উপত্যকার বাঁদিকে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে খাঁজ-কাটা পাহাড়চুড়োর রেখা। রুপোলি নীল রং। পাহাড়ের পাদদেশ কিন্তু অন্ধকারে ঢাকা। শীতল চাঁদের আলোয় পাহাড়টা আরো খাড়া দেখাচ্ছে। সে আলো বাড়িয়ে তুলেছে মাঝখানের দূরত্ব। বিরাট রুপোলি একটা করাত যেন আকাশ থেকে ঝুলে আছে। পূর্ব পরিচিত উঁচু মিনারের মতো তেমাথা গলেৎস একটু আলাদা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাথা যেন প্রায় চাঁদে ঠেকেছে। তার দক্ষিণ দিকের বরফ-ঢাকা ঢালু পাথুরে গায়ে পড়েছে চাঁদের আলো।

'গেওর্গি পেত্রভিচ, ঐ গলেৎসটার একটা ভাল নাম দিতে পারি। "চাঁদের পাহাড়"। দাঁতগুলো দেখুন—যেন চাঁদের গায়ে কামড় বসাতে চলেছে।'

'মন্দ নয় নামটা,' কমপাসের মাপ আরেক দফা দেখে নিয়ে আমি বললাম। দূরত্ব জানা গেল। ম্যাপের গায়ে এবার ঠিকমত পাহাড়টাকে বসান যাবে...

পরদিন দুপুরের আগেই স্লেজ মেরামত হয়ে গেল। তাঁবুর ভিতর শুয়ে জিরতে জিরতে আমরা আমাদের যাত্রাপথ ঠিক করতে লাগলাম। হিসেব করে দেখা গেল চারায় পোঁছতে লাগবে তিনদিন। বসতিতে পোঁছতে আরো দুদিন। পাঁচদিন পরেই আড়তে গিয়ে জামাকাপড় ছেড়ে ঘুমব, পেট ভরে খাওয়া দাওয়া করব।

বাইরের একটা শব্দে বসতিতে গিয়ে বিশ্রামের স্বপ্নে হঠাৎ ছেদ পড়ল। বল্‌গা-হরিণের পায়ের শব্দ, স্লেজের আওয়াজ, মানুষের স্বর। কুয়াশায় ঢাকা, জনশূন্য তাইগার পর হঠাৎ মানুষের আগমন অলৌকিক ঘটনাই বলতে হবে। আমার সঙ্গীরা সবাই টুপি পরতে পরতে ছুটে বেরিয়ে গেল। আমি বসেই রইলাম, তাইগার সর্দারদের সেটাই রেওয়াজ।

কিছুক্ষণ পরেই একজন অচেনা লোক তাঁবুর ভিতর ঢুকল, তার পিছনে আমার সঙ্গীরা। চুল্লীর কাছে পা মুড়ে বসল লোকটি। তারপর উদ্ধত ভঙ্গীতে মাথা তুলে বুক চাপড়ে জোর গলায় বলল:

'ও-খো! উলাখান তইয়োন!' (বড় সর্দার!)

স্থির চোখে তার দিকে চেয়ে থাকতে লোকটি অস্বস্তি বোধ করল। চোখ নামিয়ে সে তার পাইপটা নিয়ে নাড়াচাড়া সুরু করে দিল। বুড়ো লোক। বেশ লম্বা আর খুবই রোগা। শিকারী বাজের মতো বড় বড় গোল চোখ। বাঁকা নাক, গালদুটো ভাঙা, ছোট্ট একটুখানি ছুঁচলো দাড়ি। লোকটিকে দেখেই মনে পড়ে গেল ডন্ কুইক্সোটের কথা।

তামাকের থলেটা বুড়োর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে আলেক্সেইকে চোখের ইশারায় বললাম নতুন করে চা বসিয়ে দিতে আর কিছু মাংসও। উলাখান তইয়োনকে বাদশাহী কেতায় অভ্যর্থনা জানান চাই।

আদবকায়দার নিয়ম অনুযায়ী আমায় কিছুক্ষণ চুপ করে থাকতে হল, তারপর আলাপ সুরু করলাম, 'কাপ্‌সে, তোগোর!' (বন্ধু, তোমার বিষয়ে কিছু বল!)

'সো-ওখ্‌ক্‌, এন্ কাপসে!' (কিছুই বলার নেই, তুমি বল!) বুড়ো টেনে টেনে বলল।

ইয়াকুৎ ভাষায় আরো কতগুলো প্রথাগত কথাবার্তা বলা হল। তারপর বুড়ো হঠাৎ রুশীতে কথা বলতে সুরু করল। বোধহয় মনে মনে ভেবে দেখল আমার ইয়াকুতীর চেয়ে ওর রুশী অনেক ভাল। আমাদের যাত্রার বিবরণে তার গভীর কৌতূহল দেখা গেল। কষ্টের কথাটাও সে মাথা নেড়ে উপভোগ করল। অনেকবার সে এ অঞ্চলের নানা অদ্ভুত ব্যাপার সম্বন্ধে আমার জ্ঞান পরখ করে দেখল। কিন্তু এ অঞ্চলে দীর্ঘকাল ধরে ঘোরাঘুরি করছি বলে আমায় সে কিছুতেই জব্দ করতে পারল না। বুড়োকে ছোট এক পাত্র মদ দেওয়া হল। সেই সঙ্গে পেট ভরে খাবার খেয়ে সে একটু নরম হল।

'তোমায় একটা জিনিস দেখাব। আগে হয়ত আর কখনই তা দেখনি।' বলে বুড়ো ক্ষিপ্র পায়ে তার স্লেজের কাছে চলে গেল।

'বুড়োকে চেন?' গাবিশেভকে জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ, নাম কিল্‌চেগাসভ। ভাল শিকারী। সব জায়গা চেনে।'

বুড়ো ফিরে এলে আমি আর কোন প্রশ্ন করলাম না।

'তক্কোতে এ জিনিস দেখেছ?' একটা ম্যামথের দাঁতের মস্ত টুকরো বাড়িয়ে দিয়ে বুড়ো ধূর্ত হাসি হেসে ভাঙা ভাঙা রুশীতে বলল।

জিনিসটা কী বুড়োকে বললাম। হাত দিয়ে পুরো দাঁতটার চেহারাটা

দেখিয়ে দিলাম। আমার জবাব শুনে কিল্‌চেগাসভ একটু নিভে গেল। তারপর যখন বললাম, জিনিসটা নিশ্চয়ই খয়ে-যাওয়া নদীতীরে পাওয়া গেছে তখন সে অত্যন্ত বেজার হয়ে গেল।

'সর্দার, তুমি অনেক কিছু জান,' মাথা নেড়ে বলল বুড়ো।

খুসি হয়ে আমি তখন লেনা নদীর মোহনার দ্বীপগুলোর কথা তাকে বলতে লাগলাম। সেখানে প্রচুর ম্যামথের দাঁত গাদা হয়ে পড়ে আছে। সেই সঙ্গে মিশে আছে তিমিমাছের হাড় আর জলে ফেলে দেওয়া গাছের গুঁড়ি।

বুড়ো হাঁ করে আমার কথা শুনল। তারপর থুতু ফেলে আমার দিকে এগিয়ে এসে সাবেগে বলে উঠল, 'সর্দার, তুমি জ্ঞানী পুরুষ। কিন্তু আমাদের শিকারীরাও এমন অনেক কথা জানে যা তুমি জান না। এমন গলেৎস আছে যেখানে ম্যামথের দাঁতের বন পড়ে আছে। বাঁকা না, সোজা, সামান্য বাঁকা।'

'তাই নাকি,' অবাক হয়ে বললাম।

কিল্‌চেগাসভ তামাকের থলেটার দিকে হাত বাড়াল। তারপর পাইপ ধরিয়ে উপর দিকে চেয়ে রইল, যেন কিছু একটা মনে করতে চেষ্টা করছে।

'আমার বাবার ভাই ওখানে সগ্‌দজই (বুনো হরিণ) শিকারে যায়...' পুবদিকে আঙুল দেখিয়ে কিল্‌চেগাসভ বলল, 'ও দেখেছে — আমায় বলেছে। তুমি শুনেছ?' পথপ্রদর্শকের দিকে ফিরে বলল।

'শুনেছি। ভেবেছি মিথ্যে কথা।' গাবিশেভ কোন উৎসাহ দেখাল না।

'মিথ্যা নয়। শিঙের টুকরো এনেছে — ডগাটা। নিজে দেখেছি।'

'গলেৎসটা কোথায়?' বুড়োকে জিজ্ঞেস করি।

'যদি কাছেই হয় সর্দার, যাবে?'

'নিশ্চয় যাব।'

একটুখানি চুপ করে থাকার পর বুড়োর সন্দিগ্ধ ভাবটা দূর হল।

আমিও আমার মস্ত ম্যাপটা মেলে ধরলাম।

'এইখানে, চিরোদা আর তক্কোর উৎসের মাঝখানে, অনেক গলেৎস — মস্তবড়।'

'ঠিক,' আমি সমর্থন জানালাম; কিন্তু বুড়ো আমার কথায় কোন কানই দিল না।

'চিরোদা আর চিরোদাকানের উৎসের কাছে সবচেয়ে বড় গলেৎস, এই বড়

খুঁটিটার মতো,'—আলেক্সান্দ্রভ আর আমি দুজনে দুজনের দিকে তাকালাম: আমাদের সেই "চাঁদের পাহাড়" গোলেৎসটার ঠিক উপমাই বুড়ো খুঁজে বের করেছে—'গলেৎসটা এখানে একা দাঁড়িয়ে আছে—তক্কোর উৎসের কাছে। গলেৎসের ডাইনে উঁচু, সমান পরিষ্কার জায়গা, টেবিলের মতো। এখানে দাঁত আছে। দাঁতে ভরা গর্তও আছে এখানে।'

'এখান থেকে দূরে?' আমার কৌতূহল তখন খুবই বেড়ে গেছে।

'দূরে না,' বুড়ো টেনে টেনে বলল, 'তারিন্নাখ ধরে এগও। তারিন্নাখের উৎস ডাইনে গেছে, ইচোন্‌চকিৎ বাঁয়ে। ইচোন্‌চকিৎ ধরে মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটায় যাও। নিচু — সমান জমি, ছোট্ট ঝর্ণা। ঝর্ণা গেছে তালুমাকিতে। তক্কো উৎস থেকে — ছোট নদী কিভেতি বাঁয়ে। ছুরির মতো পাহাড় কেটে গেছে। তারপর সমান মাঠ...' একমিনিট ভেবে নিয়ে বুড়ো বলল, 'নব্বই কি একশ ভের্স্‌ৎ।'

বুড়ো চুপ করে গেল। কারো মুখে কথা নেই। কেবল শোনা যাচ্ছে চুল্লীর কাঠফাটার চাপা শব্দ। আমাদের খাবার দাবার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এ সময় কি ঐ প্রায় দুর্গম রাজ্যে পাড়ি দেওয়া উচিত হবে? আলেক্সান্দ্রভ আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। কিন্তু তার মনের অনুভূতি এতটুকুও প্রকাশ হতে দিল না। গাবিশেভ ইয়াকুৎ ভাষায় বুড়োকে কী যেন বলল, তারপর দুজনেই ফিসফিস করে কী সব আলোচনা করতে লাগল। কয়েকটা পরিচিত কথা কেবল বুঝতে পারলাম: "ভীষণ স্রোত... হরিণ চরার ভাল মাঠ... স্লেজ পেরতে পারবে না... শয়তানের যত শয়তানী।"

'শয়তানের শয়তানী কোথায়, গাবিশেভ?' আমি বলে উঠলাম। ব্যাখ্যার অতীত যত প্রাকৃতিক ঘটনাকে ইয়াকুৎ আর তুংগুসরা যে "শয়তানের শয়তানী" বলে থাকে তা আমার জানা ছিল।

'জায়গাটা আমি চিনি। শয়তানের খুব শয়তানী ওখানে,' পথপ্রদর্শক সাক্ষী দিল, 'দুর্দান্ত সব স্রোত, মৃত্যু তার উপরে ঘুরে বেড়ায়।'

'কিসের স্রোত ? ওখানে তো সব ছোট ছোট নদী।'

'নদী না — সারা পথ জুড়ে মারাত্মক সব স্রোত।'

বোঝা গেল হিমবাহ উপত্যকায় আড়াআড়িভাবে যেসব খাড়া পাথর থাকে তাদের কথা বলছে। তখনও মন ঠিক করতে পারেনি। সাইবেরিয়ায় ৬০ মাইল

পথ তেমন বেশি কিছু নয়। মুশকিল হচ্ছে বসতিতে যেতে আমাদের পাঁচদিনের চেয়ে আরো বেশি লেগে যাবে। তাহলেও এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় আবার আসার সম্ভাবনা খুবই কম।

কিল্‌চেগাসভের দিকে তাকালাম, 'তুমি আমাদের সঙ্গে ওখানে যাবে?'

সঙ্গীদের চমক দেখে বুঝতে পারলাম আমার মনের কথা ধরতে পেরেছে। কিল্‌চেগাসভ তখনো পাইপ টানতে টানতে ভাবছে।

তাকে তাড়া না দিয়ে আমি আলেক্সান্দ্রভকে বললাম, 'আপনি কী বলেন, আনাতলি আলেক্সান্দ্রভিচ?'

'নিশ্চয়ই ব্যাপারটা একবার দেখা উচিত,' আলেক্সান্দ্রভ উৎসাহ দিয়ে বলল।

'আলেক্সেই তুমি? দশদিনের মত খাবার আছে?'

'খুব টানাটানি করে চলে যাবে। এক বস্তা বিস্কুট, চা আর গোটা পাঁচেক টিন কড়াই শুঁটি আছে...'

বুড়ো ধ্যান ভেঙে জেগে উঠে জানাল যে সে সঙ্গে যেতে রাজী। এবার গাবিশেভের পালা।

'ভাসিলি, তুমি যাবে?' জিজ্ঞেস করলাম, 'যদি যাও, তবে মালপত্র আর মালের স্লেজটা এখানে রেখে যাব, হরিণটা আমাদের সঙ্গে যাবে।'

গাবিশেভ নির্বিকারচিত্তে পাইপ টানতে টানতে ঘাড় গুঁজে মাটির দিকে স্থিরদৃষ্টে চেয়ে রইল। ওর উপরে অনেক কিছু নির্ভর করছে — হরিণটা ওরই।

'আমিও সবার সঙ্গেই যাব, সর্দার,' গাবিশেভ শেষ পর্যন্ত গম্ভীর গলায় বলল। তারপর নির্লিপ্তভাবে যোগ করে দিল, 'মনে হচ্ছে সবাই মিলে এবার মারা পড়ব...'

সাহসী গাবিশেভের হাতটা চেপে ধরলাম। আমাদের এই যাত্রাটা তার মতে অত্যন্ত বিপজ্জনক কিন্তু তবু আমাদের সব বিপদের ভাগ নিতে সে প্রস্তুত।

সন্ধ্যা পর্যন্ত যাত্রার বিষয়েই আলোচনা হল। রাত্রে অভিযানের পঞ্চম সদস্য এসে তাঁবুতে আশ্রয় নিল। পরদিন সকালে আমরা তাড়াতাড়ি তারিন্নাখ উপত্যকায় নেমে বাড়তি তাঁবুটা খাটিয়ে ফেললাম। তার ভিতরে আমাদের সব সংগ্রহ, বাড়তি স্লেজ আর যে সব জিনিস কাজে লাগবে না সেগুলো রেখে

দিলাম। তারপর চারার দিকে পিছন ফিরে উত্তর তারিন্নাখের ভীষণ গলেৎসের দিকে এগতে লাগলাম।

বিরাট নদী উপত্যকাটি সাদা কুয়াশায় ভরে গেছে। বরফ ভেঙে যে সব জায়গায় জল বেরিয়ে পড়েছে সেখান থেকেই এই কুয়াশা উঠছে। এই বরফ-ভাঙা জলকে ইয়াকুৎ ভাষায় বলে "তারিন"। বরফের নিচে অল্পই জল, কিন্তু স্লেজগুলোকে কোথাও কোথাও নিস্পন্দ জলের উপর দিয়ে নৌকোর মতো এগিয়ে যেতে হচ্ছে। কখনো কখনো গহ্বরে পড়ে যাচ্ছে। কোথাও আবার হরিণগুলোকে ধমক-ধামক দিয়ে সামলে রেখে পাৎলা গদীর মতো বরফের উপর দিয়ে তীরবেগে ছুটে চলেছি। সেদিন অনেকটা পথই পার হয়ে গেলাম। সন্ধ্যায় এসে পেঁছলাম উপত্যকা-জোড়া একটা খাড়া দেয়ালের কাছে। এই হল সেই বিখ্যাত সিকি মাইল লম্বা পাথর। আমাদের ডাইনে নদীটা দেয়ালের ভিতর দিয়ে সরু পথ কেটে ছুটে গেছে। সেখান থেকে ঝুলে আছে মস্ত এক বাঁকা বরফের স্তম্ভ। তার উপর দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। সূক্ষ্ম ধোঁয়ার পর্দায় স্তম্ভটা ঢাকা। আমাদের বাঁয়ে হলদে দুর্ভেদ্য পাথরের প্রাচীর। তার একাংশ ভাঙা। এ প্রাচীরটা ওঠার পক্ষে আগেরটার মতো অত ভয়ানক নয়।

সকালবেলা তিনজোড়া সবচেয়ে শক্তিশালী হরিণ আগের চেয়ে হালকা স্লেজগুলোকে টেনে নিয়ে চলল। প্রতি জোড়ার সঙ্গে দুজন করে লোক — একজন সামনে থেকে হরিণগুলোকে টানছে, আরেকজন পিছন থেকে স্লেজ ঠেলছে কিম্বা তুলে ধরছে। বাড়তি হরিণটা স্লেজগুলোর পিছন পিছন আসছে। খাড়া চড়াই-উৎরাইকে হরিণগুলোর ভীষণ ভয়। দেয়াল বেয়ে আমরা খুব ধীরে ধীরে চলেছি। অত্যন্ত অভিজ্ঞ তাইগা পর্যটকও ঐ দেয়াল বেয়ে উঠতে ভয় পায়। একেবারে উপরে উঠে আলেক্সান্দ্রভ পা পিছলে তার হরিণের উপর পড়ে গেল। একটা বড় কালো হরিণ শিং দিয়ে তাকে ধরে ফেলল, তারপর প্রচণ্ড ভয়ে দুই লাফে উপরে উঠে গেল। বাকি আমরা — মানুষ আর হরিণ সবাই — দেয়ালটার চ্যাপ্টা মাথার উপর কাহিল অবস্থায় শুয়ে পড়লাম।

'কী খাড়া পাথর!' আলেক্সেই বিড়বিড় করে বলল, 'নিচে তাকাতে পা কেঁপে যায় ... কেউ যদি পড়ত তাহলে?'

'স্লেজ পড়লে তার ভাঙা কাঠকুটো পড়ে থাকত। তুমি পড়লে পড়ে থাকত তোমার যকৃৎ,' পথপ্রদর্শক বেশ নির্বিকারচিত্তে বলল কথাটা।

এখন নদীটা পার হয়ে আমাদের উপত্যকার ডানদিকে যেতে হবে। কাজটা বেশ সহজ মনে হয়েছিল, কিন্তু দেখা গেল খেয়ালের মাথায় না ভেবেচিন্তে আচ্ছা বিপদের ঝুঁকিই নিয়েছি। খুব সাবধানে পা টিপে টিপে যাওয়া ছাড়া আর উপায় নেই। একটা "তারিন" পাৎলা বরফের কম্বল বিছনো,মসৃণ চ্যাপ্টা মাথা ঢিবির আকার নিয়েছে। সেখানে পোঁছনো মাত্র হরিণগুলোর পা পিছলে যেতে সুরু করল। স্লেজ থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লাম। কিন্তু হরিণদের সাহায্য করব কি, নিজেরাই পা পিছলে পড়ে যাচ্ছি। হঠাৎ বুঝতে পারলাম আমরা পিছলে খাদের দিকে চলেছি। সে খাদের গা বেয়ে হাজার ফুট নিচে উপত্যকার বুকে নেমে গেছে একটা জমাট জলপ্রপাত...

পথপ্রদর্শকের সরু গলার চীৎকার শোনা গেল, 'সাবধান, সামনে ভীষণ ফাঁড়া!'

বন্ধুদের অবস্থা দেখে ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। ছুটে গিয়ে একেবারে খাদের ধারেই স্লেজটাকে পিছন থেকে টেনে ধরলাম। আবার পা পিছলে পড়ে গেলাম, আমার চোদ্দ স্টোনী লাশের ঘায়ে নতুন বরফের গায়ে একটা গর্ত হয়ে গেল, তার ফলে আটকে থাকার সুবিধে হল। ট্রাউজার্স জলে ভিজে যাচ্ছে, কিন্তু তবু স্লেজটা টেনে ধরে রেখেছি। সঙ্গীরা কোনরকমে হরিণটাকে খাদের ধার থেকে টেনে আনল। অবশেষে উপত্যকার ডানপাশের শক্ত বরফে এসে পোঁছন গেল। ভীষণ জায়গাটা ছেড়ে দ্রুত বেগে এগিয়ে চললাম।

রাতটা কাটালাম ইচোন্‌চাকিতে। পরদিন সকালে উঠে দেখি পাৎলা মেঘে সারা আকাশ ছেয়ে গেছে। সূর্য অদৃশ্য কিন্তু তবু মেঘের মধ্যে দিয়ে তার কড়া আলো এসে পড়ছে বরফের গায়ে। মাটির সব বন্ধুরতা এই আলো মুছে দিয়ে পরিপ্রেক্ষিত দিয়েছে পাল্টে। চারপাশের সবকিছুর সীমারেখা বদলে গেছে। তাই পথচলা খুব কঠিন। কিল্‌চেগাসভ আর গাবিশেভের মুখে ভীষণ ভ্রূকুটি। সারাক্ষণ খালি তারা থুতু ফেলছে আর গালিগালাজ করছে। তাদের ধারণা এ নিশ্চয়ই শয়তানের কাজ।

অবশেষে নিচে নামা শেষ হল। খাদটা তেমন বিরাট নয়। চারপাশে গলেৎস। আকাশ ঢাকা সাদা জোব্বায় তাদের চূড়া অদৃশ্য। একেবারে সামনেই

পাহাড়ের খাড়া গা। কিল্‌চেগাসভ বর্ণিত সেই জায়গাটা পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে।

তাঁবু ফেলে জ্বালানী কাঠ জোগাড় করা হল। কিল্‌চেগাসভ আর গাবিশেভ কী সব অদ্ভুত ক্রিয়াকাণ্ড সুরু করে দিল। তাঁবুর চারদিকে কতগুলো লম্বা খুঁটি পুঁতে তাদের মাথায় ন্যাকড়া আর কাঠের টুকরো বেঁধে দিল। বলল ভূত তাড়ান হচ্ছে।

সত্যিই কিছুক্ষণ পরেই শয়তানের দেখা পাওয়া গেল। সন্ধ্যার দিকে হঠাৎ শোনা গেল বীভৎস চীৎকার, তারপরেই ভূতুড়ে হাসি আর বিশ্রী গর্জন। এই বিচিত্র আওয়াজ ভীষণ প্রতিধ্বনির ফলে এমন জোর হয়ে উঠল যে বোধহয় ইয়াকুৎদের চেয়ে আমিই বেশি ভয় পেলাম। ভূত যে দেখা দেবেই ইয়াকুৎদের এ বিষয়ে কোন সন্দেহই ছিল না। আলেক্সান্দ্রভ বন্দুক নিয়ে তাঁবু থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল কিন্তু নিভে-আসা আলোয় কিছুই সে দেখতে পেল না।

'ঐ যে!' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল আলেক্সেই। সেও বাইরে বেরিয়ে গেল। গোধূলির নীলচে ধূসর ক্ষীণ কম্পিত আলোয় প্রায় অদৃশ্য কতগুলো বেঁটে বাঁকা বার্চগাছ। তাদের উপর দিয়ে উড়ে চলেছে কয়েকটা কালো ছায়া।

আলেক্সান্দ্রভ বন্দুক তুলে ধরল — নল থেকে ছুটে বেরল আগুনের দীর্ঘ শিখা। তারপর শোনা গেল এক তুমুল বিস্ফোরণ। আমরা তো সে আওয়াজে হতভম্ব। সে আওয়াজের আবর্তন ক্রমেই জোরাল হয়ে উঠে শেষকালে দূরের পাহাড়ে মিলিয়ে গেল, যেন মানুষের দুঃসাহসী অভিযানের ঘোষণা জানিয়ে দিল। কাছেই কী একটা যেন মাটিতে পড়ে ছটফট করছে। আলেক্সান্দ্রভ দৌড়ে গিয়ে একটা মস্তবড় পেঁচা নিয়ে এল। অনেকটা ঈগল পেঁচার মতো দেখতে। তবে পালকগুলো দুধের মতো সাদা আর ডানার গায়ে কালো ফোঁটাফোঁটা ছিটে আর ডোরা, পিঠে আর মাথার উপরেও তাই। গাবিশেভ আর কিল্‌চেগাসভ কিন্তু তাঁবু ছেড়ে বেরয়নি। আলেক্সান্দ্রভ পেঁচাটা নিয়ে বিজয়গর্বে তাদের দিকে এগিয়ে গেল। ভাবখানা যেন বলতে চায়, "নাও, এই তোমাদের ভূত!" কিন্তু ইয়াকুৎরা তাতে একটুও অভিভূত হল না। কেবল বলল এরপর শয়তানের শয়তানী আরো বেশি দেখা যাবে।

তাঁবুতে ফিরে গিয়ে সবাই মিলে পর দিনের যাত্রা নিয়ে আলাপ

আলোচনা সুরু হল। ম্যামথের দাঁতওয়ালা গলেৎসটা পরদিন পার হতে হবে। কিল্‌চেগাসভ জানাল, গ্রীষ্মকালে দুর্গম কিভেতা নদীর উপত্যকা দিয়ে এখন দশ মাইল পথ পার হয়ে একটা "পরিষ্কার জায়গায়" যাওয়া যাবে, তারপর পেঁাছন যাবে ম্যামথের দাঁতের মালভূমিতে। গাবিশেভ হঠাৎ বলে বসল, সে আমাদের সঙ্গে আর এগবে না। কিল্‌চেগাসভের আবার পা ফেটে সাংঘাতিক অবস্থা। তাকেও নিয়ে যাওয়া যাবে না। ঠিক করলাম আলেক্সেইকে ইয়াকুৎদের কাছে রেখে আলেক্সান্দ্রভ আর আমিই এগব।

সবাই প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছি এমন সময় হঠাৎ একটা ভীষণ গর্জন শোনা গেল। বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলল বিশ্রী গুমগুম আওয়াজ, ধুপধুপ শব্দ। ধস নেমেছে ভেবে আমি আলেক্সান্দ্রভের দিকে তাকালাম। সে নির্বিকারচিত্তে সান্ত্বনা দিয়ে বলল:

'কিছু না, গেওর্গি পেত্রভিচ, পাহাড়ের গা বেয়ে পাথর পড়ছে। ভূত্বকের সাম্প্রতিক আলোড়নের ফলে এখানকার পাহাড়ের গা অস্বাভাবিক রকম খাড়া। তাই প্রায়ই পাথর পড়ে। পাথরের শব্দ আর তার প্রতিধ্বনিই হচ্ছে এদের শয়তানের শয়তানী।'

হাসতে হাসতে আমরা আবার যে যার শোবার থলেতে ঢুকে পড়লাম।

গত দুদিন হিম কিছু কমেছিল, রাত্রে আবার বাড়ল। সুরু হল মারাত্মক ঠাণ্ডা হাওয়া। শোবার থলের ভিতর হাওয়া ঢুকছে। শরীরের যে দিকটা হাওয়ার দিকে ফেরান তা জমে যাওয়ার জোগাড়। শীতের চোটে ঘুম ভেঙে গেল। অনেকক্ষণ ধরে শুয়েই রইলাম। কিছুতেই আর ঘুম ছেড়ে উঠে আগুন ধরাবার উৎসাহ পাই না। শেষ পর্যন্ত কাঁপতে কাঁপতে লাফিয়ে উঠে পড়লাম। দেশলাই জেবলে কাঠিটা চুল্লীর কাঠের গায়ে গুঁজে দিলাম। তাঁবুটা গরম হয়ে ওঠার অপেক্ষায় আগুনের পাশেই বসে পড়লাম। কাঠগুলো ফাটতে লাগল, আগুনও বেড়ে উঠল।

বসে বসে পরের দিনের অভিযানের কথাই ভাবছি। এমন সময় হঠাৎ বাইরে জোর পায়ের শব্দ শোনা গেল। খুব বড় গোছের কোন জন্তুর পায়ের শব্দ। শব্দটা তাঁবুর কাছে এগিয়ে এসে চারদিকে ঘুরতে লাগল। আলেক্সেই'এর ঘুম খুব পাৎলা। শব্দ শুনে সে উঠে পড়ে আলেক্সান্দ্রভকে খোঁচা মারল। তাঁবুর কাছে আবার সেই অলক্ষুণে পায়ের শব্দ। তাড়াতাড়ি

বন্দুকটা তুলে নিলাম। সাধারণত যা করি না সেদিন করেছিলাম। তাঁবুর ভিতরেই রেখেছিলাম যাতে গরম থাকে। ইচ্ছে ছিল সুযোগ পেলে শয়তানের উপর একবার সীসের ৩৫১ গুলির প্রক্রিয়াটা দেখে নেব। গাবিশেভ আর কিল্‌চেগাসভকে একলাফে পার হয়ে আলেক্সান্দ্রভ আর আমি তাড়াতাড়ি তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে গেলাম। গাবিশেভরা তখন মাথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে, ওঠার এতটুকু ইচ্ছাও নেই।

আকাশ মেঘমুক্ত। পাহাড়ের চূড়ার উপর ক্ষীণ চাঁদ অলক্ষুণে ভঙ্গীতে বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বরফের উপর কিন্তু শত অনুসন্ধানেও কোন পায়ের ছাপ দেখা গেল না। শীতে ওদিকে হাড়ে কাঁপুনি ধরেছে। তাড়াতাড়ি তাঁবুর ভিতর পালিয়ে এলাম।

ভিতরে ঢুকতেই গাবিশেভ উদ্বিগ্নভাবে বলে উঠল, 'কী দেখলে?'

'কিছুই না।'

'তার মানে ... কালকে কোন পায়ের ছাপ দেখা যাবে না।'

'জিনিসটা কী ছিল, তোমার কী মনে হয়?'

'এ জায়গার মালিক।'

'মালিক, কিসের মালিক?'

'বোঝ না কেন?' গাবিশেভ হঠাৎ রেগে উঠল, 'মালিক, মালিক!..'

আমি আর প্রশ্ন করলাম না। যদিও কোন "মালিক" যে আমাদের তাঁবুর চারপাশটা ঘুরে গেল তা কিছুই বোধগম্য হল না।

ভোরবেলা আলেক্সান্দ্রভ আর আমি মোমবাতি জেবলে যাত্রার জন্য তৈরী হতে লাগলাম। খাদের ভিতর তখনো অন্ধকার। ঠিক করলাম, বন্দুকদুটো এখানেই রেখে যাব। অনেক দূর পথ। সঙ্গে জিনিস যত কম থাকে ততই ভাল, কারণ ম্যামথের দাঁতের দুয়েকটা নমুনা নিয়ে আসার ইচ্ছা আছে। বন্দুক আর কুড়ুলের বদলে রিভলভার আর শিকারের ছুরিতেই কাজ চলবে। তা সত্ত্বেও এনিরয়েড্‌, ক্যামেরা, টোপোগ্রাফিক প্লেনটেবিল, খাবার দাবার নিয়ে মাল মন্দ হল না।

জিনিসপত্র গোছগাছ করে চা খেতে খেতেই সূর্য উঠে গেল। ইয়াকুৎরা তাঁবুর চারপাশটা ঘুরে এসে বলল, হরিণ ছাড়া আর কোন কিছুর পায়ের দাগ কোথাও নেই ...

আমরা বেরিয়ে পড়ে খাদটা তাড়াতাড়ি পার হয়ে গেলাম। স্নোবুটের তলায় নীল বরফ মচমচ করে গুঁড়িয়ে যেতে থাকল।

'ঠাণ্ডা এখন শূন্যের নিচে ৬০°র মতো হবে!' মাফলারটা নাকের উপর টেনে দিয়ে বলল আলেক্সান্দ্রভ।

আধঘণ্টা পর কিভেতা উপত্যকায় পেঁছিলাম। উপত্যকাটা তখনো অন্ধকার। ধূসর আলো আঁধারির মধ্যে দিয়ে কয়েক মাইল হাঁটার পর সূর্যের আলো গিরিবর্ত্মের তলায় এসে ঠেকল।

গিরিবর্ত্মটা অদ্ভুত দেখতে। আমরা তখন আপনা থেকেই ফিসফিস করে কথা বলতে সুরু করেছি, যেন ভয় পেয়েছি, পাছে এখানকার "মালিক" আবার রেগে ওঠে। গিরিবর্ত্মটা পনের ফুটের বেশি চওড়া নয়। কয়লার মতো কালো খাড়া দেয়ালগুলো উপরে উঠে গেছে। একেক জায়গায় তাদের মাথা জোড়া লেগে গিয়ে খিলান আর অন্ধকার সুরঙ্গের সৃষ্টি হয়েছে। প্রায় পনের ফুট উঁচুতে বিরাট বিরাট বিধ্বস্ত গাছের গুঁড়ি পাথরের মধ্যে গেঁথে গেছে। বোঝা যাচ্ছে বসন্তকালে বন্যার জল ঐ পর্যন্ত ওঠে। পাহাড়ের গায়ে জল গভীর গর্তের সৃষ্টি করেছে। গোরুর গাড়ির চাকার মতো বড় বড় পাথরে গর্তগুলো ভরা।

জমে-যাওয়া নদীটা সিঁড়ির কাজ করছে। বরফের উপর পাৎলা জলের স্তর। আমাদের স্নোবুটগুলোও কিছুক্ষণ পরেই একচাপ বরফে পরিণত হল। থেকে থেকেই জুতোগুলোকে লাঠি দিয়ে ঠুকতে হল। জুতোর তল তখন ভীষণ পিছল। সিঁড়িগুলোও ক্রমশ খাড়া হয়ে উঠেছে। অন্য কোন ঋতু হলে অবশ্য এ নদী পাগলা ঝোরার মতো ছুটে চলত। গ্রীষ্ম বসন্ত বা হেমন্তে এই উপত্যকা আমরা কিছুতেই পার হতে পারতাম না। কালো দেয়ালে ঘেরা সংকীর্ণ গিরিবর্ত্মের নিস্তব্ধতায় হাঁপ ধরে গেল।

ছ'মাইল চলার পর গিরিবর্ত্মটা দক্ষিণে বাঁক নিল। দুপাশের পাথরের ফাঁক দিয়ে ঢুকল সূর্যের আলো। এ জায়গাটায় দেয়ালের একটা অংশ ভেঙে পাথরের গড়ন বেরিয়ে পড়েছে। দেয়ালগুলো গঠিত অভ্রের পাত দিয়ে। সূক্ষ্ম সোনালী অভ্র রোদ পড়ে সোনা আর রুপোর মতো চমকাচ্ছে। বরফের মধ্যে স্বচ্ছ পান্না রং ছড়াচ্ছে সোনালী আর রুপোলি পাথর। গিরিবর্ত্মের বিষণ্ণ অন্ধকার চেহারা আর নেই।

আরো মাইল আড়াই ওঠার পর দেবদারুগাছ আর বড় বড় পাথরে ভরা একটা গোল জায়গায় এলাম। মেঘমুক্ত আকাশের গায়ে পরিষ্কার ফুটে উঠেছে "চাঁদের পাহাড়"। বিরাট পাথরের স্তম্ভ। উত্তর-পূর্ব দিগন্তের সবটাই ঢাকা পড়ে গেছে। সামনেই সিঁড়ির আরেক ধাপ। সোজা, খাড়া, যেন ছুরি দিয়ে কেটে তৈরী। এই তিনশ ফুট উঠতে আমাদের পুরো একটি ঘণ্টা লাগল। মোটা জামাকাপড়ে ঘামতে ঘামতে উপরে উঠে দেখলাম সামনে আরেকটা গ্র্যানাইট পাথরের দেয়াল। তবে খুব বেশি উঁচু নয়। পার হতে বেশি কষ্ট হল না। তার মাথায় উঠে তবে দেখতে পেলাম আমাদের এই সাধারণ বেড়াতে যাওয়ার লক্ষ্যটা। একটা ছোট্ট উত্তল মালভূমি। বরফ প্রায় নেই বললেই চলে। চারপাশে ছাড়া ছাড়া সরু মাথা সপ্‌কা। আরেকটু দূরে এক ঝাড় বেঁটে দেবদারুগাছের পিছনে নীস'এর স্তম্ভের ছুঁচলো মাথা ফুটবলের গোলপোস্টের মতো সমানভাবে বসান।

দেবদারু ঝাড়ের ভিতর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে পৌঁছলাম একটা ফাঁকা জায়গায়। অনেক হাতির দাঁত সেখানে পড়ে আছে। অর্ধবৃত্তাকারে বাঁকা ম্যামথের দাঁতের মতো নয়। অনেকটা আফ্রিকার হাতির দাঁতের মতো সোজা। গুণে দেখলাম চোদ্দটা দাঁত। একেকটা ফুট দশেক লম্বা। দাঁতগুলো কালো হয়ে গেছে। মোটা প্রান্তটা গেছে গুঁড়িয়ে। অন্য কোন দাঁত বা হাড় পাওয়া গেল না।

কাছেরই একটা টিলা থেকে মালভূমির মাঝখানে আরো হাতির দাঁত দেখা গেল। অনেকটা জায়গা জুড়ে কাঠের গাদার মতো উঁচু হয়ে আছে। উত্তেজনায় চেঁচিয়ে উঠে আমরা সেদিকে ছুটে গেলাম। শখানেকেরও বেশি দাঁত আর বড় বড় হাড়। হাড়গুলো আমরা ছোঁয়া মাত্র ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল।

টিলার কাছেই একটা গভীর নালা দেখা গেল — কিল্‌চেগাসভের সেই "গর্ত"। তার বাঁদিকে একটা আধবোজা চওড়া প্রবেশপথ। কোনরকমে তো ভিতরে ঢুকলাম। বরফ-ঢাকা খিলানের তল দিয়ে প্রথমে কিছুটা হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটতে হল। তারপর হঠাৎ গড়িয়ে গিয়ে পড়লাম একটা অন্ধকার গুহায়। ভাগ্যক্রমে আলেক্সান্দ্রভের থলেতে একটু মোমবাতি ছিল, পরে সেটা খুব কাজে এসেছিল।

গুহাটা বেশ বড়। তার অনেকগুলো খাড়া মুখ। বরফ-ঢাকা মেঝেয় উঁচিয়ে আছে অজস্র হাড়।

সবচেয়ে উঁচু মুখটায় উঠেই আমরা বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলাম। মসৃণ খাড়া দেয়াল জুড়ে বড় বড় ছবি। সবই জন্তুর। কোন কোনটা খুব বলিষ্ঠ হাতে আঁকা। কোনটার রং লাল আর কোনটার বা কালো। সে রং এখনো অত্যন্ত উজ্জ্বল। ছবির নিখুঁৎ ড্রয়িং। প্রতিটি জিনিস খুঁটিয়ে আঁকা। অভিব্যক্তিও অপূর্ব। মোমবাতির কাঁপা আলোয় জন্তুগুলোকে অত্যন্ত সজীব মনে হল। মুগ্ধ বিস্ময়ে দেয়ালের দিকে চেয়ে রইলাম। আমার চোখের সামনে খুলে গেছে আফ্রিকার জীবন। বিরাট বিরাট হাতি, বাদুড়ের ডানার মতো তাদের কানদুটো ছড়ান। হরিণ, সিংহ ... দুই শিংওয়ালা আফ্রিকান গণ্ডারের মাথা ...

'কী আশ্চর্য! এ যে আফ্রিকার গণ্ডার আর হাতি!' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

আরো ছবি পাওয়া গেল: কুঁজো কাঁধ চিতা হায়না, জিরাফ, ডোরা-কাটা জেব্রা। আফ্রিকা! তুষার ঘেরা সাইবেরিয়ার পাহাড়ে আফ্রিকা!

গুহার ভিতরটা বাইরের তুলনায় গরম। ভেজা বরফ-জমা স্নোবুটের কথা ভুলেই গেলাম। সারা শরীর তখন গরম হয়ে উঠেছে — মনে হচ্ছে যেন আফ্রিকার রোদে পোড়া আকাশের নিচেই দাঁড়িয়ে আছি।

ঘুরতে ঘুরতে দুটো হাতির দাঁতে ভরা গহ্বর পাওয়া গেল। সবচেয়ে বড়টা তের ফুট লম্বা। এত বড় দাঁত আগে কখনো দেখিনি। কাঠের মতো গাদা করে রাখা দাঁতগুলোর হলদে-কালো গায়ে মোমবাতির আলোয় অল্প চমক ফুটেছে।

এই অপূর্ব আবিষ্কারের ফলে দিশেহারা হয়ে আরেকটা মুখে ঢুকতে যাচ্ছি এমন সময় আলেক্সান্দ্রভ বলে উঠল তিনটে বেজে গেছে। আর দেড় ঘণ্টার মধ্যেই অন্ধকার হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে। এই ন্যাড়া জায়গায় রাত কাটান বিপদের কথা। কোথাও একটাও গাছপালা নেই, গায়ের জামাকাপড়ও সব ভেজা, শীত ওদিকে –৬০°। তবুও আরো আধঘণ্টা খানেক ঘুরে ঘুরে দেখলাম। গুহাবাসী যারা আফ্রিকার ছবি দেয়ালে এঁকে রেখে গেছে তাদের কোন চিহ্ন যদি কোথাও পাওয়া যায়। রহস্যময়

গুহাবাসীদের পরিচয় লাভের অনেক চেষ্টাই করা হল। কিন্তু একজোড়া পাথরের তৈরী তীরের ফলা আর হাড়ের তৈরী কী একটা কলকব্জা ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না। হাড়ের উপকরণটা যে কী কাজে লাগতে পারে তাও বোঝা গেল না।

সূর্য তখন পাহাড়ের আড়ালে ডুব মেরেছে। হাতির দাঁতের মস্ত বোঝা কাঁধে নিয়ে গ্র্যানাইটের দেয়ালটা পার হয়ে শেষবারের মতো একবার গুহাটাকে দেখে নিলাম। আমার মনের মধ্যে অনেক কথা অতিদ্রুত ভীড় করে এল। মনে পড়ল আফ্রিকা থেকে দলে দলে জীবজন্তু অনেক কাল আগে অন্য দেশে পালিয়ে এসেছিল। মনে পড়ল তুষার যুগের আগে বাইকাল হ্রদের উত্তরদিকে আর মঙ্গোলিয়ার একাংশে ছিল গরম স্তেপ। সেখানে উটপাখি হরিণ আর জিরাফের আস্তানা ছিল। বুঝতে পারলাম আমরা আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব সীমা বরাবর এসে গেছি। জীবজন্তুদের সেই দলে দলে দেশত্যাগের এটাই ছিল সবচেয়ে দূরের সীমানা।

সত্যিই ব্যাপারটা অলৌকিক: সাইবেরিয়ার বরফ-ঢাকা গিরিবর্ত্মে বসে আমি আফ্রিকার স্বপ্ন দেখছিলাম। তারপর সেইখানেই পেয়ে গেলাম এই জায়গাটা, বহুকাল আগে এ জায়গা আফ্রিকারই অংশ হয়ে উঠেছিল। এখনো তা একেবারে নষ্ট হয়নি। কিন্তু এই জন্তুর ছবি এঁকে রেখে গেছে যারা, তারা কে? যদি তুষার যুগের আগেকার হয় তবে খুবই প্রাচীন জাতি বলতে হবে। গুহার ছবি দেখে বোঝা যায় তাদের সভ্যতাও ছিল খুব উঁচু দরের। সাইবেরিয়া বা সোভিয়েত ইউনিয়নের আর কোথাও এ জাতীয় ছবি পাওয়া যায়নি। গোলপোস্টের মতো দেখতে ঐ রহস্যময় পাথরের গড়নগুলো মধ্য আর পূর্ব আফ্রিকায় প্রায়ই দেখা যায়। ঠিক এই নির্ভীক হাতি শিকারী আর দক্ষ শিল্পীরাও আফ্রিকার পলাতক জন্তুদের পিছন পিছন উত্তুরে দেশে চলে এসেছে।

এই আবিষ্কারে অভিভূত হয়ে গেলাম। তা সত্ত্বেও অন্যান্য অনুসন্ধানীদের মতো আমিও এর একটা যুক্তিযুক্ত কারণ খুঁজে বের করার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলাম। ধীরে ধীরে আমাদের আবিষ্কারের প্রকৃত গুরুত্ব আমার কাছে ধরা পড়ল। তুষার যুগ একটি কি একাধিক এই পুরনো বিতর্কের এর ফলে অবসান হওয়া উচিত। কোয়াটার্ণারি পর্বে সাইবেরিয়ার এই অঞ্চলের

ইতিহাস আর মানুষের বয়স সম্বন্ধে ভূবিজ্ঞানীদের পুরনো মত এবার ফিরে বিচারের প্রয়োজন হবে। জীবের দেশবিভাগ আর বর্তমান ভূচর জীবের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রাণিবিদদের প্রচলিত ধারণাও এর ফলে পাল্টে যাবে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে মধ্য সাইবেরিয়ার সবচেয়ে প্রাচীন জাতির সন্ধান আমরা পেয়েছি। এতদিন শুধু পশ্চিমে আর দক্ষিণে যে উপজাতিদের সন্ধান পাওয়া গেছে, এখন হঠাৎ জানা গেল এরা হচ্ছে তাদেরই সমসাময়িক, হয়ত সগোত্রও। অল্প কয়েকটি পর্যটক অসীম কষ্ট সহ্য করে, বরফ-ঢাকা পাহাড়ের কঠোর হিমের মধ্যে দিয়ে সাহসের সঙ্গে এই যে আবিষ্কার করল, পণ্ডিতরা এখন বহুদিন ধরে এ নিয়ে মাথা ঘামাবেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই ...

নিঃশব্দে আমরা নদীর দিকে নামতে লাগলাম। আবিষ্কার সম্বন্ধে আলেক্সান্দ্রভ আমার মত জিজ্ঞেস করতে আমার সিদ্ধান্ত তাকে জানালাম। আলেক্সান্দ্রভও সায় দিয়ে বলল:

'আমারও মনে হয়েছে এখানকার ভূত্বকের রূপান্তরের চেয়ে ঐ হাড় আর ছবিগুলো পুরনো। এমনকি তুষার যুগের চাইতেও। চূণাপথেরের ভিতর দিয়ে জল গিয়ে গিয়ে গুহার গহ্বর সৃষ্টি হয়েছে। এত উঁচুতে আর কোথাও এত জল পাবে না! প্রায় পঞ্চাশ হাজার বছর আগে এই বিরাট অঞ্চলটা ভূত্বকের আন্দোলনের ফলে উপরে উঠে গিয়ে জমে যায়। তারপর বহুভাগে ফেটে যায়। তার ফলে কোথাও কোথাও দেখা দেয় পাহাড়, কোথাও কোথাও খাদ। আমরা যে গলেৎসটা আবিষ্কার করলাম — প্রাচীন পাহাড়ের একটা অংশ সেটা — অন্য গলেৎসের তুলনায় এ গলেৎসটা খুব বেশি উঁচুতে ওঠেনি, তাই জমেও যায়নি, ক্ষয়ও হয়নি। সেই সঙ্গে আবার তেমন নিচুতেও নামেনি যাতে হিমবাহের জঞ্জাল বা নুড়িপাথরের তলে চাপা পড়ে যেতে পারে। তাই সবকিছু এরকম অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। আবহাওয়ার বদল না হলে ...'

আমাদের এই জ্ঞান-গম্ভীর আলোচনা এখানেই শেষ করতে হল। কারণ রাত হয়ে গেছে, এখন রাস্তার দিকেই পুরো মন দেওয়া দরকার। গিরিবর্ত্মের মুখের কাছে এসে যে সব ভূবৈজ্ঞানিক নিদর্শন রেখে গিয়েছিলাম সেগুলো নিয়ে নিলাম। তারপর প্রবেশ করলাম ঘোর অন্ধকারের মধ্যে। আমি অনেক

বেড়িয়েছি, কিন্তু সেই রাত্রে কিভেতা গিরিবর্ত্মে যে দুরবস্থায় পড়েছিলাম তেমন আর কখনো পড়িনি। থেকেই থেকেই বরফ-ভাঙা জলে পড়ে যাই, আর স্নোবুটের বরফ ক্রমেই ঘন হতে থাকে। কাঁধের ভারী থলে নিয়ে মসৃণ পিছল বরফের উপর দিয়ে কোন রকমে একটু একটু করে এগচ্ছি। জমাট জলপ্রপাতের উপর পড়ে গিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছি। কিছুক্ষণ পরে আমাদের জামাকাপড়েও বরফ জমল। এই ভাবে কত মাইল চলেছি জানি না। এখন আগুন জেবলে অনেকক্ষণ জিরিয়ে না নিলে নির্ঘাৎ মৃত্যু। কিন্তু আগুন ধরাবার উপায় নেই — চারদিকে শুধু পাথর আর বরফ।

হঠাৎ মোমবাতির কথা মনে পড়ল। ভাগ্যিস টুকরোটা ফেলে দিইনি! নিস্পন্দ বাতাসে মোমবাতিটা ঠিক ঘরের মতোই জবলবে। বহুকষ্টে জমে-যাওয়া পলতেটাকে ধরান গেল। দুজনে পালা করে মোমবাতিটাকে মাথার উপরে তুলে ধরে এগতে লাগলাম। কিভেতার জমে-যাওয়া জলপ্রপাতগুলো পেরতে আগের মতো কষ্ট আর হল না। সাবধানে গড়িয়ে নেমে পড়া গেল। মোটা মোমবাতির টুকরোটা প্রায় ঘণ্টাখানেক জবলল। আবার যখন অন্ধকারে পড়লাম তখন অবশ্য গিরিবর্ত্মটা প্রায় শেষ করে এনেছি।

গলেৎসের মাথায় চাঁদ। আমাদের অনেক উঁচু কালো সুরঙ্গটার ডানপাশে তার আলো পড়েছে। অনেকক্ষণ পর কালো দেয়ালগুলো পেরিয়ে রুপোলি বরফ-ঢাকা মাঠে এসে পেঁছিলাম। আর মাইল আড়াই পথ গেলেই তাঁবুতে পেঁছিব। কিন্তু ধারে কাছে কোন গাছপালা নেই। তার মানে এখানেও জিরনো যাবে না। সিকি মাইলেরও বেশি পার হবার পর হঠাৎ আমার বুক ধড়ফড় সুরু হল। হৃৎপিণ্ডটার উপর দিয়ে ধকলও কম যায়নি। দুর্গম পথ। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা –৬০° শীতের মধ্যে কাটাতে হয়েছে ভেজা ভারী জামাকাপড় পরে। পিঠে আবার ভারী মাল। গিরিবর্ত্ম পেরতে অমানুষিক কষ্ট করতে হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হল কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসে স্বচ্ছন্দে নিঃশ্বাস নিতে পারা যায়নি। তাই আলেক্সান্দ্রভ আর আমার মতো শক্তসমর্থ লোকও যে শেষ পর্যন্ত কাহিল হয়ে পড়বে, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই ...

যন্ত্রপাতি আর নমুনার থলেটা এখানেই রেখে যাওয়ার কথা বলতে আলেক্সান্দ্রভ একমুহূর্তে রাজী হয়ে গেল।

মচমচ করে বরফ ভেঙে আমরা ধুঁকতে ধুঁকতে এগিয়ে চললাম। বেশির

ভাগ সময়েই চুপ করে থাকি, মাঝে মাঝে কেবল উৎসাহ দেবার জন্য দুয়েকটা কথা বলি। আরো মাইলখানেক গিয়ে আলেক্সান্দ্রভ আর পারল না। মাটিতে বসে পড়ে ধুঁকতে লাগল।

নিজের দুর্বলতার বিরুদ্ধে লড়াই করে তার কাছে এগিয়ে গেলাম। ওঠার জন্য তাকে অনেক করে বোঝাতে লাগলাম। আলেক্সান্দ্রভ খালি বলে, মরি মরব, তাই সই, আর হাঁটতে পারছি না। কোনরকমে তো তাকে তোলা গেল। কয়েকশ পা গিয়ে আমার এবার মনে হতে লাগল, আর পারছি না। জোর করে গুণে গুণে আরো শদুয়েক পা এগলাম, তারপর আরো একশ — অবশেষে, আলেক্সান্দ্রভের মতোই বরফের উপর পড়ে গেলাম।

সঙ্গে সঙ্গে এক সুন্দর শান্তি আমায় ছেয়ে ফেলল। ঘুম, ঘুম — এছাড়া আর কিছুই তখন আমি চাই না। ঘুম মানে যে এখানে মৃত্যু তা মনে পড়ল কিন্তু সে ভাবনাকে জোর করে মন থেকে তাড়িয়ে দিলাম। এমনকি অত্যন্ত জোরে জোরে পা ফেলার শব্দে বিরক্তও হলাম... আলেক্সান্দ্রভ ফিরে এল। সেই সঙ্গে ফিরে এল প্রাণ, আবার উঠে হাঁটতে সুরু করার ভীষণ প্রয়োজন। কাঁধে কাঁধ দিয়ে কতদূর হাঁটলাম মনে নেই। তখন আর একে অন্যকে ছেড়ে এতটুকু তফাৎ হবার সাহস নেই, বিশ্রামের কথা মনে আনতেও তখন ভয় ...

বরফের নিচে লুকনো একটা কাঠি বা ডালে পা পড়ল। ডালটার ভেঙে যাওয়ার প্রবল আওয়াজ আমার অসাড় মস্তিষ্ক ভেদ করে সাড়া তুলল। সবকিছু মনে পড়ে গেল: ধ্বংসের ভীষণ গর্জন, গত রাত্রের রহস্যজনক অতিথির পায়ের শব্দ, আলেক্সান্দ্রভের থপ থপ চলার আওয়াজ। আমি দাঁড়িয়ে পড়লাম। বাকলের মতো শক্ত দস্তানাটা খুলে পিস্তলটা বের করলাম। সাধারণ ব্রাউনিং পিস্তলটা কামানের মতো গর্জন করে উঠল। উপত্যকা বেয়ে সে আওয়াজ দূরে চলে গেল। আরো কয়েকবার পিস্তল ছুঁড়লাম, অবশেষে দূরে চীৎকার আর তার প্রতিধ্বনি শোনা গেল। বহুকষ্টে মুঠো খুলে পিস্তলটা পকেটে ঢোকালাম। তারপর হাঁটু গেড়ে বসে পড়লাম আলেক্সান্দ্রভের পাশে।

একটু ঘুম ধরে এসেছিল, এমন সময় একটা শব্দ শুনে চেয়ে দেখি আলেক্সেই আর ইয়াকুৎরা দৌড়ে আসছে। আমার গুলির আওয়াজ শুনেই তারা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে। আলেক্সেই গরম চায়ের ফ্লাস্‌ক্‌ আর ভদ্‌কার বোতলটা বাড়িয়ে দিল। তারপর ওরা ধরাধরি করে আমাদের তাঁবুতে ফিরিয়ে

আনল। জামাকাপড় কিছু না ছেড়েই আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম। কিছু পরেই আলেক্সেই আমাদের টেনে তুলে জোর করে কিছু খাইয়ে দিল। তারপর শুইয়ে দিয়ে আমাদের ভালভাবে মুড়েটুড়ে দিল।

পরদিন সকালে আমরা আবার চাঙা হয়ে উঠলাম। খাবার দাবার খুবই কমে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গেই রওনা হব ঠিক করাতে ইয়াকুৎরা ভারী খুসি হল। এমনকি নমুনাগুলো বাছাই করার জন্যও আর অপেক্ষা করলাম না — ফেলে-আসা থলেগুলো ইয়াকুৎরা সূর্যোদয়ের পরেই নিয়ে এসেছে। নববর্ষটা আমরা এর চেয়ে একটু ভাল জায়গায় পালন করতে চাই।

মুখে সলজ্জ হাসি টেনে গাবিশেভ আমার কাছে এগিয়ে এল। আমার স্লেজ বাঁধা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে চুপ করে রইল, তারপর বলল:

'রাত্রে কোন মালিক এসেছিল, তা জানি। কিল্‌চেগাসভও জানে। এখানে খুব জোর শব্দ হয়। আমাদের হরিণ হাঁটছিল!'

হাসতে হাসতে আমার দিকে চোখ ঠেরে গাবিশেভ তার স্লেজের দিকে এগিয়ে গেল।

পুরনো স্লেজপথ ধরে ফিরতে বেশি সময় লাগল না। ১৯৩৬ সালের নববর্ষের দিন আমরা চারা উপত্যকার কাছে এসে পৌঁছলাম। আমার হরিণ বেশ সহজেই কিল্‌চেগাসভের স্লেজের পথ ধরে এগিয়ে চলল। আলেক্সেই তখন একটা বিষণ্ণ গান গেয়ে চলেছে। গানটার বিষয় হচ্ছে, "এক বোদাইবো সোনা-অনুসন্ধানী ভীষণ শীতের মধ্যে দিয়ে ভিতিম নদী ধরে এগচ্ছে।" আমার স্লেজটা লাফাতে লাফাতে ছুটে চলেছে। সূর্যের আলো ওদিকে খুশ মেজাজে বরফ-জমা নদীর সাদা রেখার উপরে ঝলমল করছে।

দেনি-দের

য়েক বছর আগে উত্তর কাতুনের বাঁ তীরে লিস্‌ৎভিয়াগা পাহাড় আর মধ্য আলতাইয়ের অংশবিশেষে আমায় প্রধানত সোনার সন্ধানে ঘুরতে হয়েছিল। সেটা ছিল গ্রীষ্মকাল। তেমন উল্লেখযোগ্য কোন সঞ্চয়ের সন্ধান না পাওয়া গেলেও আলতাইয়ের দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম।

যাত্রাপথে প্রথমটা উল্লেখযোগ্য কিছুই চোখে পড়েনি। লিস্‌ৎভিয়াগা পাহাড়টা তুলনায় ছোটই বলা যায়। সারা বছর বরফ থাকে না। হিমবাহ, পাহাড়ে হ্রদ বা দুর্লঙ্ঘ্য চূড়া, যা নিয়ে বড় পাহাড়ের মনোমুগ্ধকর রংদার শোভা, এর তা কিছুই নেই, তবে নদীর ঐ বিস্তৃত জলা উপত্যকায় অনুসন্ধানের একঘেয়ে জীবনে একটি আনন্দ ছিল। সে হল গলেৎসগুলোর রুক্ষ সৌন্দর্য। ছেঁড়াখোঁড়া তাইগায় নগ্ন, পাথুরে পিঠ উঁচিয়ে বড় বড় গলেৎস দাঁড়িয়ে আছে, চারপাশে তাদের পাহাড়ের ঘের।

উত্তরের প্রকৃতির কঠোর গাম্ভীর্য আর রঙের স্বল্পতা আমার ভাল লাগে। আরো ভাল লাগে বোধহয় তার আদিম নিঃসঙ্গতা আর দুর্বার বন্যতার জন্যই। তাই এর বদলে দক্ষিণের জমকাল রঙের খেলা আমি চাই না। প্রত্যেক আবিষ্কারকের মতো আমারও যখন সহুরে জীবন অসহ্য মনে হয় তখন খোলা প্রান্তরের স্বাধীনতা আর ধূসর পাথরের স্বপ্নের জন্য প্রাণ কেঁদে ওঠে। মন কেড়ে নেয় রুপোলি সমুদ্র, বাতাসে বিধ্বস্ত লার্চের বিরাট বিরাট গুঁড়ি, কালো ফার বনের অন্ধকার গভীরতা...

মোট কথা, চারপাশের দৃশ্যে আমি কখনো ক্লান্তি বোধ করিনি। বেশ মন দিয়ে কাজ করে গেছি।

সোনার সন্ধান ছিল আমার আসল কাজ কিন্তু সেই সঙ্গে এস্‌বেস্‌টসের খোঁজও করতে হয়েছিল। কাতুনের মাঝামাঝি অঞ্চলে চেমাল নামে একটা বড় গ্রাম। সেখানে খুব ভাল জাতের এস্‌বেস্‌টসের সঞ্চয় আছে। আলতাইয়ের সবচেয়ে উঁচু পাহাড় কাতুন পাহাড়ের তল দিয়ে উত্তর কাতুনের তীর ধরে চেমালের দিকে একটা পথ গেছে। সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত পথ। উইমন গ্রামে পোঁছনর পর আমায় তেরেক্‌তিনস্ক পাহাড়ের চিরতুষার পার হতে হল। তারপর ওন্‌দুগাই পার হয়ে আবার কাতুন উপত্যকায় এসে পড়লাম। খুব তাড়া ছিল তাই প্রতিদিন মাইলের পর মাইল হাঁটতে হচ্ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও আলতাইয়ের সৌন্দর্যে অভিভূত না হয়ে পারিনি।

একটা ঘটনা আমার স্পষ্ট মনে আছে। আমার ছোট্ট ক্যারাভান নিয়ে বহুকষ্টে এক উর্মান পার হয়ে — উর্মান হচ্ছে ফার দেবদারু আর লার্চের ঘন বন — কাতুন উপত্যকায় নেমেছি। সামনে অনেকটা জায়গা জুড়ে ভীষণ কাদা। শ্যাওলার সবুজ গালিচায় ঢাকা ঘোলাটে কাদা জলে ঘোড়াদের তো

ডুবে যাওয়ার মতো অবস্থা। প্রাণপণ চেষ্টায় অল্প অল্প করে এগচ্ছি। কাতুনের ডান তীরটা সেদিন রাত্রেই পার হতে হবে বলে রাত্রে আর থামিনি।

পাহাড়ের উপরে চাঁদ সেদিন বেশ আগেই দেখা দিল। তার আলো পথ দেখার পক্ষে যথেষ্ট। নদীতীরে পেঁছিতে স্বাগত জানাল খরস্রোতের একটানা মর্মর। চাঁদের আলোয় কাতুনকে খুব চওড়া মনে হল। কিন্তু পথপ্রদর্শকের পিছন পিছন ঘোড়ায় চড়ে তার কালো জলে নামতে দেখা গেল নদীটা মাত্র হাঁটু পর্যন্ত গভীর। অপর তীরে পেঁছিতে এতটুকু কষ্ট হল না। নুড়ি ছড়ান নদীতীর পার হয়ে আবার কাদায় এসে পড়লাম। এ কাদাকে সাইবেরিয়ার লোকে "কারাগাইনিক" বলে। তার নরম শ্যাওলার গালিচার উপর যত্রতত্র ছড়িয়ে আছে সরু ফারগাছ। উঁচু উঁচু ঢিবিগুলো ভরে গেছে মর্মরশব্দ তোলা রুক্ষ সেজ ঘাসে। আরো এগিয়ে যাওয়াই ঠিক করলাম কারণ এ জায়গায় ঘোড়াদের খাবার উপযোগী ঘাস জুটবে না।

ঢালু দেখে বোঝা গেল শুকনো জমি আসছে। পায়ে চলা পথটা ফার বনের বিষণ্ণ অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। ঘোড়ার পা ডেবে যেতে লাগল শ্যাওলায়। এই ভাবে আরো ঘণ্টা দেড়েক পথ চলার পর বন পাৎলা হয়ে এল। ফারের বদলে দেখা দিল দেবদারু। শ্যাওলা একেবারেই অদৃশ্য। কিন্তু চড়াইটা হয়ে উঠল আরো খাড়া। সারা দিনের প্রচণ্ড পরিশ্রমের পর ঘণ্টা দুয়েক ধরে চড়াই বেয়ে উঠতে প্রাণ বেরিয়ে গেল। উপরের পাথুরে মাটিতে তাই যখন ঘোড়ার পায়ের খটাখট শব্দ আর স্ফুলিঙ্গ উঠল তখন সবাই ভারী খুসি হলাম। ঘোড়ার ঘাস আর তাঁবু ফেলার শুকনো জায়গা, দুইই পাওয়া গেল। সময় নষ্ট না করে আমরা তাড়াতাড়ি ঘোড়ার পিঠ থেকে মালপত্র নামিয়ে বিরাট বিরাট দেবদারুগাছের নিচে তাঁবু খাটিয়ে ফেললাম। নিয়ম মাফিক বালতিখানেক চা আর পাইপ খেয়ে আমরা ঘুমিয়ে পড়লাম।

কড়া রোদে ঘুম ভেঙে যেতে আমি তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। তাঁবুর মুখের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে বিরাট বিরাট দেবদারু, বাতাসে দুলছে তাদের ঘনসবুজ ডালপালা। বাঁয়ে সকালের গোলাপী আলোয়, দুটো লম্বা গাছের ফাঁকে যেন ফ্রেমে মোড়া চারটে বরফ-ঢাকা পাহাড় চূড়ার ক্ষীণ রেখা। চারদিক অত্যন্ত পরিষ্কার। বরফ-ঢাকা পাহাড়ের খাড়া গা বেয়ে ঝরে পড়ছে লালের সবরকম বর্ণালি। একটু নিচে ফিকে নীল হিমবাহের বুকে ছড়িয়ে

পড়েছে দীর্ঘ বাঁকা ঘননীল ছায়া। এই নীল পাদদেশের ফলে আরো মনে হচ্ছে পাহাড়টা যেন মাটির উপর ভেসে আছে। পাহাড়ের ভিতর থেকে যেন আলো জ্বলে উঠেছে। পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে আকাশটা যেন সোনালী সমুদ্র।

কয়েক মিনিট কাটল। সূর্য আরো উপরে উঠেছে। তার সোনালি রঙে লালের মিশেল ঘটেছে। পাহাড় চূড়ার গোলাপী রং হারিয়ে গেছে নীলে। হিমবাহ হয়ে উঠেছে উজ্জ্বল রুপোলি চাদর।

ঘোড়ার গলার ঘণ্টাগুলো টুংটাং করে বেজে চলেছে। কুলীরা মাল তোলার জন্য ঘোড়াগুলোকে তৈরী করছে। জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদায় তারা ব্যস্ত। কিন্তু আমি তখনো আলো আর রঙের মায়ায় মুগ্ধ। তাইগা পথের সংকীর্ণ দৃশ্য আর গলেৎস তুন্দ্রার বন্য রুক্ষতার পর স্বচ্ছ আভা আর আলোর খেলার এ যেন এক নতুন জগৎ।

দেখতেই তো পাচ্ছেন, এ হচ্ছে একেবারে প্রথম দর্শনেই মজে যাওয়া। আলতাইয়ের তুষারের প্রতি আমার এই ভালবাসা যে ব্যর্থ হল তা নয়। নতুন নতুন ছাপ মনের উপর পড়তে লাগল। পাহাড়ে হ্রদের স্বচ্ছ নীল বা পান্না রং জলের বর্ণনা দেবার চেষ্টা করব না। নীল বরফের দীপ্তির কথাও না। কেবল এইটুকুই বলব যে বরফ-ঢাকা পাহাড়ের দৃশ্য আমায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি অত্যন্ত সচেতন করে তুলল। সুরবিস্তারের মতো আলো ছায়া, রঙের সেই নানা নক্সা যেন এক সুন্দর সুষমার জগৎ গড়ে তুলেছে। আমি সাধারণ মানুষ, কিন্তু পাহাড়ে দৃশ্য আমারও দেখবার ক্ষমতা আর অনুভব করার শক্তি বাড়িয়ে দিল। তার ফলেই সম্ভব হল এই আবিষ্কার যার কথা আপনাদের আজ বলতে বসেছি।

পাহাড়ে অঞ্চল পার হয়ে আবার কাতুন উপত্যকায় নামতে হল। সেখান থেকে গেলাম উইমন স্তেপে — সমান একটা নিচু মাঠ, তাতে চমৎকার ঘাস গজিয়েছে। তেরেকতিনস্ক পাহাড় পরীক্ষা করে ভূবিদ্যার দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য কিছুই পাওয়া গেল না। ওন্দুগাইয়ে পৌঁছনমাত্র আমাদের সংগ্রহ আর যন্ত্রপাতি দিয়ে আমার সহকারীকে পাঠিয়ে দিলাম বিইস্কে। যতদূর সম্ভব কম জিনিসপত্র নিয়ে চেমাল এস্‌বেস্‌টস সঞ্চয়ে যাওয়াই আমার উদ্দেশ্য। পথপ্রদর্শক আর আমি নতুন ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলাম।

কাতুনে পৌঁছতে বেশি সময় লাগল না। বিশ্রামের জন্য আমরা কায়ান্‌চা গ্রামে আশ্রয় নিলাম।

বাগানে একটা সদ্য তৈরী সাদা টেবিল পাতা। সুগন্ধ মধু দেওয়া চায়ের পাত্র নিয়ে তার চারদিকে আমরা অনেকক্ষণ বসে রইলাম। পথপ্রদর্শকটি জাতে ওইরত, বিষণ্ণ গম্ভীর প্রকৃতির লোক। সে এক মনে তার তামা বাঁধান পাইপ ফুঁকে চলল। আমি গৃহস্বামীকে চেমালের পথঘাট সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন করে চললাম। গৃহস্বামী ইস্কুল মাস্টার, বয়স খুবই কম, রোদে পোড়া মুখে সরলতার ছাপ। আমার সব প্রশ্নেরই সে বেশ সস্নেহে উত্তর দিল। শেষকালে বলল, 'ভাল কথা, কমরেড ইঞ্জিনিয়ার। আপনাদের পথে একটা গ্রাম পড়বে, চেমাল থেকে খুব বেশি দূরে নয়। আমাদের বিখ্যাত শিল্পী চরোসভ সেখানে থাকে — চরোসভের কথা শুনেছেন বোধ হয়। বদমেজাজী বুড়ো, কিন্তু আপনাকে একবার পছন্দ হয়ে গেলে পর সবকিছু দেখিয়ে দেবে। অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি চরোসভ এঁকেছে।'

তম্‌স্ক আর বিইস্কে চরোসভের যে সব ছবি দেখেছিলাম তাদের কথা মনে পড়ল, বিশেষ করে "কাতুনের মুকুট" আর "খান আল্‌তাই" ছবি দুটি। চরোসভের স্টুডিওতে বসে তাঁর ছবি যদি দেখতে পাই, বলা যায় না হয়ত একটা স্কেচ পেয়েও যেতে পারি, তাহলে আলতাইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয়ের শেষ পর্বটা অত্যন্ত আনন্দের হয়ে উঠবে।

পরদিন বিকালবেলা একটা চওড়া গিরিবর্ত্মে এসে পড়লাম। তার ঢালুতে একঝাড় লার্চগাছের নিচে দেখা গেল কয়েকটা নতুন তৈরী বাড়ি। চকচকে ফিকে হলদে রঙের কাঠ দিয়ে তাদের দেয়ালগুলো তৈরী। কায়ান্‌চার ইস্কুল মাস্টারের বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে গেল। আমি সোজা শিল্পীর বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলাম।

ভেবেছিলাম খিটখিটে এক বুড়োর দেখা পাব। কিন্তু বারান্দায় একটি চটপটে, রোগা, পরিষ্কার করে দাড়ি কামান, সপ্রতিভ, ক্ষিপ্র ভঙ্গীর লোককে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। হলদেটে মঙ্গোলীয় মুখটা ভাল করে নজর করে দেখে তবে তার কদম ছাঁট চুল আর খাড়া খাড়া গোঁফে কিছু পাকা চুল দেখা গেল। গালের হাড়দুটো বের করা। বসে-যাওয়া গালদুটো আর উঁচু, বেরিয়ে-আসা কপালটা বলি রেখায় ভরা।

ভদ্রলোক আমায় বেশ ভদ্রভাবেই নমস্কার করলেন, কিন্তু তাতে কেমন উৎসাহের অভাব দেখা গেল। আমিও তাই একটু অস্বস্তির সঙ্গেই তাঁর পিছন পিছন ঘরে ঢুকলাম।

আলতাইকে নিয়ে আমার আকুলতা চরোসভের বোধ হয় আন্তরিক বলেই মনে হল, ক্রমশ ভদ্রলোক বেশ বন্ধুভাবাপন্ন হয়ে উঠলেন। আলতাইয়ের সবচেয়ে সুন্দর জায়গাগুলোর অল্পের মধ্যে চমৎকার করে যে বর্ণনা তিনি দিয়েছিলেন তা আজও আমার স্মৃতিতে গাঁথা হয়ে আছে — ভদ্রলোকের দেখবার ক্ষমতা অসীম।

লম্বা লম্বা জানলাওয়ালা মস্ত বড় স্টুডিওতেই বাড়ির আধখানা ভরে গেছে। স্টুডিওর দেয়ালে কোন রঙিন কাগজ নেই। তাঁর অজস্র স্কেচ আর ছোট ছোট ছবির মধ্যে একটি ছবি বিশেষভাবে নজরে পড়ল। চরোসভ বললেন "দেনি-দের"("পাহাড়ী প্রেতাত্মার হ্রদ") নামে তাঁর একটা বড় ছবি আছে, এটা তারই কপি। মূল ছবিটা রয়েছে সাইবেরিয়ার কোন এক মিউজিয়ামে। ছবিটার বিস্তৃত বর্ণনা দেব, কারণ এ গল্পে ছবিটার খুব বড় ভূমিকা আছে।

সূর্যাস্তের আলোয় ছবির উজ্জ্বল রং যেন সজীব হয়ে উঠল। ছবির মাঝখানে নিস্তব্ধ ঘুমের ঘোরে শুয়ে আছে মসৃণ, ঠাণ্ডা, নীলচে ধূসর হ্রদটা। সামনে সমান তীরভূমির পাথরের মাঝখানে পড়ে আছে মস্ত একটা দেবদারুর গুঁড়ি, সেখানে সবুজ ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে চোখ ধাঁধান বরফের ছটা। দেবদারুর গুঁড়ির শিকড়ের কাছে ফিকে নীল বরফের মস্ত এক চাপ। হ্রদের বুকে ছোট ছোট জমাট বরফ আর মস্ত ছাইরঙা পাথরের ছায়া পড়েছে। সে ছায়া কোথাও সবুজ, কোথাও বা নীলচে ধূসর। হাওয়ায় বিধ্বস্ত দুটো বেঁটে দেবদারু গাছ তাদের ন্যাড়া ডালপালা উপরে মেলে দিয়েছে, যেন আকাশে হাত তুলে ভিক্ষা চাইছে। পিছনে বরফ-ঢাকা খাড়া পাহাড়গুলো জলের উপর এসে পড়েছে, গায়ে তাদের বেগনী আর ফিকে হলুদ রঙের পাথর। ছবির মাঝখানে হ্রদের ভিতর ঢুকে গেছে হিমবাহের নীল বরফ-খণ্ড। বাঁয়ে একটা খুব উঁচু, তেকোণা, হীরার মতো উজ্জ্বল পিরামিড, চূড়ায় যেন তার উড়ন্ত পতাকা — আসলে সেটা গোলাপী মেঘের রেখা। হিমবাহ উপত্যকার বাঁ ধারে রয়েছে একটা সরু পাহাড়, সেটাও বরফের জোব্বায়

মোড়া, কেবল ছাড়া ছাড়া ফিকে হলুদ ছোপে তার পাথুরে গায়ের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। পাহাড়টার চওড়া পাদদেশ মস্ত মস্ত পাথুরে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে হ্রদের সবচেয়ে দূরের প্রান্তে নেমে এসেছে।

কাতুন পাহাড়ের যে নির্লিপ্ত স্নিগ্ধ উজ্জ্বল সৌন্দর্যে আমি এত মুগ্ধ হয়েছিলাম ছবিটিতে তা চমৎকার ধরা পড়েছে। আলতাইয়ের তুষারের প্রতিকৃতিটির দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলাম। যারা এই হ্রদের নাম দিয়েছে দেনি-দের বা পাহাড়ী প্রেতাত্মার হ্রদ, তাদের বোধ শক্তির পরিচয় পেয়ে বিস্মিত হলাম।

'হ্রদটা কোথায়? সত্যিই কি এরকম হ্রদ আছে?' অনেকক্ষণ পর জিজ্ঞেস করলাম।

'আছে। আসল হ্রদটা আরো সুন্দর একথা স্বীকার করতেই হবে। তবে হ্রদের প্রাণটা আমি ধরতে পেরেছি। এ গর্ব আমি করতে পারি। ওখানে যাওয়া খুব সহজ ব্যাপার নয়। যাওয়া যায় ... কিন্তু আপনি সেখানে কী করতে যাবেন?' চরোসভ বললেন।

'এত সুন্দর বলে। হ্রদটাকে দেখার জন্য প্রাণের ঝুঁকি নিতেও রাজী আছি।'

চরোসভ ভাল করে আমায় দেখে নিলেন। 'বেশ বলেছেন: "প্রাণের ঝুঁকি।" ওইরৎদের মধ্যে এই হ্রদটাকে নিয়ে অনেক গল্প চালু আছে, আপনি বোধহয় সে সব গল্প শোনেননি।'

'নামটা যেমন সুন্দর, তাতে মনে হচ্ছে গল্পগুলোও খুব চিত্তাকর্ষক হবে।'

ছবির দিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে চরোসভ বললেন, 'এখানে অদ্ভুত কিছু দেখছেন কী?'

'হ্যাঁ, বাঁ কোণে, ঐ সরু পাহাড়টার কাছে। কিছু মনে করবেন না, এ জায়গায় অত্যধিক রং লাগিয়েছেন।'

'আরো ভাল করে দেখুন।'

দেখলাম। শিল্পীর দক্ষতা বিস্ময়কর। ছবির দিকে যতই তাকিয়ে থাকি ততই যেন অতল গভীরতা থেকে নানা রূপ ভেসে উঠতে থাকে। সরু পাহাড়টার পায়ের কাছে সবুজে সাদায় মেশান ক্ষীণ উদ্ভাসিত বাষ্প চোখে পড়ল। উজ্জ্বল বরফের ছায়ার উপর দিয়ে তার প্রতিফলন জলের উপর পড়ে

দীর্ঘ ছায়ার সৃষ্টি করেছে, সে ছায়াগুলো আবার কেন জানি না লাল রঙের। পাথরের গায়ে দেখা যাচ্ছে আরো ঘন, রক্তের মতো লাল ছায়া। পাহাড়ের সাদা গায়ে যেখানে যেখানে সূর্যের আলো পড়েছে সেখানে বরফ আর পাথরের উপর দিয়ে উঠে গেছে নীলচে সবুজ ধোঁয়া বা বাষ্পের দীর্ঘ স্তম্ভ, ঠিক যেন মানুষের শরীর। স্তম্ভগুলো দৃশ্যটাকে কেমন যেন ভুতুড়ে আর অলৌকিক করে তুলেছে।

'এগুলো কী বুঝতে পারছি না,' স্তম্ভগুলো দেখিয়ে বললাম।

'তার দরকারও নেই,' চরোসভ কাষ্ঠ হাসি হেসে বললেন, 'প্রকৃতিকে আপনি ভালবাসেন কিন্তু তাকে বিশ্বাস করেন না।'

'পাথরের এই লাল আলো, নীল সবুজ স্তম্ভ আর উদ্ভাসিত মেঘগুলোই বা কী?'

'এরা হচ্ছে পাহাড়ী প্রেতাত্মা।'

চরোসভের দিকে তাকালাম, তাঁর মুখে এতটুকু হাসি নেই।

'না, ঠাট্টা করছি না,' ভদ্রলোক একইভাবে বলে গেলেন, 'কেবল অনৈসর্গিক সৌন্দর্যের জন্যই যে হ্রদটার নাম দেনি-দের তা নয়। হ্রদটা ভূতুড়ে বলেও খ্যাত। এই ছবির জন্য আমার প্রাণ যেতে বসেছিল। ১৯০৯ সালে হ্রদে গিয়েছিলাম, তারপর ১৯১৩ সাল পর্যন্ত আমায় অসুখে পড়ে থাকতে হয়েছে।'

হ্রদের গল্পগুলো শুনতে চাইলাম। ঘরের কোণে মঙ্গোলীয় কম্বলে ঢাকা একটা মস্ত সোফার উপর আমরা বসেছি। সামনেই দেখা যাচ্ছে "দেনি-দের"।

চরোসভ বলতে সুরু করলেন:

"এই হ্রদের সৌন্দর্যে বহুকাল ধরেই লোকে আকৃষ্ট। কিন্তু তার তীরে যারাই এসেছে তারাই কোন এক অতিপ্রাকৃত শক্তির হাতে মারা পড়েছে। আমিও বিপদে পড়েছিলাম, কিন্তু সে অন্য কথা। আশ্চর্যের কথা গ্রীষ্মের গরম দিনেই হ্রদটা সবচেয়ে সুন্দর হয়ে ওঠে। হত্যার ক্ষমতাও তখন তার সবচেয়ে বেশি। পাথরের বুকের ঐ রক্ত লাল আলো আর কম্পিত নীলচে সবুজ স্তম্ভ চোখে পড়া মাত্র এক অদ্ভুত অনুভূতি দেখা দেয় লোকের মনে। চারপাশের বরফ-ঢাকা পাহাড় চূড়াগুলো তাদের ঘাড়ের উপর যেন চেপে বসে। চোখের সামনে পাগলের মতো নেচে ওঠে আলো। গোল, সরু পাহাড়টা যেন

হাতছানি দিয়ে ডাকতে থাকে। সেখানে দেখা যায়, উদ্ভাসিত সবুজ মেঘের চারপাশে ঘুরে ঘুরে নাচছে নীলচে সবুজ পাহাড়ের অশরীরী প্রাণী। কিন্তু সেখানে যাওয়া মাত্র সবকিছু অদৃশ্য হয়ে যায়, কেবল প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে থাকে বিষণ্ণ নগ্ন পাথরগুলো। যাত্রীরা তখন হঠাৎ বড় অসহায়, বড় বিপন্ন বোধ করে। হাঁপাতে হাঁপাতে কোন রকমে তারা মারাত্মক হ্রদ ছেড়ে পালায়। কিন্তু পথেই তাদের মৃত্যু ঘটে। এ পর্যন্ত কেবল অল্প কয়েকজন অত্যন্ত শক্তিশালী শিকারী, বহু কষ্ট সহ্য করে, সবচেয়ে কাছের ইয়ুর্তায় পেঁছিতে পেরেছে। তাদেরও কেউ কেউ শেষ পর্যন্ত মারা পড়েছে। অন্যেরা বহুকাল অসুখে ভুগে সাহস আর শক্তি দুইই হারিয়েছে।

"বহুপ্রাচীন কাল থেকেই দেনি-দের হ্রদের দুর্নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। খুব কম লোকেরই সেখানে যাবার দুঃসাহস হয়েছে। এমনকি পশুপাখিরাও হ্রদের ধারে যায় না। বাঁদিকে, যেখানে অশরীরীরা আসে, সেখানে ঘাসও গজায় না।

"গল্পটা শুনেছিলাম ছোটবেলাতেই, তাই এই অশরীরীদের রাজ্য দেখার ইচ্ছে আমার খুবই ছিল। কুড়ি বছর আগে আমি একবার একলা গিয়ে দুদিন হ্রদে কাটিয়ে আসি। প্রথম দিন অস্বাভাবিক কিছুই চোখে পড়েনি, অনেকক্ষণ ধরে দিব্যি ছবি এঁকে চলি। ঘন মেঘ আকাশ ঢেকে আলোর রং বদলে দিয়ে চলেছে, পাহাড়ের স্বচ্ছ আবহাওয়াটা আর কিছুতেই ধরতে পারি না। তাই ঠিক করলাম আরেকটা দিন থেকে যাব। তীর থেকে মাইল খানেক দূরের একটা ছোট্ট গ্রামে রাত কাটালাম। সন্ধ্যার দিকে কেমন শরীর খারাপ লাগতে লাগল: মুখের ভিতরটায় অদ্ভুত রকমের জ্বালা, থেকে থেকেই শুধু থুতু ফেলছি। উঁচুতে উঠলে সাধারণত আমার কিছু হয় না, হালকা হাওয়ায় হঠাৎ এরকম হল কেন বুঝতে পারলাম না।

"পরদিন চমৎকার সকাল হল। বোঝা গেল আবহাওয়া বেশ ভাল হবে। কোনরকমে হ্রদের ধারে গেলাম, মাথাটা তখন ভার হয়ে আছে, কিন্তু ছবি আঁকতে আঁকতে কিছুক্ষণ পরেই সবকিছু ভুলে গেলাম। স্কেচ যখন শেষ হল, তখন সাংঘাতিক কড়া রোদ, পরে ঐ স্কেচকেই আমার ছবির মূল হিসেবে ব্যবহার করি — হ্রদটা শেষবারের মতো একবার দেখে নেবার জন্য ইজেলটা সরিয়ে দিলাম।

"আমার হাত তখন কাঁপছে। ভীষণ ক্লান্ত আর অসুস্থ বোধ করছি। এমন সময় দেখতে পেলাম পাহাড়ের অশরীরীদের। স্বচ্ছ জলের বুকের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে একটা নিচু মেঘের ছায়া। ক্ষণেকের জন্য ঢাকা পড়ার পর সূর্যের আলো মেঘের গা ছুঁয়েছে বাঁকাভাবে, হয়ে উঠেছে আরো উজ্জ্বল। রোদ আর ছায়ায় মিলিয়ে যাওয়া প্রান্তরে হঠাৎ দেখতে পেলাম কয়েকটা নীলচে সবুজ রঙের ভূতুড়ে স্তম্ভ। মনে হল যেন লম্বা চওড়া কয়েকজন লোক জোব্বা পরে দাঁড়িয়ে আছে। স্তম্ভগুলো প্রথমে অনড় হয়ে রইল, তারপর দ্রুতবেগে নড়তে নড়তে শূন্যে মিলিয়ে গেল। আমি স্থিরদৃষ্টে চেয়ে রইলাম, একটা কনকনে ঠাণ্ডা ভয়ে বুক অবশ হয়ে এল।

"মূক দৃশ্যটা কয়েক মিনিট পর্যন্ত রইল। তারপর পাথরের বুকে চমকে উঠল রক্তলাল আলো। সেই অশরীরী ছায়া আর আলোর উপরে দেখা দিল ব্যাঙের ছাতার আকারের মেঘ, তাতে সবুজ আলোর ক্ষীণ ছটা।

"আমি তখন আবার শক্তি ফিরে পেয়েছি, দৃষ্টিও পরিষ্কার আর তীক্ষ্ণতর। দূরের পাথরগুলো যেন কাছে এসে গেছে, তাদের খাড়া গাগুলো পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। তুলিটা তুলে নিয়ে প্রবল বেগে রং লাগাতে সুরু করলাম। চেষ্টা করলাম সেই অসাধারণ ঘটনাটাকে ক্ষিপ্র হাতে ছবিতে ধরে রাখার।

"হ্রদের দিক থেকে একটা ফুরফুরে হাওয়া বইতে সুরু করল। মুহূর্তের মধ্যে মেঘ আর নীলচে সবুজ স্তম্ভগুলো অদৃশ্য হয়ে গেল। কেবল লাল আলোগুলো পাথরের গায়ে অলক্ষুণে ভঙ্গীতে চমকাচ্ছে আর তাদের ছায়া নেচে চলেছে হ্রদের বুকে। আমার উত্তেজনা তখন নিঃশেষ হয়ে এসেছে কিন্তু অসুস্থভাবটা হঠাৎ বেড়ে উঠল। মনে হল, যে-আঙুলগুলো দিয়ে প্যালেট আর তুলি ধরে আছি তার ভিতর দিয়েই আমার প্রাণ ক্রমশ চুঁয়ে চুঁয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। একটা অমঙ্গলের অস্পষ্ট আভাসে মন ভরে গেল। তাড়াতাড়ি জায়গাটা ছেড়ে পালাবার একটা প্রচণ্ড ইচ্ছা দেখা দিল। রঙের বাক্স বন্ধ করে জিনিসপত্র সব গুছিয়ে নিলাম। মাথা আর বুকের উপর তখন মারাত্মক ভার ...

"বাতাস তখন আরো জোরাল। হ্রদের ফিকে নীল স্বচ্ছ আয়নাটা বিপর্যস্ত। পাহাড়ের চূড়াগুলো মেঘে অদৃশ্য। চারপাশের পরিষ্কার রং নিভে এসেছে। হ্রদের সজীব, পবিত্র সৌন্দর্যের বদলে দেখা দিয়েছে বিষণ্ণ গাম্ভীর্য।

অশরীরী প্রেতাত্মারা যে লাল আলোয় নাচছিল সে আলো গেছে নিভে, রয়েছে কেবল কালো পাথর আর সাদা বরফ।

"নিঃশ্বাস নিতে অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছিল। হ্রদের দিকে পিছন ফিরতে বুকের ভিতর জোর সাঁই সাঁই শব্দ সুরু হল। দুর্বলতা আর শরীরের ভীষণ ভারের সঙ্গে যুঝতে যুঝতে আমি যেন দুঃস্বপ্নের ঘোরে পথপ্রদর্শকরা যেখানে আমার অপেক্ষায় বসে ছিল সেদিকে এগতে লাগলাম। আমার সঙ্গে দেনি-দের পর্যন্ত আসতে তারা রাজী হয়নি। পাহাড়গুলো তখন যেন দুলছে। ভীষণ গা গুলচ্ছে, শরীরে আর এতটুকুও শক্তি নেই। থেকে থেকেই পড়ে যাই আর ভীষণ অবসাদে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বসেই থাকি। কী করে যে পথপ্রদর্শকদের কাছে পেঁছলাম তা মনে নেই আর সেটা তেমন কিছু জরুরী ব্যাপারও নয়। আসল কথা হল ছবির বাক্সটা পিঠে করে ঠিক বয়ে এনেছি।

"পথপ্রদর্শকরা দূর থেকেই আমার অবস্থা লক্ষ্য করেছিল। আমায় কোলে করে নিয়ে গিয়ে তারা তাঁবুর ভিতর শুইয়ে দিল, মাথাটা রাখল থলের উপর। 'চরোস, তোমার অবস্থা খুব সঙীন,' পথপ্রদর্শকদের সর্দার নির্বিকারচিত্তে বলল।

"শেষ পর্যন্ত যে মরিনি, তা তো দেখতেই পাচ্ছেন কিন্তু বহুদিন বিছানায় শুয়ে থাকতে হয়েছিল। সবকিছুতেই কেমন একটা বিতৃষ্ণা আর ঔদাসীন্য। তার ফলে কাজ করা কঠিন হয়ে উঠল। "দেনি-দেরের" বড় ছবিটা এক বছর পরে আঁকি। এ ছবিটা বিছানা ছেড়ে ওঠার পর একটু একটু করে এঁকেছি। দেখলেন তো, দেনি-দের হ্রদ আর পাহাড়ের প্রেতাত্মাদের সন্ধান নিতে গিয়ে আমায় কী ভীষণ বিপদে পড়তে হয়েছিল।"

চরোসভ চুপ করে গেলেন। বহু কাচ লাগান বিরাট জানলাটার ভিতর দিয়ে আমি অন্ধকার উপত্যকাটার দিকে চেয়ে রইলাম। চরোসভের গল্পটা মনে গভীর রেখাপাত করল। ভদ্রলোকের কথা অবিশ্বাস করার কোনই কারণ ছিল না। কিন্তু ছবিতে যে ঘটনাটা ধরা পড়েছে তার কোন ব্যাখ্যাও খুঁজে পেলাম না।

খাবার ঘরে এলাম। ভূতুড়ে গল্পটা যে রহস্যের ছায়া ফেলেছিল টেবিলের উপর ঝুলে-থাকা কেরোসিনের উজ্জ্বল আলোয় তা দূর হয়ে গেল। প্রায় নিজের অজান্তেই হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলাম এ অঞ্চলে আবার যদি কখনো ফিরে আসি তবে কোথায় গেলে দেনি-দের হ্রদের সন্ধান পাব।

'আরেকটি শিকার!' চরোসভ হেসে বললেন, 'আমি কিন্তু আগেই সাবধান করে দিচ্ছি, পরে যেন আবার আমায় দুষবেন না। লিখে নিন।'

থলে থেকে খাতা পেন্সিল বের করলাম।

"কাতুন পাহাড়ের পূব প্রান্তে বরফ-ঢাকা চুয়া আর কাতুনের মাঝখানে একটা গভীর গিরিবর্ত্ম আছে, হ্রদটা তার ভিতরে। আগর্ৎ নদীর মোহনা থেকে পঁচিশ মাইল উজানে আগর্তের উপনদী ইয়ুনেয়ুর পর্যন্ত যেতে হবে। জায়গাটা বুঝতে আপনার কোন অসুবিধে হবে না, কারণ এখানে এসে আগর্ৎ হঠাৎ বাঁক নিয়েছে, আর ইয়ুনেয়ুরের মোহানাটা একটা চওড়া উঁচু সমান জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে এসে আগর্তের বাঁ তীর ধরে আরো মাইল চারেক যেতে হবে। তারপর ডানহাতে একটা ছোট্ট জলধারা দেখতে পাবেন, ছোট নদীও বলতে পারেন। উপত্যকাটা এখানে খুব বড়। একেবারে কাতুন পাহাড়ের ভিতরে ঢুকে গেছে। ঐ উপত্যকাটা ধরে এগবেন। জায়গাটা শুকনো, ডালপালা মেলা বড় বড় লার্চগাছে ভরা। খাড়া পাথর আর একটা ছোট্ট জলপ্রপাত পর্যন্ত উঠে যাবেন। তারপরে ডাইনে এগবেন। উপত্যকাটা এখানে সমান আর বিস্তৃত। তার বুকে পর পর পাঁচটা হ্রদ, প্রত্যেকটার মাঝখানে মাইলখানেকের ব্যবধান। উপত্যকাটা যেখানে খাড়া পাহাড়ের সামনে গিয়ে পড়েছে, পঞ্চম হ্রদটা সেইখানে। আর সেইটেই দেনি-দের।

"ব্যস। কেবল গিরিবর্ত্মটা সাবধানে খুঁজে বের করা চাই — বহু উপত্যকা আর হ্রদে ওখানে গোলোক-ধাঁধার সৃষ্টি হয়েছে। ও, একটা ভালো চিহ্ন মনে পড়েছে। যে জলধারাটার কাছে এসে আগর্ৎ ছেড়ে অন্যমুখে যেতে হবে সেখানে একটা ছোট্ট বাদা আছে। তার ধারে দেখতে পাবেন একটা লম্বা মরা লার্চগাছ। ডালপালা নেই, মাথাটা শয়তানের দুমুখো কাঁটার মতো দুভাগে ভাগ করা। গাছটা যদি এখনো দাঁড়িয়ে থাকে তবে জায়গাটা চিনতে অসুবিধা হবে না।"

চরোসভের নির্দেশ সব টুকে নিলাম। পরে যে সেগুলো এত কাজে লাগবে তা তখন বুঝতে পারিনি।

পরদিন সকালে আবার চরোসভের সব ছবি দেখলাম, কিন্তু "দেনি-দেরের" মতো আর একটাও পাওয়া গেল না। বরফ-ঢাকা পাহাড়ের দুটো স্কেচ কিনলাম। কালিতে আঁকা একটা ছোট্ট স্কেচ চরোসভ আমায় উপহার

দিলেন। আমার প্রিয় লার্চগাছের ছবি। গাছগুলোর চরিত্র যে শিল্পী গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন তার পরিচয় ছবিটিতে ফুটে উঠেছে।

বিদায় দেবার সময় চরোসভ বললেন, '"দেনি-দের" ছবিটা আপনার খুবই ভাল লেগেছে, দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু এ ছবিটা তো দিতে পারব না। তার বদলে হ্রদের ধারে যে ছোট্ট স্কেচটা এ'কেছিলাম সেটা আপনাকে দেব। কেবল ...' ভদ্রলোক একটু থামলেন, তারপর আবার বললেন, '...সেকথাটা আমার উইলে লিখে যাব। ঐ স্কেচটাও আমি এখন কিছুতেই প্রাণে ধরে কাছ ছাড়া করতে পারব না। তবে কোন ভাবনা নেই, ছবিটা পেতে আপনার দেরী হবে না। আমার মৃত্যুর পর আপনাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে।' সম্পূর্ণ নির্লিপ্তভাবে চরোসভ বললেন।

আমি তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করে বেরিয়ে পড়লাম। আশা ছিল শীগ্‌গিরই আবার দেখা হবে। কিন্তু সেই আমাদের শেষ দেখা।

আলতাইয়ে ফিরলাম অনেকদিন পর। চার বছরের কঠোর পরিশ্রমের ফলে আমায় কিছুদিন কাজ থেকে বিশ্রাম নিতে হয়েছিল। সাংঘাতিক বাতে ছ'মাস ভুগতে হল, তাইগার লোকেদের পক্ষে বাত একেবারে অনিবার্য। তারপর আবার হৃদযন্ত্রের গণ্ডগোল সুরু হয়।

কাজ না করে বসে থাকতে থাকতে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। শেষকালে দক্ষিণের এক স্বাস্থ্যাবাস ছেড়ে দৌড় মারলাম কুয়াশায় ঢাকা আদরের লেনিনগ্রাদের দিকে। প্রধান ভূতাত্ত্বিক সংস্থা আমায় মধ্য এশিয়ায় সেফিদ্‌কোন পারা সঞ্চয় দেখতে পাঠাল। ভাবলাম তুর্কিস্তানের রোদে ভরা শুকনো আবহাওয়ায় শরীর থেকে বাতের উপসর্গ দূর করে আবার উত্তরের কঠোর নির্জনতায় ফিরে আসব। উত্তরের প্রকৃতিই আমার মন কেড়ে রেখেছে। তার প্রেমে আমি যেন আকুল। বহুকষ্টে সাইবেরিয়ায় ফিরে যাবার প্রবল ইচ্ছাটিকে বশে আনলাম।

একদিন বসন্তকালের সন্ধ্যাবেলায় ঘরে বসে মাইক্রোস্‌কোপ নিয়ে কাজ করছি, এমন সময় ডাকপিয়ন একটা পার্সেল নিয়ে এল। পার্সেল পেয়ে আনন্দের চেয়ে দুঃখই হল বেশি। পালিশ-করা দেবদারু কাঠের একটা ছোট্ট চ্যাপ্টা বাক্স, তার ভিতরে রয়েছে "দেনি-দেরের" স্কেচ। তার মানে শিল্পী চরোসভ মারা গেছেন।

পাহাড়ী প্রেতাত্মার হ্রদটা চোখে পড়তেই নানা স্মৃতি মনে ভীড় করে এল। দূর, দুর্গম দেনি-দেরের সৌন্দর্য আমার মন দুঃখ আর অস্থিরতায় ভরে দিল। মাইক্রোস্কোপ নিয়ে বসে দুঃখটা ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা করলাম। সেফিদকান আকরের একটা নতুন মাটির কণা মাইক্রোস্কোপের সামনে ধরলাম। তারপর বহুদিনের অভ্যাসের ফলে কৌশলের সঙ্গে টিউবাসটা নামিয়ে মাইক্রোমিটার দিয়ে ফোকাসটা ঠিক করে নিলাম। পারদ আকরের পরপর সন্নিবদ্ধ কেলাসন মন দিয়ে নিরীক্ষণ করতে লাগলাম। জিনিসটা ছিল প্রায় বিশুদ্ধ হিঙ্গুলের একটা পাৎলা, মসৃণ চিলতে। তখনও পর্যন্ত জিনিসটার বৈশিষ্ট্য ধরতে পারিনি, কারণ রঙের সূক্ষ্ম বর্ণগুলো ইলেক্ট্রিক আলোয় লুকিয়ে পড়ছিল। অনচ্ছ ইলিউমিনেটরটা বদলে বাঁকা আলোর জন্য একটা সিলভারম্যান লাগিয়ে ডেলাইট বাল্ব জ্বালিয়ে দিলাম। অণুজগতে সূর্যের স্থান পূরণের জন্য এই মৌলিক কায়দাটা খুবই কাজের।

দেনি-দের তখনো আমার মনের চোখে গাঁথা ছিল বলে মাইক্রোস্কোপে নীলের পটভূমিকায় রক্তলাল আলো দেখেও আমি চমকে উঠলাম না। ছবিতে যে আলো দেখে বিস্মিত হয়েছিলাম ঠিক সেই আলোই মাইক্রোস্কোপে দেখা দিল। পরমুহূর্তেই অবশ্য বুঝতে পারলাম আমি ছবির দিকে তাকিয়ে নেই, আমি এখন পারদ আকরের অন্তর্বর্তী রিফ্লেক্সের অনুসন্ধানে ব্যস্ত। মাইক্রোস্কোপের স্টেজটা একটু ঘুরিয়ে দিলাম, রক্তলাল আলোগুলো কাঁপতে সুরু করল। কোন কোনটা ধীরে ধীরে নিভে গেল, কোন কোনটা ঘন লালচে-খয়েরী রঙের হয়ে উঠল। ওদিকে আকরের বেশির ভাগটাই ইস্পাতের মতো জ্বলছে। একটা কথা ভেবে তখন আমি উত্তেজিত। ডেলাইট বাল্বটার আলোটা একবার চরোসভের ছবির উপর ফেললাম। মাইক্রোস্কোপে যে রঙ এক্ষুণি ধরা পড়েছিল সেই রঙই ফুটে উঠল সরু পাহাড়টার পায়ের কাছের পাথরগুলোয়।

তাড়াতাড়ি আমার রঙের তালিকাটা তুলে নিলাম, প্রমাণ হল ... কিন্তু সেকথা এখানে বলার কোন দরকার নেই। রঙের যে সবরকম ঘনত্ব আর বর্ণের চার্ট মিনেরালোগ্রাফি তৈরী করেছে তাতে প্রায় সাতশ রং ধরা আছে। প্রতিটি বর্ণের আলাদা নির্ঘণ্ট আছে। বর্ণের সমষ্টিতে বিশেষ খনিজ দ্রব্যের সূত্র পাওয়া যায়। মোট কথা পাহাড়ী প্রেতাত্মাদের আঁকতে গিয়ে চরোসভ যে রং

ব্যবহার করেছেন রঙের চার্টের সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখলাম। দেখা গেল নানাভাবে, নানা কোণ থেকে আলোকিত, আলোক তরঙ্গের জটিল প্রক্রিয়া থেকে উদ্ভূত অন্যান্য প্রভাবে প্রভাবিত — বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে "আলোক তরঙ্গের ইণ্টারফেরেন্স" বলে — হিঙ্গুলের বর্ণালীর সঙ্গে ছবির রং মিলে যাচ্ছে।

দেনি-দেরের রহস্য আমি ভেদ করেছি। সে রহস্যের সমাধান আলতাইয়েই যে খুঁজে বের করতে পারিনি তার জন্য নিজের উপর বেশ বিরক্ত হলাম।

টেলিফোন করে একটা ট্যাক্সি আনালাম। কিছুক্ষণ পরেই এসে পেঁছলাম একটা বেড়ার ধারে। বেড়াটার ওধারে দেখা যাচ্ছে একটা রসায়ন ল্যাবরেটরীর আলোকিত লম্বা জানলাগুলো। ভাগ্যক্রমে আমার এক পুরনো বন্ধুকে সেখানে পাওয়া গেল। বন্ধুটি রাসায়নিক আর ধাতুবিদ।

'কী খবর হে, সাইবেরিয়ার ভালুক!' আমায় দেখেই সে চেঁচিয়ে উঠল, 'এখানে কী বলে? আবার বুঝি কোন জরুরী এনালিসিসের প্রয়োজন হয়েছে?'

'না, দ্মিত্রি মিখাইলভিচ, আমার কয়েকটা খবরের দরকার। পারার কী কী গুণ বল।'

'পারা তো ৩৭০° সেণ্টিগ্রেডে ফোটে, কত ডিগ্রীতে উপে যেতে সুরু করে সেটা জানা দরকার।'

'যে কোন উত্তাপে, খুব প্রচণ্ড ঠাণ্ডা না হলেই হল।'

'পারা তাহলে উদ্বায়ী?'

'অসাধারণ রকম, মানে তার আপেক্ষিক গুরুত্বের তুলনায়। এই হিসেবটা মনে রেখ: ২০° সেণ্টিগ্রেডে এক কিউবিক মিটার পারদ বাতাসে ০·১৫ গ্রাম, ১০০° সেণ্টিগ্রেডে প্রায় ২·৫ গ্রাম।'

'আরেকটা প্রশ্ন: পারার ধোঁয়ার কি নিজস্ব আলো আছে, থাকলে পর তাদের রং কী?'

'না, নিজস্ব আলো নেই, তবে অত্যন্ত গাঢ় হলে সরে-যাওয়া আলোয় নীলচে সবুজ রং দেখা দেয়। হালকা আবহাওয়ায় বৈদ্যুতিক ডিসচার্জের ফলে পারার ধোঁয়া থেকে সবুজ-সাদা রংও বেরয়।'

'ব্যস, সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেছে। অসংখ্য ধন্যবাদ।'

পাঁচ মিনিট পরেই আমার ডাক্তারের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলাম। আমার গলা শুনেই সহৃদয় বুড়ো ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি বসার ঘরে ছুটে এলেন।

'কী হল? বুকের গণ্ডগোল, আবার?'

'না, না, বুক ঠিক আছে। একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এলাম। পারদ ধোঁয়ার বিষক্রিয়ার প্রধান উপসর্গগুলো কী?'

'পারার বিষক্রিয়ায় খুব বেশি থুতু আসে, বমি হয়। পারার ধোঁয়ার বিষক্রিয়াটা — দাঁড়াও, এক্ষুণি বই দেখে বলছি। এস, ভিতরে এস।'

'ঠিক আছে! আমি এক্ষুণি চলে যাব। আপনি দয়া করে একটু তাড়াতাড়ি করুন, পাভেল নিকোলায়েভিচ।'

ডাক্তার তাঁর পড়ার ঘরে গিয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একটা খোলা বই নিয়ে ফিরে এলেন।

'এই নাও। পারদ ধোঁয়া ... রক্ত চাপ কমে যায়, ভীষণ মানসিক উত্তেজনা দেখা দেয়, নিঃশ্বাস অত্যন্ত দ্রুত হয় আর ঠেকে ঠেকে যায়, শেষ পর্যন্ত — হার্টফেল করে মৃত্যু ঘটে।'

'চমৎকার!' হঠাৎ মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।

'কী চমৎকার! পারার বিষে মারা যাওয়া?'

ডাক্তারের হতভম্ব ভাব দেখে হো হো করে হেসে উঠলাম। তারপর সিঁড়ি বেয়ে ছুটে নেমে গেলাম। আমার অনুমান তবে ঠিক!

বাড়ি এসেই প্রধান ভূতাত্ত্বিক সংস্থায় টেলিফোন করে জানালাম, আমাদের কাজের জন্যই এক্ষুণি আমার আলতাইয়ে যাওয়া দরকার। সংস্থার অধ্যক্ষকে বললাম সঙ্গে ক্রাসুলিনকে নিয়ে যেতে চাই। ক্রাসুলিন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বিভাগের ছাত্র। সুন্দর শরীর, প্রখর বুদ্ধি। আমার এই জীর্ণ অবস্থায় ওর সাহায্য খুবই কাজে লাগবে।

মে মাসের মাঝামাঝি হ্রদের সন্ধানে বেরন সম্ভব হল। চুয়া রাজপথের ধারে ইনিয়া নামে একটা গ্রাম আছে। ক্রাসুলিন আর দুজন পুরনো তাইগাযাত্রীকে নিয়ে আমি সেই ইনিয়া গ্রাম থেকে হ্রদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লাম। চরোসভের নির্দেশ আমার মনে ছিল। সেই পুরনো ছেঁড়াখোঁড়া নোটবইটাও ছিল পকেটে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা একটা উপত্যকার মুখে আমাদের তাঁবু পড়ল। উল্টোদিকেই দাঁড়িয়ে শয়তানের দুমুখো কাঁটার মতো একটা মরা লার্চগাছ। গাছটা দেখে ভাবলাম পরদিনই আমার অনুমানের শেষ পরীক্ষা হয়ে যাবে। বেশ উত্তেজিত বোধ করলাম। কল্পনার ভিত্তিতে যুক্তির সিদ্ধান্তটাই কি ঠিক পথ, নাকি আমার কল্পনা ওইরৎ শিল্পীর পাহাড়ী প্রেতাত্মার চেয়েও অসম্ভব কিছু?

একটা ছোট্ট ঢিবির উপর বসে আমি দু'শিংওয়ালা লার্চগাছটার দিকে তাকিয়ে। ক্রাসুলিন আমার উত্তেজনা আঁচ করতে পেরে আমার পাশে এসে বসল।

'ভ্লাদিমির ইয়েভ্গেনিয়েভিচ, আপনি বলেছিলেন পাহাড়ের কাছে এসে আমাদের অভিযানের উদ্দেশ্যটা আমায় বুঝিয়ে বলবেন,' ক্রাসুলিন আমায় মনে করিয়ে দিল।

'আমার বিশ্বাস, কালকেই আমরা বিরাট একটা পারার সঞ্চয় খুঁজে পাব, হয়ত অংশত অবিকৃত আকারে। জানই তো, পারা সাধারণত পাওয়া যায় খুব কম গাঢ় অবস্থায়। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পারার খনি ...'

'স্পেনের আলমাদেনে,' ক্রাসুলিন বলে উঠল।

'হ্যাঁ, আলমাদেনে বিশুদ্ধ পারার একটা ছোট্ট হ্রদ পাওয়া যায়। তার ফলে বহুশতাব্দী ধরে পৃথিবীর অর্ধেক পারা আলমাদেন থেকেই আসছে। আমার নিশ্চিত ধারণা এখানকার অনেক পাথর পুরোপুরিই হিঙ্গুলের তৈরী, অবশ্য, যদি ...'

'কিন্তু, ভ্লাদিমির ইয়েভ্গেনিয়েভিচ, এরকম সঞ্চয় যদি পাওয়া যায় তাহলে পৃথিবীর পারার বাজার তো একেবারে ওলটপালট হয়ে যাবে!'

'তা তো নিশ্চয়ই। ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং আর ওষুধের কাজে পারা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কিন্তু এখন শুয়ে পড়তে হয়। কালকে ভোর হবার আগেই উঠতে হবে। মনে হচ্ছে দিনটা কাল মেঘলা থাকবে, সেটাই আমরা চাই।'

'কেন?'

'কারণ তোমাদের বা নিজেকে বিষ দিয়ে মারার ইচ্ছে আমার নেই। পারার ধোঁয়া, ছেলেখেলার জিনিস নয়। সেই জন্যই তো এই সঞ্চয় এত

শতাব্দী ধরে অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। আসছে কাল দোনি-দেরের অশরীরীদের সঙ্গে আমাদের শক্তি পরীক্ষা হবে।'

গোলাপী কুয়াশায় পাহাড়ের চূড়া ঢেকে গেছে। উপত্যকাটা অন্ধকার হয়ে এল। অদৃশ্য সূর্যের আলোয় কেবল বরফঢাকা পাহাড়চূড়ার তীক্ষ্ম রেখা জ্বলে উঠেছে। তারপর চূড়াগুলোও পাহাড়ের গা বেয়ে ওঠা ধূসর সন্ধ্যায় অদৃশ্য হয়ে গেল। কুয়াশাভরা আকাশে নিষ্প্রভ তারা। কিছুক্ষণ ক্যাম্পফায়ারের ধারে বসে রইলাম, তারপর মনের উত্তেজনাকে শান্ত করে তাঁবুর ভিতরে চলে গেলাম।

কেন জানি না পরের দিনটা আমার স্মৃতিতে কতগুলো ছাড়াছাড়া ছবির মতো গাঁথা রয়েছে।

তৃতীয় আর চতুর্থ হ্রদের মাঝখানের চওড়া সমান উপত্যকাটা আমার এখনো পরিষ্কার মনে পড়ে। আসলে সেটা জলাভূমি। তার বুকে একটিও গাছ নেই, কেবল সবুজ শ্যাওলার গালিচা বিছনো। দুধারে লম্বা লম্বা দেবদারুগাছ। গাছগুলোর একধারে কাঠিকুটোও নেই অথচ অন্যধারে বিরাট বিরাট ডালপালা আঙুল দেখিয়ে দিচ্ছে পাহাড়ী প্রেতাত্মার হ্রদটা, মনে হচ্ছে যেন লম্বা মাস্তুলের মাথায় কতগুলো ভুতুড়ে নিশান। দেবদারুগাছের ঠিক মাথার উপর দিয়েই দলে দলে বিষণ্ণ মেঘ ছুটে চলেছে রহস্যময় হ্রদটার দিকে।

চতুর্থ হ্রদটা ছোট আর গোল। ছোট ছোট পাঁশুটে ঢেউ তোলা নীলচে ধূসর জলের ভিতর থেকে একসার তীক্ষ্ম পাথর তুলে আছে। পাথরের উপর দিয়ে অপর তীরে গেলাম। তারপর একঝাড় বেঁটে দেবদারুর ভিতর দিয়ে আরো এগিয়ে গেলাম। দশ মিনিট পরেই পেঁৗছলাম পাহাড়ী প্রেতাত্মার হ্রদের তীরে। পাহাড়ের বরফঢাকা ঢালু আর জলের উপর একটা করুণ ধূসর রং। পাহাড়ী প্রেতাত্মাদের মন্দিরটা কিন্তু দেখা মাত্রই চিনতে পারলাম। বহুবছর আগেই চরোসভের স্টুডিওতে সে মন্দির আমার মন হরণ করে নিয়েছে।

সরু পাহাড়ের পায়ের তলে, ইস্পাতের মতো ধূসর পাথরগুলোর কাছে পেঁৗছন খুবই কঠিন। কিন্তু জিয়লজিক্যাল হ্যামার যখন জোর শব্দ করতে করতে মস্ত একটুকরো হিঙ্গুল ভেঙে ফেলল তখন সব বাধা বিপদের কথা

আমরা ভুলে গেলাম। আরো এগিয়ে পাথরগুলো একটা ছোট্ট গহ্বরে হেলে পড়েছে। গহ্বরটার উপরেই একটা পাৎলা কুণ্ডুলী পাকান ধোঁয়া। গহ্বরটা গরম কাদা জলে ভরা। চারদিকে ছুটে বেরচ্ছে উষ্ণ জলপ্রবাহ। তার কুয়াশায় গহ্বরের ধারগুলো ঢেকে গেছে।

ক্রাসুলিনকে আকরবাহী স্তরের নক্সা আঁকতে বলে আমি মজুরদের সঙ্গে কুয়াশার ভিতর দিয়ে পাহাড়ের পায়ের কাছে এগিয়ে গেলাম।

'এটা কী?' মজুরদের একজন হঠাৎ বলে উঠল।

তাকিয়ে দেখি পাথরে আধখানা ঢাকা একটা পারার হ্রদ। তার উত্তল বুকে একটা ভয়াবহ অস্বচ্ছ ছটা। আমার স্বপ্ন তবে সত্যি হয়েছে। পাগলের মতো হ্রদের উজ্জ্বল বুকের উপর ঝুঁকে পড়ে পিছলে যাওয়া তরল পারায় হাত ডুবিয়ে দিলাম। হাজার হাজার টন পারা — দেশের প্রতি আমাদের উপহার। আমার ডাক শুনে ক্রাসুলিন দৌড়ে এসে মূক আবেগে চুপ করে দাঁড়িয়ে গেল।

মনের আনন্দ চেপে রেখে আমায় সঙ্গীদের তাড়া দিতে হল। এরমধ্যেই আমার মাথা ভারী হয়ে এসেছে, মুখের ভিতরটা জ্বালা করছে — পারার বিষক্রিয়ার মারাত্মক উপসর্গ। জায়গাটার কয়েকটা ছবি তুলে নিলাম। মজুরদের একজন ছোট্ট হ্রদটা থেকে ওয়াটার বটল্‌গুলোয় পারা ভরে নিল। ক্রাসুলিন আর অন্য মজুররা তাড়াতাড়ি হ্রদ আর আকর স্তরের মাপ নিয়ে নিল। মনে হল সবকিছু যেন বিদ্যুৎগতিতে ঘটে গেল, কিন্তু তবু ফিরলাম খুব আস্তে আস্তে। কেমন একটা অস্থিরতা সবার মনে। প্রচণ্ড ভয়। আমরা বাঁ তীর ধরে ধুঁকতে ধুঁকতে চলেছি, এমন সময় মেঘ ফাঁক হয়ে গিয়ে হীরার মতো উজ্জ্বল একটা চূড়া দেখা দিল। দূরের একটা গিরিবর্ত্মের ভিতরে এসে পড়ল সূর্যের বাঁকা আলো। হ্রদের উপত্যকাটা হঠাৎ উজ্জ্বল স্বচ্ছ আলোয় ভরে গিয়ে সজীব হয়ে উঠল। ঘুরে দেখলাম, যে জায়গাটা আমরা এইমাত্র ছেড়ে এসেছি সেখানে নীলচে সবুজ ভূতুড়ে আলোর নাচ। সৌভাগ্যক্রমে তীরটা ক্রমশ সমান হয়ে এল। আমরাও কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘোড়ার কাছে পৌঁছে গেলাম।

নিজের ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠলাম, 'যদি প্রাণ বাঁচাতে চাও তবে জোর ঘোড়া ছোটাও!'

সন্ধ্যার দিকে দ্বিতীয় হ্রদটায় এসে পৌঁছলাম। দেবদারুগাছগুলো মনে হল যেন ডাল বাড়িয়ে আমাদের ধরে রাখতে চায়। রাত্রে আমাদের কারোই শরীরটা তেমন ভাল বোধ হল না। কিন্তু দেখা গেল শরীরের গুরুতর কোন ক্ষতি হয়নি।

এরপর আর বিশেষ কিছুই বলার নেই। এই মায়া হ্রদে যে পরিমাণ পারা পাওয়া গেছে, এখনো যাচ্ছে, সোভিয়েত দেশের অজস্র শিল্পের চাহিদার পক্ষে তা যথেষ্ট।

কিন্তু সেই সত্যনিষ্ঠ শিল্পী, সেই পাহাড়ের আত্মার অনুসন্ধানীর প্রতি কৃতজ্ঞতা আমার স্মৃতিতে চিরদিন জাগরূক থাকবে।

ওলগই-খরখই
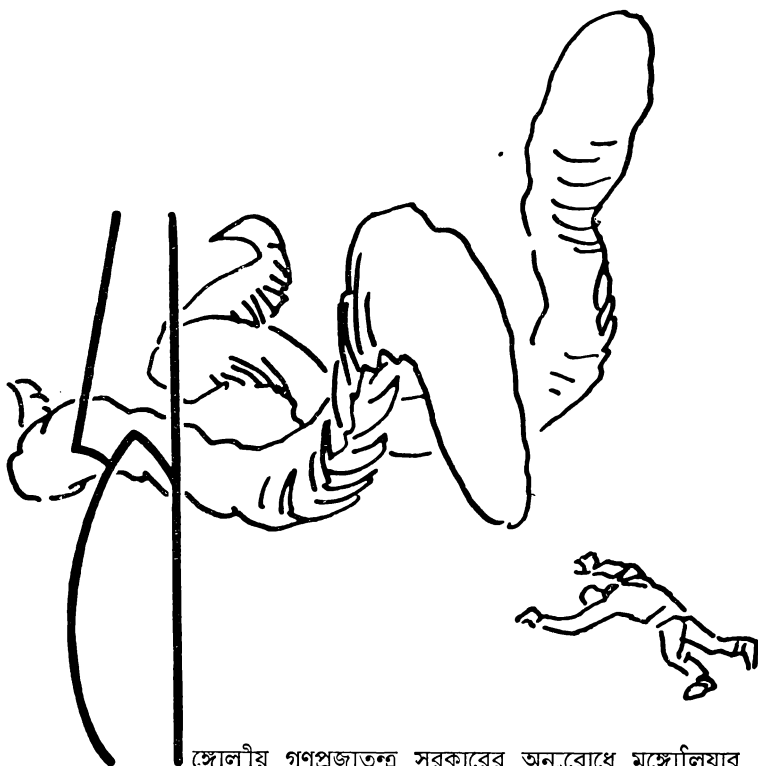
মঙ্গোলীয় গণপ্রজাতন্ত্র সরকারের অনুরোধে মঙ্গোলিয়ার দক্ষিণ প্রান্ত ধরে আমি একটা জিওডেসটিক সার্ভে চালিয়েছিলাম। দুটো গ্রীষ্ম কাজ করার পর হাতে কেবল একটি কাজ বাকি রইল মঙ্গোলিয়া-চীনের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে দু'তিনটি জ্যোতিষ কেন্দ্র স্থাপন করা। ঐ জলশূন্য প্রায় অনতিক্রম্য বালির রাজ্যে কাজটা তেমন সহজ নয়। উটের বড় একটা

ক্যারাভান তৈরী করা দীর্ঘদিনের ব্যাপার। তাছাড়া এই আদিম যান ব্যবস্থাটি আমার মতে বড় ধীরে চলে, অথচ আমার অভ্যাস মাইলের পর মাইল দ্রুত পেরিয়ে যাওয়া। আমার ১·৫ টনের "গাজ" গাড়ীটা তখনও পর্যন্ত অতি বিশ্বস্তভাবে আমার কাজ করে চলছিল। কিন্তু "গাজে" চড়ে সাংঘাতিক এই বালির রাজ্যে অভিযানে বেরন মানে পাগলামি। কিন্তু এ ছাড়া উপযুক্ত কোন যানবাহন পাওয়া অসম্ভব।

মঙ্গোলীয় বিজ্ঞান কমিটির প্রতিনিধির সঙ্গে এই সমস্যা নিয়ে আমরা যখন সাংঘাতিকভাবে মাথা ঘামাচ্ছি, ঠিক সেই সময় উলান-বাতোরে সোভিয়েত বৈজ্ঞানিক অভিযাত্রীদের একটা বড় দল এসে পৌঁছল। আনকোরা নতুন, মরুভূমিতে চলার জন্য বিশেষ সুপার বেলুন টায়ার লাগান, চমৎকার লরীগুলো উলান-বাতোরে বেশ একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। আমার ড্রাইভার গ্রিশা নেহাৎ ছেলেমানুষ আর খেয়ালী কিন্তু চতুর মেকানিক, লম্বা পাড়ি দেওয়া তার একরকম নেশাই। সে বেশ কয়েকবার অভিযাত্রী দলের গ্যারাজ ঘুরে এসেছে, ঈর্ষ্যাভরা সপ্রশংস দৃষ্টিতে হাঁ করে তাকিয়ে থেকেছে চমৎকার টায়ারগুলোর দিকে। ওর কথা অনুসারে আর বিজ্ঞান কমিটির সাহায্যে আমাদের লরীগুলোর জন্য, গ্রিশার ভাষায় নতুন "জুতো" কোন রকমে জোগাড় করা গেল।

এই "জুতোগুলো" আসলে হচ্ছে ছোট্ট ছোট্ট চাকা — এমনকি ব্রেকড্রামের চেয়েও ছোট্ট — ঐ ছোট্ট চাকাগুলোর উপর উঁচু, বেরিয়ে থাকা খাঁজ বসান অবিশ্বাস্য রকম পুরু বেলুন টায়ারগুলো বসিয়ে নিলাম। পরীক্ষা করে দেখা গেল সুপার বেলুনগুলো ব্যবহারিক প্রয়োজনের দিক থেকে চমৎকার। অত্যন্ত ঝুরো আর গভীর বালির উপর দিয়ে কী অনায়াসে আমাদের লরী চলে যাচ্ছে দেখে আমিও অবাক হয়ে গেলাম। "আমিও" বলছি কারণ পথঘাট বিহীন অঞ্চলে মোটরে করে বেড়ানর বহু অভিজ্ঞতা আমার আছে। গ্রিশা আবার শপথ করে বলল, এই টায়ার পেলে কাল গোবি মরুভূমির পূর্ব প্রান্ত থেকে পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সে না থেমে সোজা মোটর চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

সুপার বেলুন ছাড়াও অভিযাত্রী দলের মেকানিকরা প্রচুর নির্দেশ উপদেশ দিয়ে আমাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে গেল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের চাকায় বসান বাড়ীটা ধুলোর মেঘ উড়িয়ে উলান-বাতোরকে বিদায় জানিয়ে সেৎসেরলিগের অভিমুখে রওনা হল। প্রায়ই মোটর ভ্রমণ করে থাকি, তাই সরঞ্জাম আর মানুষের একটা কড়াকড়ি ভাগ আমরা মেনে চলি। আমি ড্রাইভারের পাশে বসলাম, যেখানে একটা ভাঁজ করা টেবিল লগ-বুকের জন্য বিশেষভাবে রাখা হয়েছে। একটা মেরিন কম্পাসের সাহায্যে দিক আর স্পীডোমিটার দিয়ে দূরত্ব ঠিক করছি। লরীর পিছনটা তেরপলে ঢাকা, যেন "প্রেয়রীর জাহাজ"। সেখানে মূল্যবান বেলুন টায়ার, জলের ট্যাংক আর বাড়তি পেট্রলের ব্যারেলগুলো ঝন ঝন শব্দ তুলছে। ঐখানেই বাড়তি যন্ত্রপাতি আর রবার ভরা দুটো বিরাট বাক্স রয়েছে। তার উপর বসে ওয়ারলেস অপারেটর, গণিতবিদ, আমার সহকারী আর আমাদের পথপ্রদর্শক ও দোভাষী দারখিন। বুড়ো দারখিন বেশ চালাক। জাতে মঙ্গোল। রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার মধ্যে তার দীর্ঘ জীবন কেটেছে। ড্রাইভারের ঘর ঘেঁষে একটা বাক্সের উপর সে বসেছে। যাতে পাশের জানলা দিয়ে গ্রিশাকে পথ দেখাতে পারে। ওয়ারলেস অপারেটর মিশা, আমার নামের মিতা আর উৎসাহী শিকারী, অন্য একটা বাক্সের উপর বসে বাইনোকুলার আর রাইফেল নিয়ে একেবারে তৈরী। মিশার কাজ হল হিলডেব্রাণ্ট যন্ত্রপাতি আর জরীপের সরঞ্জামের হেপাজতি করা। লরীর বাকি জায়গাটায় আমাদের গোটান বিছানা, তাঁবু, রান্নার সরঞ্জাম, পথে প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে ঠেসে রাখা হয়েছে।

আমাদের যেতে হবে ওরোক-নর হ্রদ পর্যন্ত, সেখান থেকে ঐ রাজ্যের দক্ষিণতম অংশে ট্রান্স-আলতাই গোবি মরুভূমি। হ্রদটা থেকে প্রায় তিনশ' কিলোমিটার পথ।

আমাদের গাড়ীটা খানগাই পর্বত পেরিয়ে এসে পড়ল একটা চওড়া মোটর চলা সড়কে। তাৎসা-গল গ্রামের একটা বিরাট গ্যারাজে আমাদের লরীটাকে শেষবারের মতো ভাল করে পরীক্ষা করে পেট্রলের ব্যারেলগুলো ভর্তি করে তৈরী হয়ে নিলাম, ট্রান্স-আলতাই গোবির সঙ্গে সংগ্রাম করতে হবে, জনমানুষের পা সেখানে আজও পড়েনি। হয় এসপার নয় ওসপার।

ফিরতি পথে যাতে ওরোক-নর গ্রামে আমাদের পেট্রল দেওয়া হয় সে ব্যবস্থাও করা হল।

সবকিছুই যতদূর সম্ভব সহজে হয়ে গেল। ওরোক-নরের পথে মাঝে মাঝে কয়েকটা অসুবিধেজনক বালির রাস্তা পড়েছে, কিন্তু আমাদের আশ্চর্য সুপার বেলুনের দৌলতে কোন দুর্ঘটনা ঘটেনি। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় ইক্-হে পর্বতের রক্তাভ আভাস দেখা গেল। অমনি পাহাড়ের গায়ে ঢালও পরিষ্কার হয়ে উঠল। গোধূলির স্নিগ্ধতার আনন্দে ইঞ্জিনটা ভীষণভাবে গর্জন করে আমাদের ঠেলে তুলে দিল একটা বালিয়াড়ির উপরে। রাত্রের ঠাণ্ডার সুযোগ নেওয়াটাই ঠিক করলাম। তাই ভোর পর্যন্ত লাফিয়ে লাফিয়ে ওঠা হেড লাইটের আলো অনুসরণ করে চললাম। ভোর হয়ে এসেছে। একটা নিচু কাদার পাহাড়ের পিঠ থেকে দেখতে পেলাম ওরোক-নর হ্রদের পাড় ধরে চলে গেছে ঝোপঝাড়ের সার। মিশা আর আমাদের পথপ্রদর্শক শেষ পথটুকু ঘুমচ্ছিল। তারা এবার নেমে পড়ে চটপট একটা গাড়ী রাখার উপযুক্ত জায়গা বের করে ফেলল। কিছু জ্বালানি কাঠ জড় করা হল, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের ছোট্ট দলটি লরীর পাশে একটা কম্বল পেতে বসে চায়ের কাপ হাতে মেতে গেল ভবিষ্যৎ যাত্রার পরিকল্পনায়। এবার আমাদের পথ নিতে হবে অজানা দেশের মধ্যে দিয়ে, আমি ম্যাপে জায়গাটা ঠিক করে নিতে চাই। জ্যোতিষ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। ভ্লাদিমিরৎসেভের পর্যবেক্ষণগুলি আমি যাচাই করে দেখতে চাই, ওগুলো সম্বন্ধে আমার মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ড্রাইভার আবার লরীটা পরীক্ষা করে নেবার জন্য ব্যগ্র। মিশার ইচ্ছে আমাদের জন্য কিছু শিকার করে। বুড়ো দারিখিন চায় স্থানীয় আরাতদের কাছ থেকে পথ সংক্রান্ত যাবতীয় খবরাখবর সংগ্রহ করতে। তাই এই জায়গায় একটা দিন থেকে যাব একথা জানাতে, সবাই কথাটা বিনা আপত্তিতে খুসী হয়ে মেনে নিল।

লরীর ছায়াটা কোথায় সবচেয়ে বেশি সময় থাকতে পারে তা দেখে নিয়ে সেখানে আমরা আমাদের চওড়া কম্বল পেতে শুয়ে পড়লাম। ভেজা হাওয়ায় ঝোপঝাড়ে খসখস শব্দ উঠছে — গরম ইঞ্জিনের পেট্রল, রবার, তেল মেশান গন্ধের সঙ্গে ভেসে আসছে অচেনা কোন লতাগুল্মের গন্ধ। পিঠ টান করে ক্লান্ত পাদুটো মেলে দিয়ে ক্রমে পাণ্ডুর হয়ে আসা আকাশের দিকে চেয়ে

শুয়ে থাকতে কী আরাম! চট্ করে ঘুমিয়ে পড়লাম। গ্রিশা আমার পাশে শুয়ে আগে থেকেই জোর ঘুমচ্ছে। দারখিন আর মিশা বহুক্ষণ পর্যন্ত ফিসফিস করে কথা বলে চলল।

রোদের জ্বালায় ঘুম ভেঙে গেল। লরীর ছায়াটুকু সূর্যদেব বহু আগেই গ্রাস করে আমার পাদুটো জ্বালিয়ে দিচ্ছিলেন। ড্রাইভার চাপা গলায় একটা সুর ভাঁজতে ভাঁজতে সামনের চাকায় কী যেন মেরামত করছে। মিশা আর দারখিনের কোন চিহ্ন নেই। আমি উঠে পড়লাম, হ্রদে চান করে এক কাপ চা খেয়ে মেরামতির কাজে গ্রিশাকে সাহায্য করতে লেগে গেলাম।

দূরে বন্দুকের গুলির শব্দ শুনে বোঝা গেল মিশাও বৃথা সময় কাটাচ্ছে না। সন্ধ্যার মধ্যেই আমরা লরীর কাজ শেষ করে ফেললাম। মিশা কয়েকটা হাঁস নিয়ে এল। তার শিকারের মধ্যে দুটো চমৎকার দেখতে পাখি ছিল। ওরকম পাখি আগে কখনও দেখিনি। ড্রাইভার তখুনি সুপ বানাতে লেগে গেল, আর মিশা তার এরিয়ল টাঙিয়ে মধ্য রাত্রির সময় সংকেত ধরার জন্য তৈরী হয়ে নিল। পর্যবেক্ষণ আর জ্যোতিষ কেন্দ্র স্থাপনের একটা উপযুক্ত জায়গার সন্ধানে আমি ক্যাম্পের চারপাশে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। লরীর কাছে ফিরে এসে শুনি খাবার তৈরী। দারখিন এইমাত্র ফিরে মিশা আর ড্রাইভারের সঙ্গে কীসব কথা বলতে সুরু করেছিল। আমাকে দেখে বুড়ো চুপ করে গেল।

বিদ্রূপের হাসি হেসে গ্রিশা বলল, 'মিখাইল ইলিচ, দারখিন আমাদের ভয় দেখাতে চাইছে। আমার তো শরীর ভয়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে। দিব্যি করে বলতে পারি, কালই আমরা শয়তানের ডেরায় পৌঁছব।'

'কী ব্যাপার দারখিন?' এক টুকরো তেরপলের উপর রাখা কড়াইটার পাশে বসে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

বুড়ো মঙ্গোল ড্রাইভারের দিকে একবার বিরক্তিপূর্ণ চোখে চেয়ে গোঁয়ার জোয়ান বাক্যবাগীশদের উদ্দেশে কী যেন বিড়বিড় করতে করতে বলল, 'গ্রিশা সব সময় হাসে, বিপদের কথা বুঝতে পারে না!'

তরুণরা ফূর্তিভরা হাসি মুখে কথাটা শুনেছে বলে বুড়োর ভারি রাগ। আমি কোন রকমে ওকে শান্ত করে পরদিনের যাত্রার বিষয়ে নানা প্রশ্ন করতে লাগলাম। দেখলাম বুড়ো বিস্তারিত খবর জোগাড় করেছে স্থানীয় মঙ্গোলদের

কাছ থেকে। শুকনো ঘাস দিয়ে বালির উপর কয়েকটা সরু দাগ কেটে ও বোঝাতে লাগল মঙ্গোলীয় আলতাই পাহাড়গুলো এখানে কী ভাবে গঠিত। আমাদের যেতে হবে দক্ষিণ মুখে ইক্‌হে-বগ্‌দোর পশ্চিমের বিস্তীর্ণ উপত্যকা দিয়ে। পুরোন ক্যারাভানের পথ ধরে যেতে হবে বালি ঢাকা সমতল পেরিয়ে সাগান-তলোগই কূপে। স্থানীয় সংবাদ অনুসারে তার দূরত্ব ত্রিশ মাইল। কূপ থেকে নোনা কাদা মাটির উপর দিয়ে মোটামুটি ভালই একটা রাস্তা ১৫০ মাইল চলে গেছে নইন-বগ্‌দো পর্বত বলয় পর্যন্ত। পাহাড়ের ওপারে বালির চওড়া সাংঘাতিক পথ, উত্তর দক্ষিণে ২৫ মাইলের কম নয়—সেটাই হল দলোন-খালি গোবি। তার পর সোজা চীনের সীমানা পর্যন্ত চলে গেছে জুনগারা গোবির মরুভূমি। এই বালির রাজ্য, দারখিন বলল, একেবারে জলশূন্য, জনমানব বর্জিত। মঙ্গোলদের মধ্যে ঐ অঞ্চলটা মারাত্মক ভয়াবহ বলে কুখ্যাত। দলোন-খালি গোবির পশ্চিম কোণাঞ্চলেরও ঐ দুর্নাম। যতদূর সম্ভব বুড়োকে আশ্বাস দিয়ে বুঝিয়ে বললাম, আমাদের লরীর মতো দ্রুত আর নিরাপদ বাহন থাকতে বালি যতই সাংঘাতিক হোক না কেন ভয় পাবার কোন কারণ নেই, তা সে নিজেই দেখতে পাবে। আর আমরা তো ওখানে বেশি দিন থাকব না। আমি তারাগুলো দেখেই ব্যস তখুনি গাড়ীর মুখ ঘুরিয়ে দেব।

দারখিন মাথা নাড়ল, কোন কথা বলল না। কিন্তু তবু আমাদের সঙ্গে যেতে নারাজ হল না।

রাত্রিটা শান্তভাবে কেটে গেল। ভোরের আগেই দারখিন আমাকে তুলে দিল, বহু চেষ্টা করে ঘুমের সঙ্গে যুদ্ধ করে উঠে পড়লাম। ইঞ্জিন গর্জন করে উঠল। প্রত্যুষের নিস্তব্ধতা ভেঙে ঘুমন্ত পাখিদের আচমকা জাগিয়ে দিয়ে সে গর্জনের প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল। সকালের ঠাণ্ডা খোলা বাতাসে শরীর শিরশির করে উঠল। তবু ড্রাইভারের ঘরটা বেশ গরম লাগতে পাশের জানলাটা আমি নামিয়ে দিলাম। লরীটা ঠোক্কর খেয়ে খেয়ে প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে এগিয়ে চলেছে। আশপাশের দৃশ্য বড্ড একঘেয়ে, আমার ঘুম এসে গেল। হাতটা বেঁকিয়ে জানলার উপর ভর রেখে তাতে মাথাটা হেলিয়ে দিয়ে বেশ একটু ঘুমিয়ে নেওয়া গেল। প্রচণ্ড ঝাঁকানিতে ঘুম ভাঙলেই চট করে কম্পাসটা দেখে নিয়ে কোথায় রয়েছি লিখে নিই। তারপর আবার ঘুম। ঘুমিয়ে যতক্ষণ

না আশ মেটে ততক্ষণ ঐ ভাবেই চলল। ড্রাইভার লরী থামাল, একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে ঘুমের আবেগ একেবারে ঝেড়ে ফেললাম।

আমরা এখন পাহাড়ের ঠিক পাদদেশে দাঁড়িয়ে। শরীরটাকে একটু টান করে নেবার জন্য সবাই লরী থেকে নেমে পড়লাম। সূর্য নির্দয়ভাবে আগুন ছড়াচ্ছে। চাকাগুলো এত গরম যে নক্সা করা রবারটা পর্যন্ত ছোঁয়া যায় না। গ্রিশা অভ্যাস মত লেগে গেল আমাদের নির্ভয় ছোট্ট লরীটার পরীক্ষায়। দারখিন খাড়া লালচে পাহাড়টার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে। পাহাড়গুলো যেন তাদের বড় বড় ধসে পড়া পাথরের লেজ স্তেপের উপর ছড়িয়ে দিয়েছে। সূর্য নেমে গেছে। আলোর রশ্মি এখন পাহাড়ের সমান্তরাল। খয়েরী আর গাঢ় লাল রং গিরিপৃষ্ঠের প্রতিটি ফাটল, প্রতিটি উপত্যকা, প্রতিটি প্রণালীর উপর ঘন নীল রঙের ছায়া পড়ে ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। রঙের ঐ পাগলামির দিকে তাকিয়ে বুঝলাম মঙ্গোলীয় কম্বলের লাল নীল নক্সার উৎস কোথায়।

পর্বত শ্রেণী ভেদ করে সুদূর পশ্চিমে চলে গেছে একটা চওড়া উপত্যকা, দারখিন আঙুল দিয়ে সেটা দেখিয়ে দিল। ঠাণ্ডা হয়ে আসা ইঞ্জিনটা আবার চালিয়ে গ্রিশা ডাইনে মোড় ফিরল। বনেটের উপর ভীষণ তেজে রোদ পড়ায় ইঞ্জিনটা এত বেশি গরম হয়ে উঠল যে সবচেয়ে ছোট পাহাড়টাও আমাদের পেরোতে হল প্রথম গীয়ারে। অবিশ্রান্ত মোটরের গর্জনে গ্রিশার উৎসাহ নিবে এল, থেকে থেকেই দেখছি রাগত চোখে সে আমার দিকে চাইছে। গ্রিশার রাগত দৃষ্টি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে আমি তখন মনে মনে ভাবছি নিশ্চয়ই কোন জলাশয় পাবই, তবে আর হ্রদের চমৎকার খাবার জলটুকু নষ্ট করতে হবে না। আমার আশা ব্যর্থ হল না। বাঁ দিকে দেখতে পেলাম একটা খাড়া খাদের দেওয়াল, পায়ের কাছ বেড়ে ঘাস গজিয়েছে। এইবার আমাদের ঐ খাদের দিকে নামতে হবে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আমরা নিরাপদে নিচে পৌঁছলাম, নবীন কচি ঘাসের মধ্যে গ্রিশা লরী থামিয়ে হাসি মুখে নেমে এল। খাড়া পাহাড়টা তার ঘন নীল ছায়ার জোব্বা দিয়ে আমাদের আড়াল করে রেখেছে হৃদয়হীন মরুরাজ সূর্যের অত্যাচার থেকে। ঠিক হল একটু জিরিয়ে এখানে চা খেয়ে নেব।

পাহাড় গরম নিঃশ্বাস ফেলতে সুরু করতেই আমরা ঘুমিয়ে নেবার জোগাড় করলাম, রাত্রের যাত্রার জন্য শক্তি সঞ্চয় করতে হবে তো! অনেকক্ষণ

একটানা ঘুমিয়েছি হঠাৎ গ্রিশার চীৎকারে ঘুম ভেঙে গেল 'দেখুন দেখুন মিখাইল ইলিচ, তাড়াতাড়ি আসুন, শেষ কালে হয়ত দেখতেই পাবেন না! উঠে তাকিয়ে দেখি আমাদের চতুর্দিক বেড়ে সবকিছুতে যেন আগুন লেগে গেছে। উঃ তখন আমার যা অবস্থা, একটা টোকা দিলেই হয়ত পড়ে যেতাম উল্টে।'

সত্যিই আমাদের চারপাশের দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে মনে হচ্ছে যেন দুঃস্বপ্ন দেখছি। খাড়া পাহাড়ের ঢাল বেয়ে অস্তগামী সূর্য যেন আগুন জেবলে দিয়েছে। নীচের উপত্যকা জুড়ে ঘন নীল অশুভ ছায়া, সেখান থেকে খাড়া উঠে গেছে আগুনের দেওয়াল, মাঝে মাঝে অদ্ভুত নীল ফাঁক, রোদে জলে পোড়া পাহাড়ের ফাটল। ঐ ফাটলে দেখা যাচ্ছে গম্বুজ, খিলান ছাদ, তোরণ। সবকিছু উদীপ্ত হয়ে জ্বলছে, যেন পরীর রাজ্যে আগুন লেগেছে। সোজা তাকিয়ে দেখি উপত্যকার দুপাশের প্রাচীর কিছু দূরে গিয়ে বেঁকে গেছে। বাঁদিকে জ্বলন্ত আগুনের প্রাচীর, ডাইনে নিকষ কাল দেওয়াল। এ দৃশ্য রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দেখার মতো। আমরা সবাই নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে যেন আতঙ্কে চুপ হয়ে গেছি।

'থাক,' গ্রিশাই প্রথম নিস্তব্ধতা ভেঙে বলল, 'উলান-বাতোরে গিয়ে এই অপূর্ব দৃশ্য বর্ণনা করলে দেখবে মেয়েরা তোমার সঙ্গ বর্জন করেছে, বলবে ঐ রে, লোকটা সাপের পাঁচ পা দেখতে সুরু করেছে। দেখে শুনে এখন মনে হচ্ছে দারখিন যা বলেছিল তার মধ্যে হয়ত সত্য কিছু আছে।'

দারখিন কিন্তু গ্রিশার কথায় বিন্দুমাত্র মন দিল না। সে তখন কম্বলের উপর চুপ করে বসে। তার অপলক দৃষ্টি জ্বলন্ত প্রাচীরের দিকে নিবদ্ধ।

ধীরে ধীরে রঙের দীপ্তি ম্লান হয়ে নীল হয়ে এল। কোথা থেকে যেন বয়ে এল এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া। এবার যাত্রা করতে হয়। একটা করে সিগারেট আর এক টিন করে জমান দুধ খেয়ে নিলাম। আবার ড্রাইভারের ঘরের ছাদে আকাশ আড়ালে পড়ল। র‍্যাডিয়েটর আর লরীর উইংয়ের তলায় আবার পথ কেটে চললাম। গাড়ীর হেডলাইট দেখতে পাচ্ছি, ডিম আকারের নেপ আর রিংড কনডাকটর স্থির দৃষ্টে সামনে তাকিয়ে রয়েছে, আর কাঁপতে কাঁপতে ঢিবি পেরিয়ে যাচ্ছে।

ঠিক অন্ধকার হবার আগে আমরা বর-খিসুটির কূপে পৌঁছলাম। ধস

নেমে পাথরে চারপাশ আটকা পড়া বিস্বাদ জলের একটা ঝরণা। সামনের গাঢ় হয়ে আসা অন্ধকারে নীচু পাহাড়ের আভাস। দারখিনও এই পাহাড়ের নাম জানে না।

আমাদের হেডলাইটের তেরচা আলো আবার সামনে সামনে ছুটে চলেছে। প্রতিটি ঢিবি খানা খন্দ সেই বাঁকা আলোয় বড় হয়ে উঠছে। অন্ধকার যতই আমাদের ঘিরে এগিয়ে আসে ততই আরও মনে হয় সমগ্র পৃথিবী থেকে আমরা কটি প্রাণী বিচ্ছিন্ন। কাল বন্ধুর জোট বাঁধা পাহাড় ক্রমে আরও উঁচু হয়ে যাচ্ছে। ঠিক করলাম লরী থামিয়ে পরদিন সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করব—এই অন্ধকারে গাড়ী চালান সাংঘাতিক ব্যাপার, কারণ সামনে পাহাড়ের কাছে গভীর খাদ থাকতে পারে।

নইন-বগদো পর্বতশ্রেণীর গোল চূড়াগুলির প্রান্তরেখা লালচে আকাশের বুকে পরিষ্কার ফুটে উঠলে আমরা যাত্রা সুরু করলাম। গিরিপথের উপর দিয়ে আমরা নিরাপদে এগিয়ে গেলাম। এখানে পাহাড়গুলো খুব নীচু। পাহাড় পেরিয়ে একটা চওড়া উপত্যকার শেষে আমরা থামলাম, সুপার বেলুনগুলো পরিয়ে নিতে হবে। আমাদের সামনে দলোন-খালি গোবির লালচে ধূসর একঘেয়ে বিস্তৃতি। কুয়াশার পর্দা পেরিয়ে একটা পাহাড়ের কিছু অংশ চোখে পড়ে। ঐ পাহাড়গুলি আমাদের অভিযানের মুখ্য লক্ষ্য। বহু প্রাচীন কালে কইসি-কারা নামে এরা পরিচিত ছিল। জুনগারা গোবিকে দ্বিধাবিভক্ত করে যে নীচু পর্বতশ্রেণী চলে গেছে, আমার ইচ্ছে সেখানে একটি জ্যোতিষ কেন্দ্র স্থাপন করি। যদি জল পাই তবে আমাদের সুপার বেলুনের সাহায্যে জুনগারা গোবির ভিতর দিয়ে চীনের সীমানার দিকে আরও এগিয়ে যাব, আমার পর্যবেক্ষণ যাচাই করব। যাই হোক, সবকিছু তাড়াতাড়ি করে নিতে হল। অজানা এই দেশে জল মেলার আশা আমাদের পথপ্রদর্শকের মনে ক্ষীণ। আর পথ ছেড়ে যে এদিক ওদিক ঘুরে দেখব তাও চলবে না, ভয় পাছে ইন্ধন বৃথা নষ্ট হয়।

প্রচণ্ড রোদে মনে হয় যেন মরুভূমির উপর ঘন কুয়াশা জমেছে। কুয়াশার পর্দা উত্তাপের কঠোরতায় থরথর করে মরুভূমির বুকে কাঁপছে দেখেও আমরা যাত্রা সুরু করলাম। হাঁপ ধরান বালির সমুদ্রের অনন্ত প্রস্তরীভূত ঢেউ আমাদের দিকে ছুটে আসছে। পিছনে হয়ত রোদে ধোওয়া ঢেউ রাশি, তার

কোনটা লাল কোনটা বা ধূসর। বালিয়াড়িগুলির কোনটার মাথায় শক্ত শুকনো ঘাসের ডগা—প্রাণের সামান্য চিহ্ন—নির্জীব, নিষ্প্রাণ এই ভূখণ্ডে তারা আরও করুণ হয়ে উঠেছে।

মিহি বালি সবখানে ঢুকছে। সিটের কাল ঢাকা, উইন্ডস্ক্রিন, আমার নোট-বই, কম্পাসের কাঁচ — সবকিছু গুঁড়ো বালিতে ঢাকা পড়েছে। দাঁত কিচকিচ করছে। আমাদের ফোলা ফোলা মুখ চুলকোতে সুরু করল। হাতের চামড়া ফেটে গেল। লরীর ভিতর যা কিছু ছিল বালিতে সব একাকার। যেই থামা হচ্ছে অমনি আমি সবচেয়ে উঁচু বালিয়াড়ির উপর উঠে আমার ফিল্ড গ্লাস দিয়ে এই ভয়াবহ বালির শেষ কোথায় দেখার চেষ্টা করছি। কিন্তু ফ্যাকাসে হলদে কুয়াশার মধ্যে কিছু দেখা যায় না, মনে হচ্ছে এ মরুভূমির বুঝি আর শেষ নেই। নিচে লরীটা দেখছি, এক পাশে হেলে ডানার মতো করে খোলা দরজাটা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। ক্রমে বেড়ে ওঠা অস্বস্তিটা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করতে লাগলাম। লরীটাই যদি ভেঙে যায় তবে আর চমৎকার সুপার বেলুনগুলো কোন কাজে লাগবে? যদি সত্যিই ভাঙে, মেরামত করা যদি অসম্ভব হয়, তবে এই মরুভূমি থেকে বেরবার ক্ষীণতম আশাও আর থাকবে না। আমার উপর বিশ্বাস রাখে এমন গুটি কয়েক লোকের প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে এই বালির সমুদ্রে লাফিয়ে পড়া কি সত্যিই দুঃসাহসিকতা হয়নি? দলোন-খালি মরুভূমির মধ্যে এই সব কথাই বারবার মনে আসতে লাগল। আমি কিন্তু তখনো আমাদের লরীর উপর নির্ভর করে আছি। দারখিনের ব্যবহারও আশ্বাসজনক, যদিও তার বুড়ো মুখখানা অনড়, গম্ভীর। আর তরুণরা তো সম্ভব অসম্ভব বিপদ নিয়ে থোড়াই মাথা ঘামায়।

সবচেয়ে ভাবনার কথা হল পাঁচ ঘণ্টা গাড়ী চালিয়েও সামনে পাহাড়ের চিহ্ন দেখতে পেলাম না। চল্লিশ মাইলের পর থেকে বালির ঢেউ নিচু হয়ে এল। মরুভূমিটা যে ক্রমে উপরে উঠে গেছে তাও বোঝা গেল। আরও তিন মাইল যাওয়ার পর গ্রিশা গাড়ী থামাল। এবার বুঝলাম কেন পাহাড় দেখতে পাইনি। দলোন-খালি মরুভূমি হল বালি ভরা একটা বিরাট চেপটা গর্তের মতো, কাজেই সেই গর্তের তলা থেকে দূরের পাহাড় দেখা অসম্ভব। কিন্তু গর্তটার কানায় উঠতেই দেখি আমরা একটা উঁচু, সমান, নুড়ি ভরা মালভূমিতে এসে গেছি। সামনেই পাহাড়, কিন্তু প্রায় দশ মাইল দক্ষিণে যেতে হবে।

যতদূর চোখ যায় দেখছি চকচকে ঘন খয়েরী রঙের নুড়িতে মাটি ছেয়ে গেছে, কোথাও বা তাদের রং প্রায় কাল। কাল ফাঁকা সমতল ভূমিতে চোখ জুড়োনর কোন সম্ভাবনাই নেই, কিন্তু আমাদের পক্ষে তখন শক্ত সমান রাস্তায় কোন রকমে পৌঁছতে পারাটাই যথেষ্ট। এমনকি ভাবলেশহীন দারখিনও তার গুটি কয়েক দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে খুসি হয়ে হাসতে লাগল।

সুপার বেলুনগুলো আমরা তুলে রাখলাম। বালির মধ্যে প্রায় লাঙল চালিয়ে গুঁড়ি মেরে মেরে গর্তটার মাথায় উঠেছি, কাজেই পাহাড়ের কাছে পৌঁছতে গাড়ীটা যে রকম দ্রুত গতিতে চলতে লাগল আমার কাছে তো সেটা প্রায় অলৌকিক ব্যাপার বলেই মনে হল। জল খুঁজে বের করতে একটু সময় লাগল। পাহাড় পেরিয়ে একটা ঝরণা যখন পাওয়া গেল সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছে। ছোট কিন্তু গভীর একটা গিরিবর্ত্মে ঝরণার জল আটকা পড়েছে, বিরাট গিরিবর্ত্মটার সঙ্গেও তার যোগ রয়েছে। আমাদের জলের সমস্যা ঘুচল। অন্ধকার হবার আগেই জ্যোতিষ কেন্দ্র স্থাপনের একটা জায়গা ঠিক করতে হবে। তাই আমি আর গ্রিশা চায়ের জন্য অপেক্ষা না করেই সবচেয়ে কাছের পাহাড়টায় উঠে পড়লাম।

পাহাড়গুলো এখানে মোটেই উঁচু নয়, ন্যাড়া ন্যাড়া চূড়াগুলো একহাজার ফুটের বেশি উঁচু হবে না। পাহাড়টার আকৃতি অর্দ্ধচন্দ্রের মতো। পাহাড়ের শৃঙ্গগুলি জুনগারা গোবির বালির দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে, আর খাড়া উত্তর প্রান্তটি উত্তর দিকে বেঁকান। শৃঙ্গগুলি মালভূমির সোজা রেখায় সংযুক্ত হয়ে হঠাৎ নীচে, বালি সমুদ্রের ছোট ছোট ঢেউ'এর মতো বালিয়াড়ির দিকে লাফিয়ে নেমে গেছে। মালভূমিটা সমান, লম্বা লম্বা ঝোঁপাল ঘাসে ভরা, তাকে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বেড়ে রয়েছে বাতাসের ঝাপট লাগা, গম্ভীর, তীক্ষ্ন খাঁজ কাটা পাহাড়ের চূড়াগুলি। উত্তর, পূব, দক্ষিণ জুড়ে সীমাহীন পতিত জমির ব্যাপ্তি দেখে আমার মন নিঃসঙ্গতার ব্যথায় ভরে উঠল। কেবল পশ্চিমে দেখতে পাচ্ছি কতকগুলি পাহাড় চূড়ার ধোঁয়াটে আভাস; যে পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে দেখছি তার মতোই বর্ণহীন ও জনশূন্য।

অর্দ্ধচন্দ্রের ভিতরের মালভূমিটা পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের পক্ষে আদর্শ জায়গা। ওয়ারলেস ট্র্যান্সমিটার আর যন্ত্রপাতিগুলো সব বের করা হল। ড্রাইভার আর পথপ্রদর্শকও আমাদের বিছানা আর খাবার দাবার নিয়ে মালভূমিটার উপর

উঠে এল। বহু নিচে দেখতে পাচ্ছি ধূসর রঙের গুবরে পোকার মতো দাঁড়িয়ে আছে আমাদের লরীটা। পাহাড়গুলির নিষ্প্রাণ নিস্তব্ধতায় ব্যাঘাত ঘটিয়েছে হাওয়া, তার প্রায় অশ্রুত ফিসফিস স্বরে। আমাদের মনও কেমন যেন নানা চিন্তায় ভরে উঠল। সঙ্গীরা সবাই কম্বলের উপর শুয়ে পড়ল। মিশা কেবল আলাদা বসে। ধীরে সুস্থে মালভূমির প্রান্তে গিয়ে নিচে মরুভূমির দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। দুচারটে রুপোলি ওয়ার্মউড এদিক ওদিক গজিয়েছে, তাদের মাথার উপর রুক্ষ পাহাড়ের ছাদ। বিবর্ণ মরুভূমি বহুদূরে চলে গেছে সূর্যাস্তের বেগুনী আভায় ভরা আকাশ পর্যন্ত। আমার পিছনে খাঁজ কাটা বর্শার মতো পাহাড়টাকে অত্যন্ত ভীষণ গম্ভীর দেখাচ্ছে। নিষ্ঠুর মরুভূমির নামহীন বালিয়াড়ি এই অর্দ্ধবিলুপ্ত পাহাড়ে দ্বীপটিকে বহু বছর ধরে ধীরে ধীরে ঘিরে ধরেছে। দ্বীপটি প্রতি নিঃশ্বাসে গ্রহণ করছে এক মূক আশাহীন মৃত্যুর শেষহীণ বিষণ্নতা। এই বিষণ্ন দৃশ্য দেখতে দেখতে মধ্য এশিয়ার চেহারাটা মনে আনার চেষ্টা করলাম। বহু প্রাচীন এক বিরাট দেশ। এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত রৌদ্রদগ্ধ, জলহীন মরুভূমি বুকে নিয়ে কাটিয়েছে দীর্ঘ দিন। এখন তাই অত্যন্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আদিম মহাজাগতিক শক্তির সঙ্গে প্রাণের সংগ্রাম এখানেই শেষ হয়েছে। কেবল স্থাণু পাহাড়ের পাথরগুলি আজও ধ্বংসের বিরুদ্ধে তাদের নীরব সংগ্রাম চালিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

জায়গাটার বিষণ্ন হাঁপ ধরা ভাবটা হঠাৎ ফূর্তিভরা গানের সুরে ভেঙে গেল। ব্যাপারটা এতই হঠাৎ, আর জায়গাটার মেজাজের এতই বিপরীত যে মনে হল পৃথিবী যেন ভেঙে পড়ছে। অনেকক্ষণ পর বুঝলাম ওয়ারলেস অপারেটর তার সেটটি লাগিয়েছে। দলের অন্যরাও সবাই চাঙ্গা হয়ে উঠল। কথাবার্তা সুরু হল। সবাই লেগে গেল চা জল খাবারের জোগাড়ে। গান শুনে সবার চাঞ্চল্যে মিশা মহা খুসি। মরুভূমির আবিষ্কারকদের সঙ্গে বহুদূরের মানব জীবনের উষ্ণ, দ্রুত স্পন্দনের সংযোগ ঘটাল যে অদৃশ্য তার, মিশা সেটি আরও কিছুক্ষণ টাঙিয়ে রাখল।

রোজকার মতো আজ রাত্রিটিও পরিষ্কার। উঁচু মালভূমিতে ঠাণ্ডা পড়ে আসছে। গরম বাতাসের কুয়াশা নেই কাজেই পর্যবেক্ষণে কোন অসুবিধা ঘটবে না। আমার মন এখন এত বিরাট, এত সুদূরে মগ্ন যে পৃথিবীর দৃশ্য এখন আমার কাছে সরে যাওয়া ছায়ার মতো। দূরবীণ দিয়ে আমি তাকিয়ে

আছি তারার রাজ্যের দিকে। কাটা রেখার জালের ভিতর একটা উজ্জ্বল তারা দেখা দিল। অনুভূমিক ও উল্লম্ব বৃত্তের আইপিস ছেদ করে স্কেলের দাগ ধীরে পেরিয়ে যাচ্ছে। সেই সঙ্গে ইয়ার ফোনে সময় সংকেতের তীব্র শব্দ শোনা গেল।

যতদূর সম্ভব সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য আমি দুবার পর্যবেক্ষণ করলাম। এই পাণ্ডববর্জিত দেশে আমার কাজ যাচাই করতে বহুদিন কেটে যাবে। পৃথিবীর ম্যাপ আঁকিয়েদের আমার জ্যোতিষ কেন্দ্রের উপর নির্ভর করতেই হবে। আজ থেকে পৃথিবীর বুকে সেই কেন্দ্রের অবস্থান নির্ধারিত হল। অবশেষে ঐ জায়গাটায় একটা কাঠের ছোট গোঁজ পুঁতে আলো নিবিয়ে শুতে গেলাম। কাল লোকজনরা ঐ জায়গাটিতে তামার পাত লাগান একটা লোহার শিক পুঁতে সিমেণ্ট দিয়ে গেঁথে দেবে। চারপাশে পিরামিডের মতো স্তূপ করা পাথর থাকায় বহুদূর থেকে কেন্দ্রটি চোখে পড়বে। নিজের কাজ শেষ করেছি, সুসম্পন্ন করেছি, একথা ভেবেই আমি খুসি।

মালভূমির পরিষ্কার খোলা বাতাসে তারাভরা আকাশের নিচে চমৎকার ঘুম হল। ভাঙল ঠিক ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। ভোরের বাতাস বেশ ঠাণ্ডা। বন্ধুরা সকলে দেখি আগেই উঠে লোহার খুঁটি পুঁততে লেগে গেছে। শরীরটা আবার টান করে দিলাম, একটা সিগারেট খেতে খেতে আগে ভেবে নেওয়া যাক আমাদের ভবিষ্যৎ যাত্রাটা কোন পথে হবে; তারপর উঠব। জুনগারা গোবির বালি পেরন কি আমাদের লরীর পক্ষে খুব বেশি শক্ত হবে? প্রান্ত রেখার মরীচিকার পিছনে পাগলের মতো ধাওয়া করার ঝুঁকি আমি নেব না। যাই হোক মরুভূমির মধ্যে আরও কিছুটা এগিয়ে যাব। ওরোক-নর'এর সবুজে ঘেরা জীবনে ফিরে যাবার আগে দেখে নেব মরুভূমির রূপটা। যেখানে আমি শুয়ে আছি সেখান থেকে কেবল একটা ছোট টিলা দেখা যাচ্ছে। ওর মাথায় উঠে ফিল্ড গ্লাস দিয়ে দক্ষিণে চীনের সীমান্তের দিকে বিস্তৃত বালুরাশি ভাল করে দেখতে হবে।

দারখিন তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে চোর বেড়ালের মতো পা টিপে টিপে আমার দিকে এগিয়ে এল। জেগে আছি দেখে পাশে বসে শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করল তার ভাঙা ভাঙা রুশীতে, 'কী ভাবছ? জুনগারা গোবি?.. যাবে?'

'না, যাব না ঠিক করলাম।' আমার কথা শুনেই বুড়ো আশ্বস্ত হল, চোখদুটো চকচক করে উঠল। 'আমরা কেবল ঐ পাহাড়টার মাথায় উঠব,' কনুইয়ের উপর ভর দিয়ে উঠে দূরের উঁচু টিলাটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলাম।

'কেন?' অবাক হয়ে দারখিন জিজ্ঞেস করল, 'খারাপ জায়গায় না যাওয়াই ভাল, তার চেয়ে বরং ফিরে যাই চল।'

বুড়ো পথপ্রদর্শকের গজগজ বন্ধ করার জন্য চটপট কম্বল ছেড়ে উঠে পড়লাম। সুপার বেলুনগুলো লাগিয়ে নিয়ে মরুভূমির পথে যখন বেরিয়ে পড়া গেল, সূর্যের তাপে বালি তখনও তেতে ওঠেনি। ড্রাইভার নিচু গলায় একটা চঞ্চল সুর ভাঁজছিল। কিন্তু তার সুর ইঞ্জিনের গর্জন ছাপিয়ে উঠতে পারল না। অন্য সব বারের মতো এবারেও গাড়ীর ঝাঁকানিতে আমার ঘুম এসে গেল। আধা ঘুমন্ত অবস্থাতেও জুনগারা গোবির অদ্ভুত রং লক্ষ্য করছিলাম। তেতে ওঠা উজ্জ্বল সূর্যের আলোয় ঢালু হয়ে আসা বালিয়াড়িগুলি বেগনী দেখাচ্ছে। ছায়া সরে সরে যাচ্ছে। যেখানেই সূর্যের আলো পড়ে সেখানটাই হয়ে ওঠে লাল। এই অদ্ভুত মায়ামরীচিকার খেলায় মরুভূমিটা আরো নিষ্প্রাণ, আরও নির্জন মনে হতে লাগল।

কয়েক মিনিট বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। জেগে দেখি ইঞ্জিন বন্ধ। লরীটা একটা বালিয়াড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে। ধসে পড় পড় একটা ঢালের মাথায় তার মুখটা। ঢাল বেয়ে তখনও ছোট্ট ছোট্ট পাহাড়ে নদীর মতো বালির স্রোত নামছে। ধাঁ করে গাড়ীর দরজা খুলে বেরিয়ে ফুটবোর্ডের উপর এসে দাঁড়ালাম। তাকিয়ে দেখতে লাগলাম চারদিকটা।

সামনে আর দুপাশে কেবল বালিয়াড়ির পর বালিয়াড়ি। এত বিরাট আকারের টিলা যে থাকতে পারে তা কল্পনাই করা যায় না। সূর্য আর বাতাসের কারসাজিতে এগুলোকেই আমি পাহাড় ভেবেছিলাম। ইস, কী সাংঘাতিক ভুলই না করেছি। কয়েক মিনিট আগে হলেও শপথ করে বলতাম সামনে পরিষ্কার পাহাড় দেখছি। পা বালির মধ্যে বসে যাচ্ছে, তা সত্ত্বেও কোনরকমে একটা বালিয়াড়ির মাথায় উঠে মরুভূমির দক্ষিণে তাকালাম। দারখিন এসে দাঁড়াল আমার পাশে, তার চোখ ধূর্তের মতো চকচক করছে। বেশ বোঝা গেল দক্ষিণে এগোনর আর কোন অর্থই হয় না। পাহাড় পর্বতের

কোন চিহ্নই ওদিকে নেই। দারখিন বলল, মঙ্গোলরা নাকি বলেছে ঐ বালি সোজা চলে গেছে চীনের সীমানা পর্যন্ত।

ঠিক করলাম ফিরে যাব। সঙ্গীরাও আমার সিদ্ধান্তে দেখলাম খুসি। মরুভূমির উপর সদা বিরাজমান মৃত্যুসম নিস্তব্ধতা তাদের উৎসাহ নিবিয়ে দিয়েছে। স্তব্ধ মরুভূমিতে আবার ইঞ্জিনের জয়গান শোনা যায়, প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ে। লরীটা মুখ ফিরিয়ে ঢাল বেয়ে নেমে চলে।

নোট-বইটা সরিয়ে রেখে, কম্পাসটা বন্ধ করে আর এক চোট ঘুমের জন্য তৈরী হলাম।

'বুঝলেন মিখাইল ইলিচ, যদি খুব জোরে চালাই তবে ওরোক-নর পর্যন্ত নয়ত ঐ আগুন লাগা পাহাড় পর্যন্ত তো নিশ্চয়ই চলবে,' গ্রিশা তার সুন্দর দাঁতের পাটি বের করে হেসে বলল।

মাথার উপর একটা জোর ধাক্কায় আমরা দুজনেই লাফিয়ে উঠলাম। ওয়ারলেস ওপারেটর লরীর ছাদ পেটাচ্ছে। জানালার উপর দিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে ইঞ্জিনের শব্দের উপর গলা তুলে কী যেন বলতে চেষ্টা করছে, তার ডান হাত দিয়ে কী যেন দেখাচ্ছে।

'কী হয়েছে?' ড্রাইভার চীৎকার করে জিজ্ঞেস করল। তারপর হঠাৎ তীক্ষ্ন গলায় চেঁচিয়ে উঠল, 'দেখ, দেখ, ঐ যে কী ওটা?'

ওয়ারলেস অপারেটার লাফিয়ে নামতে মুহূর্তের জন্য আমার দৃষ্টি ব্যাহত হল। রাইফেলটা হাতে নিয়ে একটা বিরাট বালিয়াড়ির ঢালের মুখে সে এগিয়ে গেল। দুটো বড় বালিয়াড়ির মাঝে একটা চেপটা বালিয়াড়ি। সেটার উপর দিয়ে কী যেন একটা গুঁড়ি মেরে এগোচ্ছে। যদিও বেশি দূর নয় তবু জিনিসটা যে কী আমি বা ড্রাইভার কেউই বুঝতে পারলাম না। মোচড় মেরে কুঁকড়ে পাক খেয়ে এগোচ্ছে। একবার কুঁকড়ে উঁচু হয়ে উঠছে আবার পর মুহূর্তেই নিজেকে সটান বালির উপর মেলে দিচ্ছে। মাঝে মাঝে মোচড়ান থেমে যাচ্ছে। প্রাণীটা গড়াতে গড়াতে ঢাল বেয়ে পড়ে যাচ্ছে।

'কী হতে পারে ওটা? সসেজের মতো দেখাচ্ছে,' গ্রিশা ফিসফিস করে আমার কানে কানে বলল। পাছে তার গলার আওয়াজ শুনে জন্তুটা ভয়ে পালিয়ে যায়।

সসেজই বটে। একটা জন্তু, তার না আছে মুখ, না আছে পা, না আছে

চোখ। হয়ত দূর থেকে চোখটা দেখতে পাচ্ছি না। একটা বিরাট মাংসপিণ্ডের মতোই দেখাচ্ছে। প্রায় এক মিটার লম্বা। দেহের প্রান্তদুটো হঠাৎ শেষ হয়ে গেছে। কোনটা মাথা কোনটা লেজ বোঝা যায় না। বিরাট মোটা পোকাটা। বেগুনি বালির উপর দিয়ে তার এঁকে বেঁকে ধীরে ধীরে চলার কুৎসিত ভঙ্গীটা কেমন যেন অত্যন্ত বিরক্তিকর, আবার নেহাৎ করুণ অসহায়। আমি প্রাণীতত্ত্ববিদ নই, কিন্তু তখুনি বুঝতে পারলাম জিনিসটা নাম গোত্রহীন কোন প্রাণী। মঙ্গোল দেশে অভিযানে বিভিন্ন জাতের প্রাণীর সঙ্গে অসংখ্যবার মোলাকাত হয়েছে, কিন্তু এই ধরনের কিছুর সঙ্গে যে সাক্ষাৎ ঘটাতে পারে সেকথা কোনদিন আমি কানেও শুনিনি।

'কী কুৎসিত জন্তুটা!' গ্রিশা চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'আমি চললাম ওটাকে ধরে আনতে, কিন্তু তার আগে দস্তানাটা পরে নিতে হবে।' চামড়ার দস্তানাটা হাতে নিয়ে লাফিয়ে গ্রিশা গাড়ীর বাইরে চলে গেল। 'দাঁড়াও একটু, থাম, থাম।' ওয়ারলেস অপারেটর একটা বিরাট বালিয়াড়ির উপর থেকে লক্ষ্য ঠিক করছিল; গ্রিশা তার উদ্দেশে চেঁচিয়ে বলল, 'জ্যান্তই ধরব, দেখ না ওটা হামাগুড়িও দিতে পারছে না।'

'ঠিক বলেছ! আরে ঐ তো ওর জুড়িটাও এসে গেছে।'

ঢালু বালিয়াড়ির গা বেয়ে প্রথমটার চেয়েও বড় একটা ঠিক ঐ জাতেরই সসেজ গড়িয়ে নেমে আসছে। ঠিক সেই মুহূর্তে দারখিন লরীর পিছন থেকে তারস্বরে চীৎকার করতে লাগল, সে চীৎকারে মানুষের রক্ত হিম হয়ে যায়। বোঝা গেল এতক্ষণ সে ঘুমিয়ে ছিল, চেঁচামেচিতে ঘুম গেছে ভেঙে। লোকটা "ওই... ওই..." ধরনের কী একটা বলে চীৎকার করছে।

বালিয়াড়িটার উপর গ্রিশাও গিয়ে ওয়ারলেস ওপারেটরের সঙ্গে জুটল। তারপর দুজনেই ছুটল জন্তুটার পিছনে। পরমুহূর্তে আমি লরী থেকে বেরিয়ে এলাম। ওদের সঙ্গে আমিও যোগ দেব বলে এগোচ্ছি হঠাৎ বুড়ো মঙ্গোলটা হুড়মুড় করে এসে ভালুক যেমন করে জড়িয়ে ধরে তেমনি করে আমায় ধরে ফেলল। ওর মুখটা ভয়ে বিকৃত হয়ে উঠেছে।

'ছেলেদের ফিরে আসতে বল, ডাক ডাক শীগ্‌গির ডাক, ওখানে সাক্ষাৎ মৃত্যু।' বুড়ো আবার আর্তস্বরে চীৎকার করে উঠল, 'ওই... ওই...'

দারখিনের এই অদ্ভুত ব্যবহারে আমি ভয় পাওয়ার চেয়েও বেশি হতভম্ব

হয়ে গেলাম। ড্রাইভার আর মিশাকে চীৎকার করে ফিরে ডাকতে লাগলাম। কিন্তু তারা জন্তুটাকে ধাওয়া করে চলেছে। আমার কথা গ্রাহ্য করছে না, কিম্বা হয়ত আমার ডাক ওদের কানেই পৌঁছয়নি। ওরা যেদিকে গেছে সেদিকে পা বাড়াতেই দারখিন আমার পিঠ ধরে টেনে রাখল। তার হাত ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগলাম, চোখ কিন্তু আমার জন্তুগুলোর দিকে নিবদ্ধ।

আমার দুই সহকর্মী, ওয়ারলেস অপারেটরই তাদের মধ্যে অগ্রণী, জন্তুগুলোর কাছে পৌঁছল। হঠাৎ জন্তুদুটো নিজেদের গুটিয়ে কুণ্ডলী করে ফেলল। আর তাদের গাটাও হলদে-ধূসর থেকে ক্রমে গাঢ় হয়ে বেগুনে-নীল রং ধরল। শরীরের দুই প্রান্তে পরিষ্কার ফুটে উঠল নীল রং। হঠাৎ ওয়ারলেস অপারেটর কুঁকড়ে উঠে নিঃশব্দে বালিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল, দেহটা তার নিশ্চল। জন্তুগুলো থেকে পাঁচ পা দূরে ওয়ারলেস অপারেটর পড়ে রয়েছে, ড্রাইভার সেদিকে দৌড়ে যেতে যেতে চীৎকার করছে। গ্রিশাও জোরে ছুটতে ছুটতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তার দেহটা ঢাল বেয়ে অন্যদিকে গড়িয়ে পড়ল, আর দেখা গেল না।

দারখিনের হাত থেকে নিজেকে জোর করে ছাড়িয়ে নিয়ে বালিয়াড়িটার দিকে দৌড়লাম। দারখিন কিন্তু জোয়ান ছেলের মতো ছুটে আমায় ধরে ফেলল। পায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বজ্রমুষ্টিতে সে আমার পা চেপে ধরল। আমরা দুজনে বালির উপর গড়িয়ে চলেছি। দারখিনের সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে মেজাজ একেবারে সপ্তমে চড়েছে। একটানে রিভলভারটা বের করে নিয়ে ওর দিকে বাগিয়ে ধরলাম — সেফটি ক্যাচটা খুট করে উঠল — দারখিন এবার আমায় ছেড়ে দিল। হাঁটু গেড়ে আমার দিকে দু'হাত মেলে দিয়ে ভাঙা গলায় বলে উঠল, 'মৃত্যু, মৃত্যু!'

রিভলভার হাতে দৌড়ে উঠলাম বালিয়াড়িটার মাথায়। আজব জন্তুগুলো তখন অদৃশ্য। তাদের চলার পথে বালিতে যে খাল হয়ে গেছে তার মধ্যে পড়ে আছে আমার সঙ্গীদের নিশ্চল দেহগুলি। দারখিন আমার পিছন পিছন দৌড়চ্ছিল। জন্তুগুলো পালিয়ে গেছে দেখে সেও নিশ্চল দেহদুটোর কাছে এসে দাঁড়াল। সঙ্গীদের দেহের উপর ঝুঁকে পড়ে দেখলাম প্রাণের কোন চিহ্নই নেই। মনটা অসহ্য বেদনায় ভরে উঠল। পাশে হেলান মাথাটা ঝুলছে,

মুখ প্রশান্ত, চোখ আধ-খোলা মিশা শুয়ে আছে। আকস্মিক একটা তীব্র ব্যথায় গ্রিশার মুখখানা বিকৃত। দুজনের মুখই নীল। মনে হয় কে যেন তাদের গলা টিপে মেরে ফেলেছে।

মালিশ আর কৃত্রিম নিঃশ্বাসের চেষ্টা ব্যর্থ হল। এমনকি দারখিন রক্তপাত করানরও চেষ্টা করল, কিন্তু তাতেও কোন ফল হল না। মরে একেবারে হিম হয়ে গেছে ওরা। আমরা তো তা দেখে একেবারে হতবাক। দীর্ঘদিন ধরে একসঙ্গে জীবন যাপন করে আমাদের বন্ধুত্ব অতি নিবিড় হয়ে উঠেছিল। ওদের নিজের ভাই বলে ভাবতাম। নিজের দোষের কথা ভেবে দুঃখ আরও বেড়ে উঠল... পাগলের মতো ওরা ধাওয়া করল, কিন্তু ওদের নিরস্ত করতে তো আমি কোন চেষ্টাই করিনি। আর ভাবতে পারছি না, সবকিছুর খেই সম্পূর্ণ হারিয়ে গেছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি। ব্যর্থ আশায় চারিদিকে দেখছি যদি জন্তুগুলোর দেখা পাই, তাহলে গুলি করে একেবারে ছিন্নভিন্ন করে ফেলব। বুড়ো দারখিন হাঁটুতে ভর দিয়ে বালির উপর বসে পড়ল। সে নিঃশব্দে কাঁদছে। হঠাৎ খেয়াল হল আমার জীবনের জন্য এই বুড়োর কাছেই আমি ঋণী।

মৃত দেহদুটো লরীর পিছনে তুলে নিলাম। এই সাংঘাতিক বেগুনি বালির রাজ্যে ওদের ফেলে যাবার কথা ভাবতেই পারি না। মনের কোণে বোধহয় কোথাও এই আশাই লুকোন ছিল — কোন এক অজ্ঞাত শক্তি এদের যাদু করে রেখেছে, এ মৃত্যু চরম নয়, আবার এরা বেঁচে উঠবে। দারখিন আর আমার মধ্যে কোন কথা হল না। যতক্ষণ না আমি গ্রিশার সিটে বসে ইঞ্জিনে স্টার্ট দিলাম ততক্ষণ তার ব্যস্ত দৃষ্টি আমায় অনুসরণ করে চলল। শেষ বারের মতো জায়গাটা দেখে নিলাম — বিশেষত্ব কিছুই নেই, মরুভূমির অন্যান্য অংশের মতোই এই জায়গাটিতে আমার দলের অর্দ্ধেক লোককে আমি হারিয়েছি। এক ঘণ্টা আগেও আমি ছিলাম শান্ত, একেবারে ভাবনা চিন্তাহীন। অথচ কী নিঃসঙ্গই না লাগছে এখন। গাড়ী চালিয়ে যাচ্ছি। প্রথম গিয়ারে ইঞ্জিন চলার একঘেয়ে করুণ সুর আমার বুকে কাঁটার মতো বিঁধছে। দারখিন আমার পাশে বসে। ভাল করে দেখে যখন বুঝল আমি নেহাত মন্দ ড্রাইভার নই, তখন কিছুটা নিশ্চিন্ত হল।

রাত্রে আমরা থামলাম জ্যোতিষ কেন্দ্রের কাছে। সেখানেই একটা লম্বা

পাথরের স্তূপের তলে আমার সঙ্গীদের সমাধিস্থ করলাম। দেখলাম তাদের দেহে এরই মধ্যে পচ ধরেছে, “পুনর্জন্মের” আশা চিরদিনের মতো নির্মূল হয়ে গেল।

গম্ভীর পাহাড়ে অঞ্চলের সেই স্তব্ধ রাত্রির কথা মনে করতে আজও আমার অত্যন্ত খারাপ লাগে। ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই কাল নুড়ির উপর দিয়ে যতজোর সম্ভব গাড়ী ছোটালাম। ভয়ংকর জনগারা গোবি যত পিছনে পড়ে, আমার মনও ততই শান্ত হয়। দলোন-খালি গোবি পার হওয়া অনভিজ্ঞ ড্রাইভারের পক্ষে বেশ কঠিন। কাজেই কিছুক্ষণের জন্য আমাদের এই সাংঘাতিক দুর্ভাগ্যের কথা ভুলে গেলাম।

আগুন লাগা পাহাড়ের কাছে থেমে দারখিনের সঙ্গে একবার ব্যাপারটা নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করা গেল। ও অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছে। অল্প হেসে বললে, ‘আমি বলছি মৃত্যু, তোমরা ছুটেই চলেছ। তারপর তোমাকে চেপে ধরলাম। সর্দার মরবে, সবাই মরবে! তুমি আমায় গুলি করতে উঠলে!’

‘আমি ছুটছিলাম ছেলেদুটোকে বাঁচাতে, নিজের কথা ভাবিনি।’

এই সাংঘাতিক বিপদের একটি মাত্র ব্যাখ্যা পেয়েছিলাম দারখিন আর বুড়ো মঙ্গোলদের কাছ থেকে। অতি প্রাচীন মঙ্গোলীয় উপকথায় পাওয়া যায়, বহুদূরের জনপ্রাণীহীন মরুভূমিতে “ওলগই-খরখই” নামে এক জাতীয় জীব থাকে। টুঁটি চাপা গলায় দারখিন যে “ওই, ওই” বলে চেঁচাচ্ছিল তার অর্থ এবার বুঝতে পারা গেল। ওলগই-খরখই কোনদিন আবিষ্কারকদের হাতে পড়েনি। তার প্রধান কারণ তারা বাস করে জলশূন্য মরুভূমিতে আর দ্বিতীয়ত মঙ্গোলদের মধ্যে ঐ জীব সম্বন্ধে এক অদ্ভুত ভয়। এই ভয়ের পিছনে যুক্তিও আছে। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি — জন্তুটা বহুদূর থেকে মেরে ফেলতে পারে। সে মৃত্যু ঘটেও তৎক্ষণাৎ। ওলগই-খরখই’এর কোন অলৌকিক শক্তি আছে কিনা সে কথা আমি হলপ করে বলতে পারি না। হয়ত তারা বৈদ্যুতিক শক্তি ক্ষরণ করে কিম্বা দূর থেকে কোন বিষ ছুঁড়ে দেয়। কিন্তু সবই “হয়ত”।

বিজ্ঞান আজও অবধি ওলগই-খরখই সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করেনি। কোন সৌভাগ্যবান আবিষ্কারক যদি কখনো মরুভূমিতে ওলগই-খরখই’এর সাক্ষাৎ পান তবেই তা সম্ভব হবে।

সাদা শিং
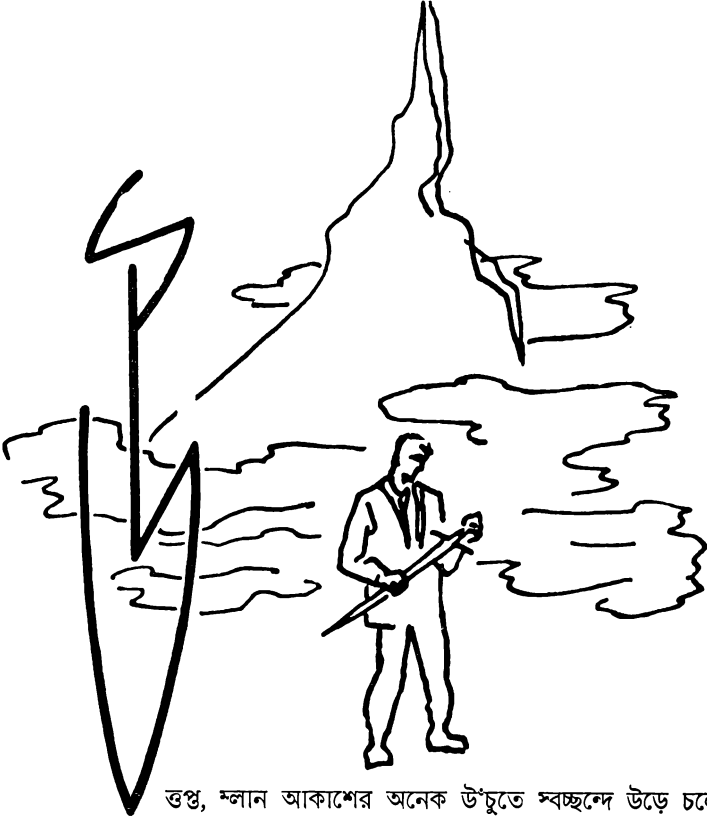
উত্তপ্ত, ম্লান আকাশের অনেক উঁচুতে স্বচ্ছন্দে উড়ে চলেছে একটা শকুন, ছড়ান ডানাগুলো প্রায় না নেড়েই।

উসোল্‌ৎসেভ ঈর্ষামিশ্রিত চোখে পাখিটার দিকে চেয়ে আছে। পাখিটা কখনো চোখ ঝলসান আকাশের অনেক উঁচুতে উঠে গিয়ে ফোঁটায় পরিণত হচ্ছে, কখনো বা সাঁ করে কয়েকশ ফুট নেমে আসছে।

শকুনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কথা মনে পড়তে উসোল্‌ৎসেভের মনে হল শকুনটা নিশ্চয়ই মড়ার সন্ধানে ঘুরছে। নিজের অজান্তেই সে শিউরে উঠল। এই মাত্র যে মারাত্মক বিপদ সে পার হয়ে এসেছে তা সহজে ভোলার নয়। মাথাটা তার একটু ঠাণ্ডা হয়েছে, কিন্তু শরীরের প্রতিটি মাংসপেশী, প্রতিটি স্নায়ু তখনো কাঁপছে। আরেকটু হলেই শিকারী পাখিটা তার ক্ষতবিক্ষত নিষ্প্রাণ শরীরটার উপরে বসে নিষ্ঠুর বাঁকা ঠোঁটদুটো দিয়ে তার মাংস ছিঁড়ে খেত। ঠিক এই মুহূর্তেই।

পাহাড়ের ভাঙ্গা গা থেকে গড়িয়ে পড়া, আগুনের মতো উত্তপ্ত পাথরে উপত্যকাটা ভরে গেছে। তার বুকে কোথাও জল, গাছপালা, এমনকি ঘাস পর্যন্ত নেই। রয়েছে কেবল নিচে ছুঁচলো, গুঁড়ো গুঁড়ো পাথর আর উপরে রোদে পোড়া, ফাটা পাথুরে পাহাড়।

ক্লান্তভাবে পাথরের উপর থেকে উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটুর দুর্বলতার মুণ্ডপাত করতে করতে উসোলৎসেভ পাথরের বুকে আওয়াজ তুলে থপ থপ করে এগতে লাগল। অবশেষে একটা ঝুঁকে পড়া পাথরের ছায়ায় তার ঘোড়াটাকে দেখা গেল। মনিবকে দেখেই বাদামী কাশ্‌গার ঘোড়াটা কানদুটো তুলে মৃদু স্বরে একবার "চিঁহিঁ" করে উঠল। ঘোড়ার বাঁধনটা উসোলৎসেভ খুলে দিল। তারপর গলা চাপড়ে আদর করে তার পিঠে চড়ে বসল।

দেখতে দেখতে উসোলৎসেভ উপত্যকার খোলা বুকে এসে পড়ল। পাহাড়ের কয়েক মাইল বিস্তৃত, চওড়া পাদদেশ হঠাৎ নেমে এল এক অপার, উন্মুক্ত স্তেপে। ধুলোর আবরণ আর ঢেউ খেলান গরম হাওয়ার পর্দায় স্তেপটা ঢাকা। দিগন্তের হলদে-ধূসর রেখাটার ওপারে, বহুদূরে ইলি উপত্যকা। মস্ত, খরস্রোত ইলি নদী চীনদেশ থেকে তার কফি রং জল বয়ে এনেছে। দুপারে তার বুনো জলপাই গাছ আর প্রস্ফুটিত আইরিস। কিন্তু এখানে, এই মন্ত্রমুগ্ধ পাথুরে রাজ্যে একফোঁটা জল কোথাও নেই।

স্তেপের পাৎলা ঘাসের ভিতর দিয়ে বয়ে চলেছে গরম শুকনো হাওয়া। ঘোড়া থামিয়ে উসোলৎসেভ রেকাবে ভর দিয়ে পিছন ফিরে ধূসর বাদামী পাহাড়টার দিকে একবার তাকাল। ছোট ছোট গিরিবর্ত্মে পাহাড়টা চেরা, তার ফলে অসমান তীক্ষ্ণ খাড়াইয়ে ভরে গেছে। মাঝখানের বিরাট, নিঃসঙ্গ, খাড়া চূড়াটা যেন মস্ত একটা উঁচনো শিং। তার ভাঙাচোরা ঢেউ খেলান

বুকটা স্তেপের গরম হাওয়ার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে। মাথায় একটা চোখ ধাঁধান উজ্জ্বল, সাদা দাঁত। কালো পাথরের বুকে তীক্ষ্ণভাবে ফুটে উঠেছে খাড়া বাঁকা দাঁতটা।

দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়টার দিকে তাকিয়ে উসোলৎসেভের গালদুটো লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল: একেবারে শেষ মুহূর্তে সে ভয় পেয়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। তিয়েন-শান অঞ্চলের দুঃসাহসী পর্যটক আর নির্ভীক ভূবিজ্ঞানী বলে তার খ্যাতি। সেই খ্যাতি আজ ধূলিসাৎ। সৌভাগ্যক্রমে এই দুর্দশার স্বাক্ষী কেউ নেই। সহকারী কাউকে সে সঙ্গে আনেনি। উসোলৎসেভ চোর চোর ভাব করে চারদিকটা একবার দেখে নিল, কিন্তু শুকনো মরুভূমিটা আগের মতোই জনপ্রাণীহীন। কেবল বাতাস ঘাসের সমুদ্রে ঢেউ তুলছে; স্তেপের পূর্বে পাহাড়ের প্রাচীর, তার মাথার উপরে কাঁপছে বেগনী রঙের অস্বচ্ছ কুয়াশা।

ঘোড়াটা অস্থির হয়ে উঠল।

'চল, বাদামী, বাড়ি যাবার সময় হয়েছে,' উসোলৎসেভ মৃদুস্বরে বলল।

বাদামী বেশ বাধ্যভাবে ঘাড় বাঁকিয়ে লাফিয়ে এগিয়ে গেল। তার ছোট ছোট খুরগুলো পাথুরে মাটির বুকে খটাখট আওয়াজ তুলছে। ঘোড়ার জোর কদমে উসোলৎসেভের স্নায়ু আরাম পেল।

দূর থেকেই চোখে পড়ল তাঁবুটা। ছোট্ট নদীর তীরে একটা রুপোলি বুনো জলপাইয়ের ঝাড়। তার ডালপালার সংকীর্ণ ছায়ার জালিতে গায়ে গা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুটো তাঁবু। ক্যাম্পফায়ার থেকে উঠেছে প্রায় অদৃশ্য ধোঁয়ার কুণ্ডলী। একটু দূরে একটা মোটা এল্‌ম্‌ গাছের তলায় আরেকটা তাঁবু। অন্যদুটোর চেয়ে অনেক বড় আর উঁচু। সে তাঁবুটার উপর চোখ পড়তেই উসোলৎসেভ বিষণ্ণ চিত্তে চোখ ঘুরিয়ে নিল।

'সবাই ফিরেছে, আর্স্লান?'

একজন বুড়ো উইগুর কুলী মস্ত কড়াইয়ে পোলাও রাঁধছিল। উসোলৎসেভকে দেখে সে ছুটে এল।

'না, কিন্তু শীগ্‌গির এসে পড়বে,' বুড়ো বলল।

'বাদামীর জিন আমি নিজেই খুলছি, তুমি বরং তোমার রান্না দেখ। দেখ, পোলাওটা যেন পুড়ে না যায়। আমি খাব না, বড্ড গরম।'

বুড়োর ছোট ছোট কালো চোখদুটো উসোলৎসেভের দিকে চেয়ে রইল। 'আবার তুমি আক-মিউন্‌গুজে গিয়েছিলে?'

'না!' উসোল্‌ৎসেভের গালদুটো লাল হয়ে উঠল: উইগুর ভাষায় সাদা শিং হচ্ছে আক-মিউন্‌গুজ। 'এমনি পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম।'

'বুড়োরা বলে আক-মিউন্‌গুজের উপর ঈগল পাখিও বসতে পারে না। চূড়াটা তলোয়ারের মতো ধারাল,' বুড়ো উইগুর বলল।

ইঙ্গিতটায় কোন কান না দিয়ে উসোল্‌ৎসেভ ঘোড়া থেকে নেমে পড়ল। তারপর জামাকাপড় ছেড়ে খালি পায়ে এগিয়ে গেল নদীটার দিকে। একটু দূরে নদীর ঠাণ্ডা শান্ত জল তীক্ষ্ম পাথরগুলোকে বেড় দিয়ে ছুটে চলেছে। মনে হচ্ছে যেন পড়ে আছে সাদা মখ্‌মলের একটা কোঁচকান লম্বা থান। উপত্যকার মারাত্মক নীরবতা আর শুকনো বাতাসের গোঙানির পর নদীর কলস্বর বড় ভাল লাগল।

স্নান করে চাঙা হয়ে উঠে উসোল্‌ৎসেভ একটা ছাতার নিচে হাতপা ছড়িয়ে বসে পড়ল। একটা সিগারেট ধরিয়ে ডুবে গেল নানা বিষণ্ণ চিন্তায়।

একটা পরাজয় বোধ তার এই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটাল। উসোল্‌ৎসেভের আত্মবিশ্বাস জোর নাড়া খেয়েছে। সাদা শিঙের দুর্লঙ্ঘ্যতার খ্যাতির কথা স্মরণ করে সে নিজেকে সান্ত্বনা দেবার অনেক চেষ্টা করল, কিন্তু তাতে কিছুই ফল হল না। তারপর তার বহুদিনের সুখ দুঃখের সাথী — যদিও ভেরা সে কথা জানে না — ভেরার কথা সে ভাবতে লাগল।

সেদিনের ব্যর্থতা তার মনোবল একেবারে ভেঙে দিয়েছে, মনে মনে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ সত্ত্বেও উসোল্‌ৎসেভ কোন রকমে উঠে ধীরে ধীরে এল্‌ম্‌ গাছের তলে তার তাঁবুর দিকে এগতে লাগল।

বহুদিনের বিচ্ছেদের পর ভাগ্য আবার তাদের কাছাকাছি এনেছে। ভেরা একটি অনুসন্ধানী দলের নেতা হয়ে এ অঞ্চলে এসেছে। উসোল্‌ৎসেভকেও এখানে পাঠান হয়েছে তার জরিপের দল শুদ্ধ। দুসপ্তাহেরও বেশি হয়ে গেল তাদের তাঁবুদুটো পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। কিন্তু ভেরা তবুও দূরেই রয়ে গেছে... ঐ সাদা শিঙের মতোই। প্রথমবার হতাশ হবার পর থেকে উসোল্‌ৎসেভ ভেরাকে সবসময় এড়িয়ে চলেছে, কেবল ভদ্রতার সম্পর্কটুকু ছাড়া আর কোন সম্পর্ক রাখেনি। এখন আবার সে ভেরার তাঁবুর দিকে এগিয়ে চলেছে...

আরো একটি পরাজয়, আরো একটি দুর্বলতার প্রমাণ। অবশ্য যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন — এখন আর কীই বা এসে যায়!

মোটা চশমা পরা একটি গোলগাল মেয়ে তাঁবুর কাছে বসে সেলাই করছিল। উসোল্‌ৎসেভকে এগিয়ে আসতে দেখে সে ঘাড় নেড়ে সাদরে অভিনন্দন জানাল।

'ভেরা বরিসভনা তাঁবুতে আছেন?' উসোল্‌ৎসেভ জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ আছে, বই পড়ছে, যেমন সবসময়ই করে।'

'ভিতরে আসুন, ওলেগ সের্গেয়েভিচ!' তাঁবুর ভিতর থেকে কেউ বলে উঠল, 'আপনার পায়ের শব্দ শুনেই চিনতে পেরেছি।'

'চেনার মতো কী বৈশিষ্ট্য তাদের আছে, শুনি?' দরজার কানাৎটা সরিয়ে দিয়ে উসোল্‌ৎসেভ বলল।

'আপনার মতোই তারা বিষণ্ণ।'

উসোল্‌ৎসেভের মুখ রাগে লাল হয়ে উঠল। কিন্তু খোঁচাটা হজম করে নিয়ে সে জোর করে বহুপরিচিত, চঞ্চল সোনালি দীপ্তিতে ভরা নিরুত্তাপ, ধূসর চোখদুটোর দিকে মুখ তুলে তাকাল।

'কিছু গণ্ডগোল হয়েছে নাকি?'

'না, না!' উসোল্‌ৎসেভ তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'আপনি শীগ্‌গিরিই চলে যাবেন, তাই ভাবলাম একবার এসে বিদায় জানিয়ে যাই।'

'তাই নাকি? আজকের দিনটা আমি বেশ কিছু না করেই আনন্দে কাটালাম। মেয়েদের পদ্‌গর্নিতে পাঠিয়েছি, কোন চিঠি আছে কিনা দেখে আসার জন্য। এখানে আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে। আমাদের ভবিষ্যৎ কাজের যে বদল হয়েছে অফিস থেকে তার বিজ্ঞপ্তি সপ্তাহ খানেক আগে এসেছে। আমাদের শীগ্‌গির নতুন এলাকায় যেতে হবে। তাই জিনিসপত্র সব বাঁধাছাঁদা হয়ে গেছে। এই বইটা ডাকে এসেছে, চমৎকার বই। ঘুম থেকে উঠেই পড়তে সুরু করেছি। পরশুই আবার অন্য জায়গায় চলে যাব — খুব সম্ভব কেগেনে। বড়ই দুঃখের কথা, এখানে ক্যাসিটেরাইটের কয়েকটা কেলাস ছাড়া আর কিছুই পাওয়া গেল না।'

'হ্যাঁ, বড় বড় সঞ্চয়গুলো পাহাড়ের চূড়ার সঙ্গে ভেঙে পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে।'

'একটা মাত্র পুরনো চূড়া এখনো বাকি আছে — সাদা শিং,' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভেরা বলল, 'কিন্তু আপনি বলছেন ওটা দুর্লঙ্ঘ্য। আমি কী বলি জানেন? একটা বড় কামান দিয়ে আপনি যদি শিংটার কিছুটা নামিয়ে আনতে পারেন, তাহলে দেখা যায় কী দিয়ে শিংটা তৈরী। তা না হলে ব্যাপারটা চিরকালই গোপন থেকে যাবে,' ঠাট্টার সুরে ভেরা বলল।

তার হাতের বইটা ভেরা একটা স্যুটকেসের উপর রেখে দিয়েছিল। উসোল্‌ৎসেভ বইটা তুলে নিয়ে বলল, '"এভারেস্ট আরোহণ"। সারাদিন তবে এই বই পড়ছিলেন।'

'চমৎকার বই! এর পাতায় পাতায় তুষার শুভ্র হিমালয়ের ছটা। এভারেস্টে চড়ার চেয়েও আসল রোমাঞ্চকর ব্যাপার হচ্ছে আরোহীরা প্রত্যেকে তাদের মনকে যে ভাবে ক্রমশ উপরে তুলেছে, সেইটে। এ যেন নিজের শক্তির উন্নতি ঘটানর জন্য মানুষের একান্ত প্রচেষ্টা।'

'আপনার কথা বুঝতে পেরেছি,' উসোল্‌ৎসেভ বলল, 'কিন্তু, তাহলেও তো এরা শেষ পর্যন্ত উঠতে পারেনি, তাই না?'

ভেরার চোখদুটো নিভে এল, 'আপনি বলতে চান এরা হার মানল। সে কথা এরা নিজেরাও স্বীকার করেছে। বলেছে, "আমাদের পক্ষে কোন ওজরই তোলা চলবে না। ন্যায় যুদ্ধেই আমরা পরাজিত হয়েছি। হার মেনেছি পাহাড়ের উচ্চতা আর তনুকৃত হাওয়ার কাছে,"' উসোল্‌ৎসেভের কাছ থেকে বইটা নিয়ে ভেরা পড়ে শোনাল।

'কিন্তু একটা অত্যন্ত কঠিন আর বিরাট কাজে মনপ্রাণ ঢেলে দেওয়া কি কম কথা, হক না তা আপনার ক্ষমতার অনেক ঊর্ধ্বে। আমি চোখের সামনে দেখতে পাছি ভয়াবহ, মারাত্মক এভারেস্ট চূড়া। বাতাস সেখানে এতই ভীষণ যে বরফ পর্যন্ত তার শীর্ষে দাঁড়াতে পারে না। আর চার পাশের পাহাড়ের গা ভয়ানক খাড়া। হিমবাহ আর আভালাঁশ্‌ ... কিন্তু তা সত্ত্বেও আরোহীরা দৃঢ়চিত্তে ক্রমশ উপরে উঠে চলেছে ... আমরা যদি এরকম কাজে নিজেদের আরো বেশি করে নিয়োজিত করতে পারতাম!'

ভেরার উত্তেজিত কথাগুলো উসোল্‌ৎসেভ নীরবে শুনে গেল। ভেরা হাঁপাতে হাঁপাতে থামলে পর সে বলল, 'এরকম কাজ খুব কম লোকই পারে, আর এভারেস্টও পৃথিবীতে মাত্র একটি!'

'তা মোটেই না, আপনিও তা জানেন! আমরা প্রত্যেকেই নিজের নিজের এভারেস্ট খুঁজে বের করতে পারি। আমাদের নিজেদের জীবনের নিদর্শন চান? যুদ্ধ — যুদ্ধ কত বীরের জন্ম দিয়েছে, নিজেদের কীর্তিকেও যারা ছাড়িয়ে গেছে।'

'এভারেস্ট চূড়াটা অত্যন্ত বাস্তব,' উসোল্‌ৎসেভ ছাড়ল না, 'অথচ আপনার কাল্পনিক এভারেস্ট খুঁজে পেতে খুব সহজেই ভুল হতে পারে।'

'বাঃ বেশ বলেছেন, ওলেগ সের্গেয়েভিচ!' ভেরা বিদ্রূপের ভঙ্গীতে চেঁচিয়ে উঠল, 'খাসা বলেছেন! আপনার এভারেস্টে উঠতে উঠতে হঠাৎ দেখলেন, — ঐ যাঃ, এ যে দেখছি উইয়ের ঢিবি — আমাদের চারপাশের এই পাহাড়গুলোর মতো। কী হাসির কথা!'

'চারপাশের এই পাহাড়গুলোর মতো...?' উসোল্‌ৎসেভ চমকে উঠে বলল।

সঙ্গে সঙ্গেই তার মনে পড়ে গেল — একটা খাড়া ঢালু পাথরের উপর সে উপুড় হয়ে পড়ে আছে, তার দুপাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে ছোট ছোট পাথর। প্রাণের ভয়ে সে পাথরটা চেপে ধরে রেখেছে। একটু নড়লেই সাড়ে তিনশ ফুট নিচে পড়ে মরতে হবে। উসোল্‌ৎসেভ ঐ অবস্থায় ভয়ের সঙ্গে লড়াই করে চলেছে, আর মিনিটগুলো ভীষণ ধীর পায়ে গুড়ি মেরে এগচ্ছে। কোনরকমে সাহস সঞ্চয় করে উসোল্‌ৎসেভ হঠাৎ পাশাপাশি এগিয়ে গিয়ে একটা ফাটল আঁকড়ে ধরল...

নিশ্চিন্ত মৃত্যুর সঙ্গে তাকে একেবারে নিঃসঙ্গ অবস্থায় নীরবে তীব্র সংগ্রাম করতে হয়েছিল।

কপালের ঘামটা মুছে ফেলে উসোল্‌ৎসেভ ঘুরে দাঁড়াল। তারপর একটিও কথা না বলে তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

কোণে পাথর চাপা দিয়ে আটকে রাখা ম্যাপটার উপর চারজন লোক ঝুঁকে পড়েছে। দলপতি একটা ভাঙা নখ দিয়ে ম্যাপের গায়ে লাইন টেনে চলেছে।

'সমতলের উত্তর-পূর্ব সীমায় আমরা পৌঁছেছি। এইখানে উপত্যকাটা, ওলেগ সের্গেয়েভিচ। ওখানে আরেকটা ফল্‌ট্‌ আছে, তার পাশে প্রাচীন

ডিওরাইট্ — আমাদের মেটামর্ফিক সিরিজের ছোট্ট দ্বীপটার শেষ প্রান্ত।'

অন্ধকার হয়ে আসা পর্যন্ত লোকটি নমুনা দেখাবার জন্য তার ছোট ছোট থলেগুলোকে তাড়াতাড়ি খুলে চলল।

উসোল্‌ৎসেভ ম্যাপ দেখছে। ম্যাপের সবকিছু তার মুখস্থ। ঢেউ খেলান অনুভূমিক আর টেকটনিক রেখা, আকরের রঙিন ছোপ আর তীরের সাহায্যে চারপাশের অঞ্চলটার ইতিহাস পড়ে চলেছে। এই সেদিন মাত্র — ভূবিজ্ঞানীর কাছে দশ লক্ষ বছর তো কিছুই না — নিচু সমমালভূমিটা ফেটে যায়। ফাটলের দুপাশের বিরাট বিরাট জায়গা হয় উঁচুতে উঠে যায়, নয় তো নিচে ডুবে যায়। উত্তরে, এখন যেখানে স্তেপের বুক দিয়ে ইলি নদী বয়ে চলেছে, সেখানে একটা খাদের সৃষ্টি হয়। তাঁবুর দক্ষিণে দেখা দেয় একটা বিরাট পাথুরে সিঁড়ি। ধাপের গাটা রোদ, জল, বাতাসের প্রভাবে ক্ষয়ে গিয়ে এলোমেলো এক সারি পাহাড়ের চূড়ায় পরিণত হয়। চূড়াগুলোর উপরের স্তর আল্‌গা মাটি আর বালিতে ভেঙে ভেঙে পড়ে নিচু খাদের ভিতর। কিন্তু নিচের ধাপের পাললিক মাটির নিচে আকর পাওয়া যাওয়া উচিত কারণ তার ত্বকের কোন ক্ষয় ঘটেনি। পাহাড়ের অন্য জায়গার যে সব আকর নষ্ট হয়ে গেছে সেগুলো এখানে পাওয়া সম্ভব।

পাললিক স্তর ভেদ করতে পারলেই হয়, উসোল্‌ৎসেভ ভাবতে লাগল। স্তরের ঘনত্ব শখানেক ফুটের বেশি হবে না। পাহাড়ের উঁচু স্তরে কী পাওয়া যাবে তা জানার আগে এরকম একটা কাজে হাত দেওয়া যেতে পারে না। অথচ এই গোপন কথাটা একমাত্র সাদা শিংই বলতে পারে। নিচ থেকে দেখা যায় তার দুরারোহ শৃঙ্গের উপর স্তরের একটা ছোট্ট দ্বীপ। পরিবর্তিত শিলা আর রহস্যময় সাদা চূড়ার মধ্যবর্তী সীমানা পরিষ্কার চোখে পড়ে — একটুখানি ফল্‌টের দিকে ঝুঁকে আছে, তার মানে সাদা শিলা তা সে যা দিয়েই তৈরী হক না কেন, অবনত অঞ্চলে সংরক্ষিত রয়েছে।

কিন্তু সাদা শিং হচ্ছে মন্ত্রঃপূত পাহাড়। তার পায়ের কাছে হাজার খুঁজেও শিঙের একটা শিলাও পাওয়া যায়নি। শিংটা নিশ্চয়ই ক্ষয়হীন এডামান্টাইন শিলায় তৈরী। তাছাড়া ভেরাও বলেছে, টিনস্টোনের বড় কেলাসদুটো আক-মিউন্‌গুজের পায়ের কাছেই পাওয়া গেছে।

উসোল্‌ৎসেভের দৃঢ়বিশ্বাস মাটির গভীরে যে খনিজ সম্পদ রয়েছে তার চাবিকাঠির সন্ধান পাওয়া যাবে সাদা শিঙের মাথায়। ঐ মাথায় উঠতে গিয়ে সে প্রায় প্রাণ দিতে বসেছিল। টিন! উসোল্‌ৎসেভ ভূবিজ্ঞানী। তাই এদেশে এখন টিনের যে ভীষণ প্রয়োজন তা সে ভাল করেই জানে। এই অনুসন্ধানকে সে তাই তার অবশ্য কর্তব্য বলে মনে করে ।

উসোল্‌ৎসেভের সহকারীরা ততক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে। রাত্রের ঠাণ্ডা হাওয়া রোদে পোড়া মাটির গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। কালো পাহাড়ের গায়ে সবুজ জলপ্রপাতের মতো ঝরে পড়ছে চাঁদের আলো। তাঁবুর কাছেই উসোল্‌ৎসেভ হাওয়ার দিকে মুখ করে শুয়ে পড়ল, কিন্তু ঘুম আর কিছুতেই আসে না।

বার বার সে তার সাদা শিঙে ওঠার অভিজ্ঞতা মনে করতে লাগল। নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে কোনরকমে সে ফিরে এসেছে। উসোল্‌ৎসেভ জানে আবার সেই একই বিপদের ঝুঁকি তাকে নিতে হবে।

“এখন গেলে কেমন হয়, ভোরের আগেই?” উসোলৎসেভ হঠাৎ মনে মনে বলে উঠল। চাঁদের আলো থাকতে থাকতেই গোঁজগুলো বের করে নিতে হবে।

নিঃশব্দে উঠে সে চলে গেল তাঁবুর পাশে সরঞ্জামের বাক্সটার কাছে। সযত্নে বের করে নিল গোঁজগুলো।

এল্‌ম্‌ গাছের ওধার থেকে মৃদু গানের সুর ভেসে এল। উসোল্‌ৎসেভ মাথা তুলল: ভেরা গাইছে, “হে রাজপুত্র, প্রেম আমার জয় করে নাও, কঠোর পরীক্ষা আর বীরত্বের প্রমাণ দিয়ে...” তার গান ধীরে ধীরে চাঁদের আলোয় ভরা স্তেপের বুকে ছড়িয়ে পড়ছে।

উসোল্‌ৎসেভ উঠে পড়ে তার বিছানার দিকে ফিরে গেল। না, ভেরা চলে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে নিজেকে সে বোঝাল। “যদি কিছু ঘটে, তাহলে ও ভাববে ওর জন্যই আমি এই বিপদের ঝুঁকি নিয়েছি। তার উপর আবার এভারেস্ট নিয়ে ঐ আলোচনা। ঐ এভারেস্টই বটে, কেবল হাজার ফুট উঁচু এই যা...”

‘আজ আমরা কোথায় যাব ওলেগ সের্গেয়েভিচ?” ওয়ার্কিং পার্টির দলপতি উসোল্‌ৎসেভকে জিজ্ঞেস করল।

'কোথাও না, প্লেনটেবলের শেষে আমরা পেঁছে গেছি। দুদিন সময় দিচ্ছি, এর মধ্যে যে সব তথ্য আর নমুনা পেয়েছি সেগুলোকে তোমরা গুছিয়ে ফেল। পরশু কির্গিজ-সাইয়ে গিয়ে একটা গাড়ি নিয়ে আসতে হবে।'

'তাহলে আরো সীমানার দিকে যেতে হবে?'

'হ্যাঁ, তাকির-আচিনখোয়।'

'সুখবর। ওদিকে পাহাড়গুলো বেশ উঁচু আর ছায়াওয়ালা গাছের ঝাড়ও পাওয়া যাবে। এই তপ্ত কড়াই থেকে বেরতে পারলে বাঁচি। তুমি আজ বিশ্রাম করবে তো?'

'না, আমি একবার বড় ফল্‌টটার ওদিকটা ঘুরে আসব বলে ভাবছি।'

'আক-মিউন্‌গুজের কাছে?'

'আরো এগিয়ে।'

'একটা কথা তোমায় বলতে ভুলে গেছি... আমি যখন আক-তামে ছিলাম, তখন এক সীমান্ত প্রহরীর কাছে শুনেছিলাম, একদল পর্বতারোহী নাকি একবার সাদা শিঙে চড়ার জন্য এসেছিল। আল্‌মা-আতা থেকে একদল সুদক্ষ পর্বতারোহীকেও পাঠান হয়েছিল...'

'তারপর?' উসোল্‌ৎসেভ সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল।

'ওরা বলে গেছে সাদা শিঙে ওঠা একেবারেই অসম্ভব।'

ঘোড়ার পিছন পিছন ছুটে চলেছে ধুলোর মেঘ। উসোল্‌ৎসেভের অপরাজেয় প্রতিপক্ষ তার দিকে চেয়ে আছে। মনে হচ্ছে মস্ত একটা ষাঁড় যেন স্তেপের উপর তার বিরাট বুকটা বের করে চারদিকের ঢেউ খেলান পাহাড়ের মাঝখান থেকে দাঁড়িয়ে ওঠার চেষ্টা করছে। যত শুকনো কাঁটাওয়ালা ঘাসের ডাঁটা বাতাসে তার পায়ের কাছে জড় হয়েছে। বহুকাল আগে এখানে একটা ফল্‌ট্‌ ছিল। একজোড়া বিরাট পাহাড় ঠাঁই বদল করতে করতে এইখানে এসে ধাক্কা খায়। সেই সংঘর্ষের ছাপ এখনো রয়ে গেছে—সাদা শিঙের বুকটা চকচকে মসৃণ।

উসোল্‌ৎসেভ খুব ভাল করে দেখল কিন্তু পাহাড়ের এদিকে কোথাও এমন কি দেড়শ ফুটের উপর ওঠারও উপায় নেই।

পূবদিকের ঢালটা সরু হতে হতে একেবারে ক্ষুরের মতো ধারাল হয়ে উঠেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম ধারটাই বেশি সুবিধাজনক। ঐদিকে উপত্যকাটা সাদা শিংকে অন্য পাহাড়গুলোর থেকে আলাদা করে রেখেছে। উসোল্‌ৎসেভ উপত্যকার বুক থেকে পাহাড়টার প্রায় একতৃতীয়াংশ উঠতে পেরেছিল। বাকি দুই তৃতীয়াংশ আর পারেনি, তার প্রতিটি ফুট মনে হয়েছিল দুর্লঙ্ঘ্য।

মাথা তুলে চূড়াটার দিকে উসোল্‌ৎসেভ তাকাল। দড়িদড়া আংটা প্রভৃতি বিশেষ উপকরণ যদি থাকত, সেই সঙ্গে অভিজ্ঞ সঙ্গী... কিন্তু পর্বতারোহীরাও যখন হার মেনে ফিরে গেছে তখন আর এসব কথা ভেবে কী লাভ!

ধীরে ধীরে উসোল্‌ৎসেভ পাহাড়টাকে বেড় দিয়ে পাথুরে উপত্যকাটার মুখে এসে পোঁছল।

মনে মনে সে বলল, এভারেস্ট আর হিমালয়ের অন্যান্য চূড়া — পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে উঁচু। তাদের একটা রোমাণ্টিক আকর্ষণ আছে। এড্‌ভেঞ্চারের জন্য যদি পাহাড়ে উঠতে হয়, তাহলে তাকে বেশি দূরে যেতে হবে না। কাছেই রয়েছে খাঁ-তেংরির অত্যুজ্জ্বল নীল চূড়া, হীরকাভ সারিজা — তুষার ধবল, দুরারোহ পাহাড়, স্বচ্ছ দ্যুতিময় আবহাওয়া আর নিষ্কলুষ আলোর মায়াময় জগৎ। এতে মনে বেশ একটা বীরত্বের ভাব দেখা দেয়।

এখানে ভেঙে পড়া পাহাড়গুলো নিচু, বিষণ্ণ। গরম আকাশে ঘোলাটে গোলাপী আভা। বাতাস ধুলোয় ভরা। তার অস্বচ্ছ পর্দা গরমে কাঁপছে। কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দেবার মতনও নয়। এই গরম, ঝোড়ো বাতাসের দেশটারও নিজস্ব সৌন্দর্য আছে। প্রাচীন আধভাঙা পাহাড়গুলোর রয়েছে একটা অদ্ভুত বিষণ্ণ মোহন রূপ। এমনকি দিগন্তের ম্লান, বিবর্ণ মেঘগুলোতেও করুণ, নীরস এশিয়া, তার নগ্ন পাথুরে মাটি আর অতল নীল আকাশের ছাপ পড়েছে।

উসোল্‌ৎসেভ তার আগের দিনের পাহাড়ে চড়ার প্রচেষ্টাটা একবার মনে করে নিল। কালো শেলের উপর দিয়ে গিয়েছে পেগ্‌ম্যাটাইট্ স্তর, যেন ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত মাংস। অভ্রমেশান শিরাগুলো ধরে উসোল্‌ৎসেভ উঠেছিল আরেকটা স্তর পর্যন্ত। শিরাগুলো পার হয়ে স্তরটা আড়ভাবে এগিয়ে গেছে। কিন্তু তারপর সে আর এগতে পারেনি। চেষ্টা যে করেনি, তা নয়। পোকার মতো এঁকেবেঁকে সে পাহাড়ের খাড়া গা বেয়ে উঠতে চেষ্টা করেছিল। ঢালটা

পাথরের টুকরোয় ভর্তি। একটু ছুঁলেই পাথরগুলো গড়িয়ে যায়। ঐখানেই সে প্রায় মরতে বসেছিল।

ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে উসোল্ৎসেভ পাহাড়টাকে পাক দিয়ে আরো কিছুটা এগল। নাঃ, কোনই লাভ নেই। ঐ খাড়া গা বেয়ে ওঠা অসম্ভব। পাহাড়ের উত্তর-পশ্চিমে বের করা ঐ জায়গাটায় উঠতে পারলেই হয়। চূড়াটা আর ঐ জায়গাটার মাঝখান দিয়ে তবে সহজেই ওঠা যায়। কিন্তু ঐ বের করা জায়গাটায় সে দাঁড়াবে কী করে? শিঙের উপর থেকে দড়ি ফেলে টেনে তোলার মতো তো কেউ নেই।

কল্পনার দড়িটা নজর করে দেখতে দেখতে হঠাৎ চূড়ার ভিতের কাছে একটা খাঁজ চোখে পড়ল। মারাত্মক সাদা শিংটা যেখান থেকে উঠেছে কালো পাথরের খাঁজটা ঠিক সেইখানেই। খাঁজটা চূড়ার দিকে ঢালু হয়ে গেছে; তল থেকে প্রায় দেখাই যায় না।

"আশ্চর্য," উসোল্ৎসেভ মনে মনে বলল, "আগে তো ওটা দেখিনি, কিন্তু কী বা লাভ? ওটাও তো ঐ শিংটার মতোই অনেক উঁচুতে।"

'সন্ধ্যাটা বেশ ঠাণ্ডা!' ওয়ার্কিং পার্টির দলপতি চায়ের আশায় কম্বলের উপর ঢলে পড়ে বলল।

'সপ্তমী অষ্টমীতে সব সময়ই এরকম হয়। এর পর, ওদিক থেকে জোর হাওয়া বইতে সুরু করবে,' ইলির দিকে হাত দেখিয়ে আর্স্লান বলল, 'কখনো কখনো এসময় বেশ শীত পড়ে।'

'ভালই, যাবার আগে একটু বিশ্রাম করে নেওয়া যাবে, তাই না, ওলেগ সের্গেয়েভিচ?'

উসোল্ৎসেভ নীরবে মাথা নাড়ল।

'অধ্যক্ষ কেমন যেন হয়ে গেছে,' আর্স্লান হাসল, চোখদুটো কিন্তু আগের মতোই গম্ভীর। 'অধ্যক্ষ প্রেমে পড়েছে। আক-মিউন্‌গুজের প্রেমে। তাড়াতাড়ি আচিনখোয় ফিরে যাওয়া ভাল। ভালবাসতে হলে বাপু মেয়েদেরই বেস— সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যাবে। আক-মিউন্‌গুজকে তো তা পারা যাবে না।'

সবাই হেসে উঠল। উসোলৎসেভও হাসি চেপে রাখতে পারল না।

এই ছোট্ট রসিকতার সাফল্যে উৎসাহ পেয়ে আস্লান বলে চলল, 'আমাদের উইগুরদের মধ্যে একটা পুরনো গল্প চালু আছে, এক বীর সৈনিকের আক-মিউনগুজ চড়ার গল্প।'

'তা গল্পটা চেপে যাচ্ছ কেন, আস্লান? আমাদেরও শুনতে দাও!' দলপতি বলল।

"ভাল! চা বানিয়ে গল্প বলব,' সায় দিল আস্লান।

চায়ের কেটলিটা কম্বলের উপর রেখে বুড়ো আস্লান পেয়ালা আর বানগুলো বের করল। তারপর পা মুড়ে বসে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে সুরু করল তার গল্প।

আস্লান জাতে উইগুর। রুশ বলে ভাঙা ভাঙা। কিন্তু তা সত্ত্বেও উসোল্‌ৎসেভ বিশেষ মন দিয়ে তার গল্প শুনতে লাগল। নিজের কল্পনার সাহায্যে সে গল্পটায় নানা রং মাখিয়ে চলল। অবশ্য প্রাচীন গল্পটার মূল চেহারাটাও নিঃসন্দেহে এরকমই রোমাণ্টিক।

আস্লান বলল, গল্পের ঘটনাটা ঘটেছে মাত্র শ' তিনেক বছর আগে। উসোল্‌ৎসেভ তা শুনে অত্যন্ত বিস্মিত হল। তার নিজের চিন্তার সঙ্গে গল্পটা এতই মিলে গেল যে সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পরেও উসোল্‌ৎসেভ তারার আলোয় ভরা আকাশের দিকে চেয়ে আস্লানের গল্পের প্রতিটি খুঁটিনাটি নিয়ে ভাবতে লাগল।

বুড়ো উইগুর আস্লানের গল্পটা হচ্ছে এই।

এই দেশটা এককালে ছিল এক মহাপরাক্রমশালী বীর খাঁর অধীনে। তাঁর যাযাবর প্রজাদের ছিল অসংখ্য গোরুভেড়ার পাল। পাশের অঞ্চলগুলোয় হানা দিয়ে সেই পাল তারা বাড়িয়েই চলত।

একবার খাঁ অনেক লোকজন নিয়ে এক দীর্ঘ অভিযানে বেরিয়ে পেঁছিলেন তালাসে। তারপর সাদির-কুরগানের প্রাচীন প্রাচীরের কাছে এসে পড়লেন একদল ভ্রাম্যমাণ ডাকাতে উপজাতির হাতে। ভীষণ লড়াইয়ের পর ডাকাতরা ছত্রভঙ্গ অবস্থায় পালাতে বাধ্য হল।

খাঁর অনেক ধনদৌলত লাভ হল। কিন্তু বন্দী মেয়েদের একজনকে দেখে খাঁ যেমন খুসি হলেন এমন আর কিছুতেই নয়। মেয়েটি ছিল পরাজিত

ডাকাত সর্দারের প্রেয়সী। তার সৌন্দর্য এদেশের মেয়েদের সৌন্দর্যের সঙ্গে এতটুকুও মেলে না। পুরুষরা সবাই তো তাকে দেখে মুগ্ধ।

মেয়েটির বাবা কোকান্দের শক্তিশালী রাজার উজীর। দূর দেশ থেকে সে তার বাবার কাছেই যাচ্ছিল। এমন সময় ফেরঘানার উপত্যকায় তাকে ডাকাতে ধরে।

খাঁ তাঁর বন্দিনীকে তো নিজের দেশের পাহাড়ের অঞ্চলে নিয়ে এলেন। তারপর বহুপ্রাচীন প্রথানুযায়ী তাকে খাঁর আর তাঁর বড় দুই ছেলের প্রেয়সী করে নেওয়া হল।

এক বছর যায়, দুবছর যায়। কারকারার ফুলে ভরা উপত্যকায় খাঁ যখন তাঁবু ফেলেছিলেন তুষার স্তর তারপর পাহাড়ের আরো উপরে উঠেছে। খাঁ এক মহাভোজের আয়োজন করেছেন। চারপাশের সব মিত্রজাতির অতিথিরা আসতে সুরু করেছেন। উপত্যকা তাই ক্রমেই তাঁবুতে ভরে উঠছে।

এমন সময় হঠাৎ দীর্ঘকায় এক যোদ্ধা এসে উপস্থিত, কালো বিষণ্ণ তার চেহারা। সঙ্গে লোকজন কেউ নেই। ঘোড়ার বদলে মস্ত এক সাদা উটে চড়ে সে এসেছে। ছোট ছোট রেশমের মতো নরম লোম উটটার গায়ে। লোকটির মুখ কালো কাপড়ে ঢাকা। মাথায় ধাতুর চ্যাপ্টা মাথা শিরস্ত্রাণ; নাকের কাছেও ঢাকনা। গায়ের চওড়া বর্মটা প্রায় হাঁটুর কাছ পর্যন্ত নেমেছে। পাদুটো ফাঁকা কিন্তু কালো চামড়ার ফালি দিয়ে বাঁধা। লোকটির সঙ্গে রয়েছে একটা তলোয়ার, দুটো ছোরা, একটা ছোট ঢাল আর একটা লম্বা হাতলওয়ালা পরশু।

বীর সৈনিক এসেই বলে বসল তাকে খাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া চাই। খাঁর কাছে গিয়ে সে খাঁর সাদা কম্বলের উপর একে একে তার সব অস্ত্রশস্ত্র নামিয়ে দিল। তারপর মুখোস খুলে বেশ আত্মমর্যাদার সঙ্গেই কুর্ণিশ করল খাঁকে।

লোকটির মুখ দেখেই বোঝা গেল অনেক দুঃখকষ্ট আর মানসম্মান সে পেয়ে এসেছে। তার মুখে রয়েছে যোদ্ধা আর লোকনেতার ছাপ, বীর সৈনিকের অভিব্যক্তি, যার মানসম্মানে কখনো কোন কালিমা স্পর্শ করেনি।

আগন্তুক অতিথির দিকে তাকিয়ে খাঁর মন আপনা থেকেই প্রশংসায় ভরে উঠল।

'শাহান্‌শাহ্‌!' বীর সৈনিক খাঁর উদ্দেশে বলল, 'আমি বহুদূর দেশ থেকে আসছি, উত্তপ্ত লোহিত সাগরের তীরে সূর্যের প্রচণ্ড তাপ যেখানে মৃত মরুভূমিকে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়, সেই দেশ থেকে। দীর্ঘকাল ধরে, বহু বিপদ আপদের মধ্যে দিয়ে আমি খুঁজতে খুঁজতে এসেছি। কোকান্দ আর ইস্সিক-কুলের নীল হ্রদের মাঝখানে যে সব পাহাড়পর্বত, উপত্যকা আছে সেখানে আমি বহুকাল ঘুরে বেড়িয়েছি। অবশেষে লোকমুখে আপনার কথা শুনে এখানে এসেছি। অনুগ্রহ করে বলুন, তালাসের ডাকাতদের কাছ থেকে কোন মেয়েকে আপনি নিয়ে এসেছেন কি, সেই মেয়েটিকে কি আপনি সেইদুরুশ বলে ডাকেন?'

খাঁ ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন, বীর সৈনিক বলে চলল:

'মেয়েটি আমার বাগ্‌দত্তা বধূ। আমি শপথ নিয়েছি, ত্রিলোকের কোন শক্তিই আমাকে তার কাছ থেকে নিয়ে যেতে পারবে না। তিন বছর আমায় ভারত সীমান্তে আর তার'এর ভীষণ মরুভূমিতে লড়াই করে কাটাতে হয়। বাড়ি ফিরে এসে দেখি, আমি মারা গেছি ভেবে বাড়ির লোকেরা আমার বাগ্‌দত্তা বধূকে তার বাবার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। তখন থেকে আমি দীর্ঘ, বিপজ্জনক পথে ঘুরছি। অনেক লড়াই করতে হয়েছে, সহ্য করতে হয়েছে ক্ষিদে তেষ্টার জ্বালা। কত যে অপরিচিত রাজ্য পার হয়ে আমি আপনার সামনে এসে দাঁড়িয়েছি তা আর মনেও নেই।

'আমি আমার শ্রেষ্ঠকাল পার হয়েছি, কিন্তু আমার প্রেম তবু আগের মতোই অক্ষুণ্ণ আছে। আপনিই এখন বলুন: আমার বধূর জন্য নিজের উপযোগিতার প্রমাণ কি আমি দিইনি? তাকে আমার এই বুকে ফিরিয়ে দিন, জাঁহাপনা, আমি জানি সে আমার বিশ্বাসের মর্যাদা নষ্ট হতে দেয়নি, সে চিরকাল বিশ্বাস করে এসেছে, আমি ফিরব।'

খাঁর ক্রূর কঠোর মুখে একটা হাসি চমকে উঠল। খাঁ বললেন:

'হে প্রকৃত বীর সৈনিক, অতিথি হিসাবে তোমায় সাদর অভ্যর্থনা জানাই। এই ভোজের আসরে তোমায় আমাদের মাঝখানে পেয়ে আমরা আনন্দিত। ভোজ শেষ হলে পর তোমায় আমাদের বাসস্থানে নিয়ে যাব, তারপর আল্লার ইচ্ছা যেন পূরণ হয়।'

বীর সৈনিক খাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ করল।

আনন্দ যখন খুব জমে উঠেছে, খাঁ তখন তাঁর বৈতালিক দলকে ডেকে পাঠালেন। তারা প্রথমে গাইল খাঁর প্রিয় গান—পাহাড়ে ঈগলের গান। তারপর গাইল খাঁ আর তাঁর ছেলেদের আদরের ধন সেইদুরুশের বন্দনা।

খাঁ গান শোনেন আর থেকে থেকেই বীর সৈনিকের দিকে চেয়ে দেখেন; তার মুখ ক্রমশই কালো হয়ে উঠছে। তারপর উঠল এক বুড়ো গাইয়ে, সবার গর্বের বস্তু সে। তার গানে খাঁ আর তাঁর ছেলেদের প্রতি সেইদুরুশের গভীর মদির প্রেমের কথা প্রকাশ পেতেই বিদেশী সৈনিক বিদ্যুৎবেগে লাফিয়ে উঠে চেঁচিয়ে উঠল, 'খামোশ্, মিথ্যেবাদী! যার পায়ের কাছে নত হওয়ার যোগ্যও তুই নস, তাকে তুই অপমান করিস, এত বড় তোর স্পর্ধা?'

অতিথিদের মধ্যে শোনা গেল রাগের গুঞ্জন। প্রবীন বীর সৈনিকরা এসে দাঁড়াল অপমানিত চারণের পাশে। রগচটা তরুণেরা বিদেশীর অভদ্রতায় হয়ে উঠল ক্ষিপ্ত। দুজন তো বিদেশী যোদ্ধার উপর ঝাঁপিয়েই পড়ল, কিন্তু বিদেশী তার বিশাল বাহুর এক ঝটকায় তাদের সরিয়ে দিল।

খাঁর ভোজের আসরে বেজে উঠল অসি ঝঞ্চনা। বীর সৈনিক তার অস্ত্রের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে ঢাল আর দীর্ঘ পরশুটা তুলে নিয়ে দেয়ালে পিঠ দিয়ে রুখে দাঁড়াল। অনড় অটল পাথরের উপর সমুদ্রের ঢেউ যেভাবে ভেঙে পড়ে আক্রমণকারীরা সেইভাবে বিধ্বস্ত হতে লাগল। কিন্তু তবু তাদের আক্রমণের আর শেষ নেই।

প্রথমে একজন, তারপর তিনজন, তারপর আরো পাঁচজন লোক রক্তাক্ত দেহে মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল, কিন্তু বিদেশী সৈনিকের দেহে একটি আঁচড়ও লাগল না। বিদ্যুৎবেগে ডাইনে বাঁয়ে পরশু চালিয়ে খাঁর সেরা সৈনিকদের সে ঘায়েল করেই চলেছে, মুখ তার ক্রমশই ভীষণ থেকে ভীষণতর হয়ে উঠছে, আর পরশুর ঘা প্রবল থেকে প্রবলতর।

অবশেষে খাঁ ধমকে উঠে আক্রমণকারীদের ফিরিয়ে আনলেন। বিদেশী সৈনিক তার পরশু নামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল—রক্তমাখা শরীর, সে এক ভীষণ দৃশ্য।

'যার ঔদ্ধত্যে এত রক্তপাত ঘটল, সে কী চায়?' খাঁ বিদেশী সৈনিকের উদ্দেশে চেঁচিয়ে উঠলেন।

'সত্য,' জবাব দিল বিদেশী সৈনিক।

'সত্য? তা তুমি পাবে। তবে, সারা জীবনে যে একটিও মিথ্যাকথা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করেনি তার কাছ থেকে শুনে রাখ, চারণ যা গেয়েছে তা সর্বৈব সত্যি।'

বিদেশী সৈনিক তার পরশু আর ঢাল ফেলে দিল। দুঃখেকষ্টে জর্জর মুখটা হঠাৎ যেন বুড়িয়ে গেল।

'এখনো কি তুমি চাও, সেইদুরুশকে আমরা তোমায় ফিরিয়ে দিই?' খাঁ জিজ্ঞেস করলেন।

বিদেশী সৈনিকের চোখদুটো জ্বলে উঠল। সে খাড়া হয়ে দাঁড়াল, ভীষণ আঘাতের পরেও আরবী তলোয়ার যেমন খাড়া থাকে।

'হ্যাঁ, জাঁহাপনা,' একটুও দ্বিধা না করে সে বলে উঠল।

খাঁর ঠোঁটদুটো একটা অলক্ষুণে হাসিতে বেঁকে উঠল।

'ঠিক আছে, দেব। কিন্তু তোমায়ও তার জন্য একটা বড় দাম দিতে হবে।'

'আপনার আদেশের অপেক্ষায় রইলাম!' বিদেশী সৈনিক নির্ভয়ে বলল।

খাঁ একমুহূর্ত ভাবলেন। তারপর অতিথিদের দিকে ফিরে বললেন:

'আমরা এখন "বৃষবর্ষে"। আক্-মিউন্‌গুজের কাছে যে প্রাচীন মন্দির রয়েছে তার তোরণে কী ভবিষ্যদ্বাণী লেখা আছে, তা তোমাদের মনে আছে? "বৃষবর্ষে যে পাথরের বৃষের শিঙে তলোয়ার রাখতে পারবে, হাজার হাজার বছর পরেও তার বংশধররা তাকে মনে রাখবে।" অনেক বীরপুরুষ এই চেষ্টায় প্রাণ দিয়েছে। কিন্তু আক-মিউন্‌গুজের চূড়ায় এখনো কেউ তলোয়ার ছোঁয়াতে পারেনি।'

তারপর বিদেশী সৈনিকের দিকে ফিরে বললেন:

'এই দামই তোমায় দিতে হবে, বীর সৈনিক। আমার আদেশ, যাও, আক-মিউন্‌গুজের চূড়ায় উঠে আমার এই সোনার তলোয়ার রেখে এস। তবেই আমাদের সেইদুরুশকে তুমি পাবে।'

সমবেত সবার মনে দেখা দিল আনন্দ আর ভয়। খাঁর এই আদেশ মৃত্যুদণ্ডেরই সামিল।

কিন্তু বিদেশী সৈনিকের মনে ভয় নেই। তার কালো বিষণ্ণ মুখ জ্বলে উঠল দর্পভরা হাসিতে।

'আপনার আদেশ আমি পালন করব, জাঁহাপনা! কেবল, জাঁহাপনা, এইটুকু জেনে রাখুন, তোমরা, জাঁহাপনার প্রজারাও, শুনে রাখ, আক-মিউন্‌গুজে আমি চড়ব, কিন্তু সে আমার প্রার্থিত মেয়েটির জন্য নয়, সেইদুরুশের জন্য নয়। আমার মহান দেশ, যার মুখে সেইদুরুশ কলঙ্কের কালি মাখিয়েছে, চড়ব তার সম্মান রক্ষার্থে। তোমাদের চোখের সামনে আমার দেশের মর্যাদা আমি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করব। আমার এই মহান কাজে দয়াময় খোদাতালা আমার সহায়!'

খাঁর আদেশে তাঁর অস্ত্রনির্মাতা বিখ্যাত সোনার তলোয়ার নিয়ে এল। তার নেকড়ের চর্বি লাগান ফলাটা আলকাৎরা মাখান কাপড়ে মোড়া।

বিদেশী সৈনিকের সঙ্গে সঙ্গে বিরাট জনতা চলল আক-মিউন্‌গুজে। সেখানে পৌঁছতে একদিন লাগে। খাঁ আর তাঁর দলবল যখন ভীষণ পাহাড়টার পায়ের কাছের চওড়া খাঁজটার উপর এসে তাঁদের ক্লান্ত ঘোড়াগুলো থেকে নামলেন তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

বিদেশী সৈনিককে খাঁ সকাল পর্যন্ত বিশ্রামের আদেশ দিলেন। বিদেশী সৈনিক ঘুমিয়ে পড়ল, খাঁর সৈন্যরা তাকে পাহারা দিতে লাগল।

সকাল হল। জোর হাওয়া, সূর্যের মুখ ঢাকা। মনে হল আকাশও যেন এই দুঃসাহসী প্রচেষ্টাকে ভাল চোখে দেখছে না। বাতাস গোঁ গোঁ করে আক-মিউন্‌গুজের খাড়া পাথরগুলোয় ঘা মেরে চলেছে।

বীর সৈনিক তার গায়ের প্রায় সমস্ত জামাকাপড়ই খুলে ফেলে, খাঁর তলোয়ারটা পিঠে বেঁধে নিল। তারপর গায়ে চড়াল তার ঢোলা সাদা বুর্নুস্‌।

বীর সৈনিকের প্রচেষ্টা সফল হল। আক-মিউন্‌গুজের জীবনকালে যে কাজ কেউ কখনো পারেনি, বীর সৈনিক তাই করল: শিঙের মাথায় তলোয়ারটা রেখে সে নিরাপদে নেমে এল। খাঁর সামনে এসে যখন সে দাঁড়াল, তখন তার ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত শরীরটা যন্ত্রণায় মোচড় দিচ্ছে।

খাঁ তাঁর কথা রাখলেন। সেইদুরুশ্‌কে ডেকে পাঠালেন। সেইদুরুশ তার বিশ্বাসহত প্রণয়ীকে দেখে ভীষণ সংকোচে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বীর সৈনিক তাকে কাছে টেনে এনে সেই সুন্দর মুখের ঢাকনা সরিয়ে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। তারপর মুহূর্তের মধ্যে কোমরে লুকনো ছোরাটা টেনে বের করে তার বাগ্‌দত্তা বধূর বুকে বসিয়ে দিল।

রাগে আর দুঃখে চেঁচিয়ে উঠে খাঁর বড় ছেলেদুটি বীর সৈনিকের দিকে ছুটে গেল। কিন্তু খাঁর বজ্রগম্ভীর গলার ধমক তাদের থামিয়ে দিল।

'সেইদুরুশের জন্য, মানুষের পক্ষে সর্বোচ্চ যে দাম দেওয়া সম্ভব, ও তা দিয়েছে। সেইদুরুশ এখন ওর। ওকে শান্তিতে যেতে দাও। ওর অস্ত্রশস্ত্র উট ওকে ফিরিয়ে দাও।'

বীর সৈনিক গর্বভরে খাঁকে কুর্নিশ করল। কিছুক্ষণ পরেই কেৎমেন্ পাহাড়ের আড়ালে তার উট অদৃশ্য হয়ে গেল।

বাদামীর পা পাথরে ফসকে যাচ্ছে, থেকে থেকেই ঘোড়াটা হুমড়ি খাচ্ছে এপাশে ওপাশে। জোর বাতাসে তাড়িয়ে নেওয়া মেঘগুলো সারা আকাশের এদিক থেকে ওদিকে ছুটে চলেছে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নিচে পাহাড়গুলোকে দেখাচ্ছে যেমন বিষণ্ণ, তেমনি কঠোর।

উসোল্‌ৎসেভ লাফিয়ে নেমে পড়ে ঘোড়াটার পিঠ চাপড়ে উপরের নরম ঠোঁটে চুমু খেল। তারপর মাথাটা ঠেলে সরিয়ে দিয়ে ঘোড়াটার পিছনে একটা চড় মারতে ঘোড়াটা লাফিয়ে একপাশে সরে গেল। ঘাড় বেঁকিয়ে প্রভুর দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

'বাদামী, তুই যা, চরে বেড়া!' উসোল্‌ৎসেভ কড়া গলায় বলল। ভীষণ উত্তেজনায় তার গলা বন্ধ হয়ে এসেছে।

উসোল্‌ৎসেভ জুতো খুলে ফেলল। পাদুটো একটু পরেই ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে। কিন্তু খালি পা ছাড়া ওঠার উপায় নেই তা সে জানে। লোহার গোঁজের থলেটা গলায় ঝুলিয়ে উসোল্‌ৎসেভ ধীরে ধীরে পেগ্‌ম্যাটাইট্ শিরার দিকে এগতে লাগল।

উসোল্‌ৎসেভ তখন চারপাশের দেশ কাল সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন। তার শরীর মনের সমস্ত শক্তি তখন এমন একটা উঁচু পর্দায় উঠেছে যা কোন দুর্বল মানুষের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়। সবল যারা তাদেরও এরকম অভিজ্ঞতা খুব কমই হয়।

বেশ কয়েক ঘণ্টা পার হয়ে গেল। ভীষণ মানসিক উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে উসোল্‌ৎসেভ থেমে গিয়ে পাহাড়ের খাড়া পাথুরে বুক আঁকড়ে ধরল। প্রথমবার সে যেখান থেকে ফিরে গিয়েছিল এবার সে তার অনেক

উপরে উঠে এসেছে। প্রধান স্তর থেকে এখানে উপরে আর বাঁয়ে, দুমুখে বেরিয়ে গেছে সূক্ষ্ম কণা বিশিষ্ট পেগম্যাটাইট। শেলগুলো থেকে তার উপরের শক্ত ধার এক ইঞ্চি বেরিয়ে আছে। উসোল্‌ৎসেভ ঠিক করল ঐ পেগ্‌ম্যাটাইটের সাহায্যে পাহাড়ের পশ্চিম দিকে চলে আসবে, কারণ ওদিকটা অত খাড়া নয়। পাৎলা পেগম্যাটাইট শাখার উপরে, শেলের ফাটলগুলোয় কতগুলো লোহার গোঁজ মেরে তাই ধরে সে ওঠার চেষ্টা করতে লাগল।

এমন সময় পাঁচশ ফুট উঁচুতে উঠে উসোল্‌ৎসেভ দেখল ডান হাত বা বাঁ হাত কোনটাই আর নাড়বার উপায় নেই। সভয়ে সে আবিষ্কার করল সে এখন অত্যন্ত নিরুপায়। পাহাড়ের বেরিয়ে আসা গায়ে এসে খাঁজের উপর পা রাখতে হলে তাকে হাত বদলাতে হবে, কিন্তু হাতদুটো নাড়ার উপায় নেই, কাজেই লোহার গোঁজও লাগান যাবে না।

পাহাড়ের গায়ে শুয়ে পড়ে উসোল্‌ৎসেভ বেরিয়ে আসা পাথরটার দিকে তাকাল। দেখল সে দাঁড়িয়ে আছে মৃত্যু আর পরাজয়ের দোরগোড়ায়। পিঠের উপর বাতাসের জোর ধাক্কা। হঠাৎ একটা কথা তার মাথায় এল: বীর সৈনিক এই বিপদ কী করে পার হয়েছিল? বাতাস... সেও তো এরকম ঝোড়ো বাতাসের দিনেই পাহাড়ে উঠেছিল...

পাহাড়ের বেরিয়ে আসা গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে উসোল্‌ৎসেভ পাশে সরে গিয়ে আঙুল দিয়ে মসৃণ পাথরের গা আঁকড়ে ধরল তারপর একটু দুলে পিছিয়ে গেল। পাথরটাকে আঁকড়ে ধরতে পেটের মাংসপেশীতে ভীষণ ব্যথা সুরু হল। ঠিক সেইসময়েই জোর হাওয়া এসে উসোল্‌ৎসেভকে ধীরে ধীরে অথচ বেশ জোরে পাহাড়ের গায়ে চেপে ধরল।

উসোল্‌ৎসেভ এখন খাঁজটার উপর দাঁড়িয়ে। পাহাড়ের বের করা গায়ের উপরে, এখানে, বেশ জোর বাতাস। বাতাসের সমান চাপে উসোল্‌ৎসেভের সুবিধাই হল। খাঁজটা উপরের দিকে ঝুঁকে থাকলেও উসোল্‌ৎসেভের পক্ষে বেয়ে বেয়ে উঠতে বিশেষ অসুবিধা হল না।

এখনো সে না পড়ে কী করে টিঁকে আছে ভাবতে ভাবতে উসোল্‌ৎসেভ আরো দেড়শ ফুট উঠে গেল। জোর বাতাস তাকে পাথরের গায়ে ঠেলে রাখল। উসোল্‌ৎসেভ হঠাৎ আবিষ্কার করল এবার সে খাড়া হয়ে বেশ তাড়াতাড়িই

ঢাল্ বেয়ে উঠতে পারছে। ঢাল্টা এখানে আর নিচের মতো অত খাড়া নয়।

রক্তাক্ত পাদুটো ধীরে ধীরে ফেলে উসোল্‌ৎসেভ পায়ের আঙুলের ডগা দিয়ে পাথরের গাটা পরখ করে দেখতে লাগল। একপা থেকে আরেক পায়ে ভর দেবার আগে ভাঙা পাথরের গুঁড়োগুলোকে সরিয়ে দিল। ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিতভাবে সে ক্রমশই উপরে উঠে চলেছে। বাতাসের ভীষণ গর্জন, পাথরের টুকরো নিচে গড়িয়ে পড়ছে। উসোল্‌ৎসেভের মনটা এক অদ্ভুত চঞ্চল আনন্দে ভরে উঠল। শরীরটা মনে হল যেন পাখির মতো ভারহীন। পাথরগুলো যেন সে ছুঁচ্ছেই না। আত্মপ্রত্যয় ক্রমেই বেড়ে উঠে উসোল্‌ৎসেভের শক্তিই দ্বিগুণ হয়ে উঠল।

কিছুক্ষণ পরেই উসোল্‌ৎসেভ পাহাড়ের একটা খাড়া মসৃণ দেয়ালের সামনে এসে দাঁড়াল। সাদা শিং সেখান থেকেই উঠেছে। চূড়াটা অবশ্য অনেক উপরে মেঘের মধ্যে মিশে গেছে। তল থেকে অদৃশ্য চূড়ার গায়ের বড় বড় কালো ছোপগুলোর জায়গাটা উসোল্‌ৎসেভ মনে মনে ঠিক করে নিল। থলেতে তখনো বারটা লোহার গোঁজ রয়েছে বলে সে মহা আনন্দিত, অন্য আর কিছুই সে তখন ভাবছে না: দেয়ালটা প্রায় ত্রিশ ফুট উঁচু, লোহার গোঁজ ছাড়া ওঠা অসম্ভব।

ভূবিজ্ঞানীর দক্ষ চোখ সহজেই শক্ত পাথরের গায়ের দুর্বল জায়গাগুলো খুঁজে পেল — বিভিন্ন স্তরের মধ্যবর্তী ফাটলগুলো। গোঁজগুলোকে উসোল্‌ৎসেভ যতদূর পারে ভাল করে গেঁথে দিল: সবচেয়ে হাল্‌কা আর সরু গোঁজগুলোই সে বেছে নিয়ে এসেছে। একটাও যদি ভেঙে যায় ...

শেষ গোঁজটা পার হয়ে এসে উসোল্‌ৎসেভকে পাহাড়ের দক্ষিণ দিকে এগতে হল: নানা স্তরের বের করা মাথাগুলোর সাহায্যে আরো এগন সম্ভব হল।

বাতাস এতক্ষণ উসোল্‌ৎসেভের সহায় ছিল। এবার হয়ে উঠল প্রতিকূল। কোনরকমে একটা বের করা পাথর ধরে উসোল্‌ৎসেভ বাতাসের প্রবল ঠেলার হাত থেকে নিজেকে সামলে রাখল। অনেকবার তার পা ছেড়ে যায় আর সে ঐ ভীষণ উঁচু থেকে খাঁজটা ধরে ঝুলতে থাকে — হাতের চাপে খাঁজটা গুঁড়ো

গ্বঁড়ো হয়ে ভেঙে যায়, পায়ের আঙ্বল দিয়ে উসোল্‌ৎসেভ পা ফেলার জায়গা খোঁজে আর বরফের মতো ঠাণ্ডা ঘাম তার গা বেয়ে ঝরে পড়ে।

মরীয়া ভাবে প্রাণ বিপন্ন করে দ্ববারের চেষ্টার পর উসোলৎসেভ পশ্চিম দিকে এসে পেঁছল। তারপর বাতাস আবার তার অন্বকূলে বইতে স্বর্ব করল। শিঙের পায়ের কাছের সমান পাথরের ধারটা উসোল্‌ৎসেভ আঁকড়ে ধরল।

জয় পরাজয়ের কথা উসোল্‌ৎসেভ তখন ভুলে গেছে, সত্যি বলতে কি কোন কিছ্বই তখন তার মনে নেই। সে তখন প্রাণপণ চেষ্টা করে বাঁকা পাথরটার মাথায় উঠে ক্লান্তিতে হাঁপাচ্ছে। পাহাড়টা এখানে একটা ছোট্ট টেবিলের চেয়ে বড় নয়। উসোল্‌ৎসেভ অনেকক্ষণ পর্যন্ত চুপ করে পড়ে রইল। গত কয়েক ঘণ্টার মারাত্মক সংগ্রামের পর তখন আর তার শরীরে এতটুকু শক্তিও অবশিষ্ট নেই। সে তখন কেবল শ্বনছে — শিঙের ছ্বরির মতো তীক্ষ্ম ধারে ঘা খেয়ে বাতাস তীব্র শীৎকার তুলে ছ্বটে চলেছে। তারপর নজরে পড়ল চ্বড়ার প্রায় মাথা ছ্বঁয়ে চলে যাওয়া মেঘ।

হাঁটু গেড়ে উঠে উসোল্‌ৎসেভ শিঙের রহস্যময় সাদা পাথরের দিকে তাকাল। শিংটা একেবারে সামনেই। শিঙের বেশ কয় ফুট উ'চুতে উঠে যাওয়া স্তম্ভটা তার কাঁধে ঠেকছে। হাত দিয়ে সে এখন স্তম্ভটা ছ্বঁতে পারে, যত খ্বসি নম্বনা ভেঙে নিতে পারে।

একবার দেখেই উসোল্‌ৎসেভ ব্বঝতে পারল পাথরটা গ্রীজেন্‌ দিয়ে তৈরী — তার মানে টিনস্টোনে ভরা উচ্চতাপে পরিবর্তিত গ্র্যানাইট। ধবধবে সাদা পাথরটায় ছড়িয়ে আছে র্বপোলি মাস্‌কোভিট্‌, উজ্জ্বল টোপাজ, প্রস্তরীভূত কালো মাকড়সার মতো টুর্মালিন। আর, যার জন্য এখানে ওঠা, সেই ক্যাসিটেরাইটের বিরাট বিরাট খয়েরী কেলাস। এখানকার গ্রীজেনের একটা অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য উসোল্‌ৎসেভের অপরিচিত — ম্বল গ্রানাইটের এতে কিছ্বই আর অবশিষ্ট নেই; তার বদলে রয়েছে শক্ত, দ্বধের মতো সাদা কোয়াৎর্জ।

একেবারেই বদলে গেছে, উসোলৎসেভ মনে মনে ভাবল। তাহলে তো স্তেপের গভীরের সঞ্চয়টাও বেশ বড় বলেই মনে হচ্ছে।

উসোল্‌ৎসেভ নিচের দিকে তাকাল। পাহাড়টা যেন হঠাৎ অনেকটা নেমে গেছে। তলটা ধুলোর ঘূর্ণিতে ঢাকা। একটা বিরাট স্তম্ভের মাথায় উসোল্‌ৎসেভ সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ শূন্যতায়। তার মনে হল নিচের জগতের সঙ্গে তার সব সম্পর্কই বুঝি ছিন্ন হয়ে গেছে। সত্যিই তাই, কারণ জীবন আর তার মাঝখানে রয়েছে পাহাড় বেয়ে নামার ভয়াবহ ঝুঁকি। যে বিপদ সে পার হয়ে এসেছে, পাহাড় থেকে নামাটা তার চেয়ে অনেক ভয়াবহ। একথাও তার মনে হল: আজকে সে যদি মারা নাও পড়ে তাহলেও সে এক অন্য মানুষ হয়ে উঠবে। লক্ষ্য লাভের জন্য তার এই অমানুষিক প্রয়াসের গভীর ছাপ তার হৃদয় মনের যেন পরিবর্তন ঘটায়।

এসব কথা বাদ দিয়ে উসোল্‌ৎসেভ আবার তার কাজে মনোনিবেশ করল। কোয়ার্ৎজের কাচের মতো শক্ত গায়ের ফাটলগুলো অনুসন্ধান করতে অনেক সময় লাগল। তার হাতুড়ির ঘায়ে বড় বড় সাদা পাথরের টুকরো সশব্দে ভেঙে নিচে পড়তে লাগল। পাথরগুলো কোথায় পড়ে দেখে নিয়ে নোটবইয়ে আঁকা চার্টটায় উসোল্‌ৎসেভ জায়গাগুলো লিখে নিল। তারপর সে আরেকটা চার্ট আঁকল। তাতে রইল শিঙের ভূতাত্ত্বিক বর্ণনা আর নিচের সঞ্চয়ের সম্ভাব্য এলাকাগুলোর চিহ্ন। সেইসঙ্গে ভবিষ্যতের খোঁড়ার কাজের জন্য কয়েকটা নির্দেশ।

তারপর নোটবইয়ের প্রথম পাতাটা খুলে বড় বড় করে লিখল, "দ্রষ্টব্য: সাদা শিং সঞ্চয়ের বিস্তারিত বিবরণ।" নোটবইটা বুক পকেটে ভরে রেখে বোতাম এঁটে দিল। মুহূর্তের জন্য একটা ছবি তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। তার নিষ্প্রাণ, ক্ষতবিক্ষত শরীরটা ঘিরে দাঁড়িয়ে বন্ধুরা পকেটগুলো খুঁজে দেখছে। মাথা নেড়ে সে সঙ্গে আনা দড়িটা খুলতে সুরু করল। দড়িটা বেশি লম্বা নয়, কিন্তু ওটা ধরেই খাড়া দেয়ালটা বেয়ে লোহার গোঁজগুলোর কাছে পেঁছিতে হবে।

দড়িটা বাঁধার জন্য একটা জায়গা খুঁজতে খুঁজতে সে প্রথমে একটা বের করা পাথরের দিকে গেল, তারপর এগিয়ে গেল একেবারে ধার ঘেঁষা আরেকটা পাথরের দিকে। বাতাসের গর্জন তখন আরো জোর হয়ে উঠেছে, উসোল্‌ৎসেভের মুখে আর পায়ের উপর উড়ে এসে পড়ছে পাথরের কুচি।

হাতুড়িটায় হঠাৎ ঠং করে একটা কিসের আওয়াজ হল। ভাঙা গুঁড়ো পাথরের গাদা সরিয়ে উসোল্‌ৎসেভ টেনে বের করল একটা খুব ভারী আর লম্বা তলোয়ার। বাঁটটা তার সোনার। ফলা থেকে ঝুলছে জীর্ণ একটা কাপড়।

উসোল্‌ৎসেভ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল সাদা শিঙের প্রথম আরোহী, গল্পের সেই বীর সৈনিকের সজীব মূর্তি... খাঁর এই তলোয়ার মানুষের অমর কীর্তির প্রতীক।

ক্লান্ত শরীরে উসোল্‌ৎসেভ নতুন শক্তি অনুভব করল। মনে হল বীর সৈনিক যেন তার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে উৎসাহ দিচ্ছে। উসোল্‌ৎসেভ চট করে একটা সাদা বের করা পাথরে দড়ির ফাঁসটা পরিয়ে দিল। সযত্নে সে পিঠে বেঁধে ফেলল দামী তলোয়ারটা। হাতুড়িটা পাথরের উপর রাখতে রাখতে তার মুখে ফুটে উঠল একটা দুষ্টুমি ভরা হাসি।

শিঙের খাড়া বেদীটার তলে এসে দড়িটা শেষ হয়েছে। উসোল্‌ৎসেভ থেমে একবার চারপাশটা দেখে নিল। একটা মেঘ তার দিকে ছুটে আসছে। বিরাট সাদা বস্তুটা কেমন অনায়াসে বাতাসে ভেসে চলেছে, কোন ভয় ডর নেই। উসোল্‌ৎসেভের মনে দেখা দিল নিজের শক্তির প্রতি এক প্রবল আস্থা। হাওয়ার দিকে মুখ করে সে হাতদুটো মেলে দিল, তারপর হাওয়ার সাহায্যে নিজেকে ধরে রেখে সে দ্রুত নামতে সুরু করল।

উসোল্‌ৎসেভ যেন স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে, অত্যন্ত অনায়াসে, সংকীর্ণ খাঁজটা পার হয়ে আরো নিচে নেমে এল। কিন্তু তারপর বাতাস পাশের একটা পাহাড়ে আটকা পড়ে হঠাৎ থেমে গেল। সুরু হল কঠোর সংগ্রাম। উসোল্‌ৎসেভ খাড়া গা বেয়ে একটু একটু করে পিছলে পিছলে নেমে আসতে লাগল। সারা গা ছড়ে গেল, হাতের আঙুলের ডগাগুলো দিয়ে ভীষণ রক্ত ঝরতে লাগল। পিছনে তাকিয়ে পাথরে মুখটা চেপে রেখে সে মরীয়া হয়ে গুঁড়ি মেরে নামতে লাগল।

অন্য সব কথা সে তখন ভুলে গেছে, তার মনে তখন একটিমাত্র চিন্তা: আঁকড়ে থাকতে হবে, যে করেই হক আঁকড়ে থাকতে হবে। যে ভীষণ শক্তি তাকে নির্মমভাবে নিচে টানছে তার কাছে হার মানলে চলবে না।

আক্-মিউন্‌গ্‌ুজের বুকে তার শেষ দিকের ভয়াবহ সময়টা হঠাৎ আকস্মিকভাবে অন্তিমে এসে পেঁছল। শরীর মনের সব শক্তি নিঃশেষ হয়ে যেতে উসোল্‌ৎসেভ তীক্ষ্ণ পাথরটা ছেড়ে দিল। বিদ্যুৎবেগে ছিটকে পড়ল নিচে।

চোখ খুলে উসোল্‌ৎসেভ চেয়ে রইল মাথার উপরের সোনালি আকাশটার দিকে। সকালের হাওয়ায় একটা মস্তবড় শকুন ঠিক তার উপরেই পাক খাচ্ছে। এত কাছে যে তার খাড়া খাড়া পালকগুলো উসোল্‌ৎসেভের স্পষ্ট চোখে পড়ছে।

অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর উসোল্‌ৎসেভ বুঝতে পারল শকুনটা সোজা তার দিকেই তেড়ে আসছে। উসোল্‌ৎসেভ উঠে বসার চেষ্টা করল। সাদা শিংকে জয় করে এসে এখন সে কিছুতেই শকুনের কাছে হার মানতে পারবে না। কী একটা যেন তাকে আটকে ধরেছে, কিছুতেই সে উঠে বসতে পারছে না। পিছনে তলোয়ারের খাপটায় হাত পড়তে খাপটা খুলে উসোল্‌ৎসেভ উঠে বসল।

পড়ার আগের ঘটনাগুলো মনে পড়তে উসোল্‌ৎসেভের গাটা গুলিয়ে উঠল। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে সে তাকাল তার রক্তাক্ত হাত পা, ক্ষতবিক্ষত শরীর আর গায়ের রক্তমাথা জামাকাপড়গুলোর দিকে। হাত পা নেড়ে একটু নিশ্চিন্ত হল — হাড়গোড় কোথাও ভাঙেনি। তারপর পায়ের পাতার ভীষণ ব্যথা তুচ্ছ করে সে কোনরকমে উঠে দাঁড়াল।

কানে এসে পেঁছল তার ঘোড়ার ডাক। উসোল্‌ৎসেভ আবার মাটিতে পড়ে গেল।

মুখ আর ঠোঁটের উপর ঝরে পড়তে লাগল ঠাণ্ডা জল। উসোল্‌ৎসেভ পেট ভরে জল খেয়ে নিল। চোখ খুলে দেখল নীল আকাশটা ভীষণ তেতে উঠেছে। চোখ ফেরাতে দেখতে পেল উইগুর আর্স্লানের ভীত সন্ত্রস্ত মুখটা।

উসোল্‌ৎসেভ হাঁটু গেড়ে উঠে বসতে আর্স্লান ভয়ে পিছিয়ে গেল।

‘আর্স্লান, ভয় পাচ্ছ কেন? আমি বেঁচে আছি...’

‘অনেক উঁচুতে উঠেছিলে?’ আর্স্লান জিজ্ঞেস করল।

'একেবারে মাথায়,' সন্ধ্যার ছায়ায় নীল আক-মিউন্‌গুজকে দেখিয়ে বলল উসোল্‌ৎসেভ। 'এই দেখ!' সোনার বাঁটওয়ালা তলোয়ারটা সে আর্স্লানের দিকে বাড়িয়ে দিল।

খাপের আধখানা পাহাড় থেকে পড়ে যাওয়ার সময় ভেঙে গেছে। খয়েরী মর্চের ফাটলের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে বিখ্যাত পারসীক অস্ত্রনির্মাতাদের বহুমূল্য নীল ইস্পাত। নির্মাতাদের সঙ্গে সঙ্গেই লোপ পেয়েছে সে ইস্পাত নির্মাণের কৌশল।

আর্স্লান হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল, তলোয়ারটাকে ছুঁলও না।

'নাও,' উসোল্‌ৎসেভ আবার বলল।

'না, না!' উইগুর আর্স্লান মাথা নেড়ে ফিসফিস করে বলল, 'সাধারণ লোকে এ তলোয়ার ছুঁতে পারে না। পারে কেবল তোমার মতো প্রকৃত বীর সৈনিক।'

তারার জাহাজ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বিরাট আবিষ্কারের দোরগোড়ায়

‘এখন ফিরলে, আলেক্সেই পেত্রভিচ? অনেকে তোমার খোঁজ করছিল।’

‘আজকেই। কিন্তু সেকথা কাউকে জানিও না। আর সামনের ঘরের জানলাটা বন্ধ করে দাও।’

জীর্ণ ট্রেঞ্চ-কোটটা খুলে রুমাল দিয়ে মুখ মুছে ভদ্রলোক পাকা রেশমী চুলগুলোকে ঠিক করে নিলেন — চুলগুলো কমে এসে টাক পড়তে

সুরু করেছে। তারপর বসে পড়ে একটা সিগারেট ধরালেন। কিন্তু একটু পরেই উঠে পড়ে ডেস্ক আর আলমারিতে ঠাসা ঘরটায় পায়চারী জুড়ে নিলেন।

"এ কি সম্ভব?" আলেক্সেই পেত্রভিচ নিজের মনেই বলে উঠলেন।

একটা আলমারির কাছে গিয়ে লম্বা ওককাঠের দরজাটা ধরে ভদ্রলোক জোরে টান দিলেন। অন্ধকার আলমারির ভিতরে ফুটে উঠেছে সাদা সাদা শেলফ্‌গুলো। তার একটায় দাঁড়িয়ে রয়েছে চকচকে হলদে কার্ডবোর্ডের চৌকো বাক্স, হাতির দাঁতের মতো শক্ত। গায়ে নানা জাতির পোস্টাফিসের ছাপ। চীনা হরফে লেখা একটা ছাইরঙা কাগজের লেবেল একপাশে লাগান। অক্ষরগুলো মোটা আর কালো।

ফ্যাকাশে, লম্বা লম্বা আঙুলগুলো দিয়ে বাক্সটা ছুঁয়ে ভদ্রলোক বলে উঠলেন, 'তাও লি, আমার অজানা বন্ধু! এবার সময় এসেছে!'

আলমারির দরজাটা আস্তে করে বন্ধ করে অধ্যাপক শাত্রভ্ একটা জীর্ণ আতাশে কেস তুলে নিলেন। তার ভিতর থেকে বের করলেন ধূসর অয়েলক্লথে বাঁধান একটা নোটবই। পাতাগুলো তার কোন সময়ে ভিজে গিয়েছিল। অধ্যাপক সাবধানে নোটবইটা উল্টে চললেন। সংখ্যার তালিকাগুলো ম্যাগ্‌নিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখতে দেখতে মস্ত একটা প্যাডে কী সব হিসাব কষতে লাগলেন।

সিগারেটের টুকরো আর দেশলাইয়ের পোড়া কাঠিতে এশ্‌ট্রেটা ভরে গেল। ঘর ভরে গেল নীল ধোঁয়ায়।

ঝাঁকড়া ভুরুর নিচে শাত্রভের স্বচ্ছ চোখদুটো জ্বলতে লাগল। চিন্তাশীল লোকের উপযোগী উঁচু কপাল, চৌকো চোয়াল আর যেন তীক্ষ্ণ কুঁদে তোলা নাকটায় শাত্রভের মন ও মনীষার শক্তি আরো বেশি করে ফুটে উঠেছে। সেই সঙ্গে তাঁর স্বভাবের একগুঁয়েমিও।

নোটবই থেকে হাত সরিয়ে শাত্রভ অবশেষে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, সাত কোটি বছর। সাত কোটি!' হাত দিয়ে কিছু একটা ভাল করে ধরে রাখার ভঙ্গী করলেন। তারপর চারপাশে তাকিয়ে চোখ কুঁচকে আবার বললেন, 'সাত কোটি! আসল কথাটা হচ্ছে, ভয় পেলে চলবে না!'

শাত্রভ এতটুকু তাড়াহুড়ো না করে ধীরে ধীরে তাঁর ডেস্কটা গুছলেন, তারপর ট্রেঞ্চ-কোট পরে বাড়ির দিকে রওনা হলেন।

'হ্যাঁ, ক্লান্ত হয়ে পড়েছি বলেই মনে হচ্ছে। মাথার চুলগুলো সব পেকে গেল, টাক পড়ে গেল, আর ... ছ্যাঃ,' শাত্রভ বিড়বিড় করে বললেন।

অনেক দিন ধরেই শাত্রভ অনুভব করছেন তাঁর কাজকর্ম সব কেমন যেন ঢিলেঢালা হয়ে গেছে। বছরের পর বছর একঘেয়ে ছকবাঁধা কাজের জালে তাঁর মন জড়িয়ে পড়েছে। চিন্তা এখন আর জোরাল ডানা মেলে ঊর্ধ্বে ওঠে না। তার বদলে ভারী মালবাহী ঘোড়ার মতো ধীরে ধীরে নির্ভয়ে, অলস উদাসীন ভঙ্গীতে এগিয়ে চলে। শাত্রভ বেশ বুঝতে পারছেন বহু বছরের ক্লান্তিই তাঁর এই অবস্থার জন্য দায়ী। বন্ধু আর সহকর্মীরা বিশ্রাম করতে বলছে, অন্য কিছুতে মনোনিবেশ করতে বলছে। কিন্তু কাজ ছাড়া আর কিছুতে মনোনিবেশ করা শাত্রভের পক্ষে সম্ভব না।

'ও কথা, ভাই, ছেড়ে দাও,' শাত্রভ তাঁর বন্ধুদের বিষণ্ণ মুখে বলেন, 'গত কুড়ি বছরে একবারও থিয়েটারে যাইনি বা গ্রীষ্মকালে গ্রামাঞ্চলে।'

কিন্তু তা সত্ত্বেও শাত্রভ ভাল করেই জানেন তাঁর মনের এই শক্তিক্ষরণের কারণ হচ্ছে দীর্ঘকালের কৃচ্ছ্রসাধন আর সীমিত ঔৎসুক্য। মনটাকে এক জায়গায় নিবিষ্ট করার জন্যই তিনি নিজেকে এত বেঁধে ছেঁদে রেখেছেন কিন্তু তার ফলে বিচিত্র পূর্ণ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি আটকা পড়েছেন অচলায়তনে।

দ্রুত পায়ে ঘরে ঢুকে শাত্রভ একবার তাঁর "ব্রোঞ্জামাজিগ"টা দেখে নিলেন — ব্রোঞ্জের সংগ্রহটাকে শাত্রভ ঐ নাম দিয়েছেন। তারপর কালো অয়েলক্লথে ঢাকা টেবিলটার কাছে বসে একটা এলবাম খুললেন। টেবিলটার উপর একটা ব্রোঞ্জের কাঁকড়া, তার পিছনে মস্ত একটা দোয়াত।

শাত্রভের আঁকার হাত আছে। তাই ছবি আঁকায় তিনি বেশ আনন্দ আর শান্তি পান। কিন্তু এবার একটা জটিল কম্‌পোজিশনের খসড়াতেও তাঁর ক্লিষ্ট স্নায়ুতন্ত্র শান্তি পেল না। এলবামটা এক ঝটকায় বন্ধ করে দিয়ে শাত্রভ লাফিয়ে উঠে পড়লেন। টেনে নিলেন এক গোছা ছেঁড়াখোঁড়া স্বরলিপির পাতা। এক মুহূর্ত পরেই পুরনো একটা হারমোনিয়ামে ব্রাহ্‌ম্‌সের "ইন্‌তারমেৎসো"র

সুন্দর সুর ঘর ভরে দিল। বাজনার হাত শাত্রভের তেমন ভাল নয়, কিন্তু তবু তিনি সবসময় সবচেয়ে কঠিন জিনিসই বাজাতে চেষ্টা করেন। বাজানর দোষত্রুটিতে তাঁর কিছুই এসে যায় না, কারণ আর কাউকে তো আর শোনাতে যাচ্ছেন না। ক্ষীণদৃষ্টি চোখদুটো কুঁচকে স্বরলিপির উপর ঝুঁকে শাত্রভ তাঁর সাম্প্রতিক ভ্রমণের খুঁটিনাটি সব ভাবতে লাগলেন, তাঁর মতো ঘরকুনো বৈজ্ঞানিকের পক্ষে যা অত্যন্ত অস্বাভাবিক।

শাত্রভের এক পুরনো ছাত্র তাঁকে ছেড়ে গিয়েছিল জ্যোতিষ বিভাগে। মৌলিক কাজ করছিল মহাকাশে সৌরমণ্ডলের আবর্তন নিয়ে। শাত্রভ আর তাঁর পুরনো ছাত্র ভিক্তরে ছিল খুবই ভাব। যুদ্ধের সময় ভিক্তর নিজে থেকে আর্মিতে যোগ দিয়েছিল। তখন তাকে ট্যাংক স্কুলে গিয়ে অনেক দিন ধরে কাজ শিখতে হয়। সেই সঙ্গে তার গবেষণা নিয়েও সে কাজ করে চলে। ১৯৪৩ সালের গোড়ার দিকে ভিক্তর শাত্রভকে চিঠি লিখে জানায় তার কাজ সফল পরিণতিতে এসে পেঁছেছে। আরো জানায়, একটা নোটবইয়ে তার তত্ত্বের পুরো বিবরণ কপি করে সে শাত্রভকে সঙ্গে সঙ্গেই পাঠিয়ে দেবে। এই তার শেষ চিঠি। এর কিছুপরেই ভীষণ এক ট্যাংক যুদ্ধে ভিক্তর মারা যায়।

নোটবইটা কিন্তু শাত্রভের কাছে পেঁছয় না। বহু খোঁজ করেও সেটা উদ্ধার করা যায়নি। শেষ পর্যন্ত শাত্রভ ভাবলেন, ভিক্তরের ইউনিটকে হয়ত হঠাৎ লড়াইয়ে নামতে হয়, তাই নোটবইটা ডাকে দেবার সময় আর সে পায়নি। যুদ্ধ শেষ হলে পর এক মেজরের সঙ্গে শাত্রভের অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হয়ে যায়। ঐ মেজর ছিলেন ভিক্তরের কমান্ডিং অফিসার। শাত্রভের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় লেনিনগ্রাদে। মেজর আহত অবস্থায় লেনিনগ্রাদে তখন কিছুটা সেরে উঠেছেন, শাত্রভও তখন লেনিনগ্রাদেই। মেজরের কাছে শাত্রভ শুনলেন, গোলার ঘায়ে ভিক্তরের ট্যাংকটা বিকল হয়, কিন্তু আগুনে পোড়ে না। তাই মৃত ভিক্তরের কাগজপত্র খুঁজে পাওয়া একেবারে অসম্ভব নয়, অবশ্য কাগজপত্রগুলো ট্যাংকের ভিতরে কখনো যদি থেকে থাকত। মেজর জানালেন, ট্যাংকটা বোধহয় যুদ্ধক্ষেত্রেই পড়ে আছে, কারণ যুদ্ধক্ষেত্রের চারদিকে মাইন পাতা ছিল। শাত্রভ মেজরের সঙ্গে ভিক্তর যেখানে মারা যায় সেখানে গিয়েছিলেন।

হারমোনিয়ামের সামনে বসে শাত্রভ স্বরলিপির ছেঁড়া কাগজগুলোর দিকে চেয়ে রইলেন, তাঁর সেই স্মরণীয় যাত্রার ঘটনাগুলো স্মৃতিতে আবার রূপ নিতে সুরু করল।

'অধ্যাপক, যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন! এক ইঞ্চিও নড়বেন না!' পিছিয়ে পড়া মেজর চেঁচিয়ে উঠলেন।

শাত্রভ তাঁর কথা মতো দাঁড়িয়ে গেলেন।

সামনে, রৌদ্রস্নাত মাঠে লম্বা লম্বা ঘাস চুপ করে দাঁড়িয়ে। ঘাসের শীষে আর পাতায়, মিষ্টিগন্ধ সাদা সাদা ফুলের ফোলা ফোলা গায়ে, লাইলাক রং বুনো ব্রায়ার ঝোপে চমকাচ্ছে শিশির। সকালের সূর্যের উত্তাপে ছোট ছোট মাছি ফুলে ফুলে উড়ে বেড়াচ্ছে। তার পিছনে বন। তিন বছর আগের গোলাগুলির ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত। তার ছায়ায় ঘেরা সবুজ দেয়ালের এখানে ওখানে ফাঁক দেখে বোঝা যায় যুদ্ধের ক্ষত ধীরে ধীরে সেরে উঠেছে। মাঠ ভর্তি নানারকম গাছগাছড়া ফুল। কিন্তু ঐখানে, ঐ বুনো ঘাসের ভিতরে এখনো রয়েছে মৃত্যুর হাতছানি। শত্রুর দান, যে শত্রু যুদ্ধে পরাস্ত হলেও কাল আর প্রাকৃতিক শক্তির হাতে এখনো হার মানেনি।

ক্ষতবিক্ষত মাটি — গোলাগুলি, মাইন আর বোমার আঘাতে ঝাঁঝরা, ট্যাংকের পদক্ষেপে বিধ্বস্ত। চারিদিকে স্প্লিণ্টার ছড়ান, রক্তে ভেজা। ঘাস দ্রুত গজিয়ে মাটি ঢেকে ফেলেছে।

শাত্রভ ট্যাংকগুলো দেখতে পাচ্ছেন। লম্বা লম্বা ঝোপের আড়ালে ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে। ভাঙা আর্মারে লাল মর্চে, কামানের মুখগুলো হয় নিচে নামান নয় আকাশে তোলা। ফুলে ভরা মাঠের মাঝখানে তাদের কেমন বিষণ্ন ভয়াবহ চেহারা। ডাইনে একটা ছোট্ট গর্তের ভিতর পড়ে রয়েছে তিনটে কালো জার্মান প্যান্জার। কামানগুলো সোজা শাত্রভের দিকে মুখ করে। মৃত কিন্তু তবু তাদের স্তব্ধ কঠোর রাগে বনের ধারের তরুণ সাদা বার্চগাছগুলোকে যেন ভয় দেখাচ্ছে।

আরো আগে ঢিবির উপর একটা ট্যাংক মুখ তুলে পাশের শত্রু ট্যাংকটাকে নিচে ঠেলে রেখেছে। নোংরা সাদা ক্রস লাগান চূড়াটা কাঁটা ঝোপের ভিতর

থেকে প্রায় চোখেই পড়ে না। বাঁয়ে পড়ে আছে একটা "ফার্ডিনাণ্ড" কামানের লালচে-ধূসর ফোঁটা-কাটা গা, লম্বা ঝুলে পড়া নলটা ঘন ঘাসে অদৃশ্য।

বুনো ফুলে ভরা মাঠটায় কোন পথ খুঁজে পাওয়া মুশকিল। ঘন জঙ্গলের মধ্যে কোথাও মানুষ বা জীবজন্তুর পায়ের চিহ্ন নেই। চারিদিকে একটা গম্ভীর নিস্তব্ধতা। কেবল শোনা যাচ্ছে মাথার উপরে উত্তেজিত ভাবে উড়ে বেড়ান জে পাখির চীৎকার আর দূরে একটা ট্র্যাক্টরের ঘট্‌ঘট্‌ আওয়াজ।

একটা উপড়নো গাছের উপর উঠে মেজর অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর ড্রাইভারও স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে, যে সোভিয়েত মানুষেরা এখানে লড়াই করেছে নিশ্চয়ই তাদের গর্বে দুঃখে সে অভিভূত।

শাত্রভের মনে পড়ল পুরনো কালে এনাটমি থিয়েটারের দরজায় লেখা থাকত "Hic locus est, ubi mors gaudet sucurrere vitam", তার মানে, "মৃত্যু এখানে আনন্দে বাস করে, সেই সঙ্গে সেবা করে জীবনের।" কথাটা একইসঙ্গে ভয়াবহ আর আশায় ভরা।

স্যাপারদের ভারপ্রাপ্ত একটি বেঁটেখাট সার্জেণ্ট মেজরের কাছে এগিয়ে এল। তার একগাল হাসি মুখটা অধ্যাপকের কাছে বড় বেমানান ঠেকল।

'আরম্ভ করব, কমরেড মেজর?' সুরেলা গলায় লোকটি বলে উঠল, 'কোথা থেকে সুরু করব বলুন।'

'এখান থেকে, সার্জেণ্ট,' লাঠি দিয়ে একটা হথর্ন ঝোপ দেখিয়ে দিয়ে মেজর বললেন, 'সোজা ঐ বার্চগাছটার দিকে এগিয়ে যাও।'

সার্জেণ্ট আর তার চারজন স্যাপার মাঠের মাইন সন্ধানের কাজে লেগে গেল।

'ভিক্তরের ট্যাংকটা কোথায়?' শাত্রভ মৃদু স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'এতো দেখছি সবই জার্মান ট্যাংক।'

'ঐ দেখুন,' বাঁদিকে হাত নেড়ে মেজর বললেন, 'ঐ আসপেনগাছগুলোর কাছে। টিলার উপরের ছোট্ট বার্চগাছটা দেখতে পাচ্ছেন? তার ডাইনেই।'

শাত্রভ সামনে তাকালেন। আশ্চর্য উপায়ে যুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া একটা তরুণ বার্চগাছ বেশ অলসমন্থর চালে পাতার নাচন জুড়ে দিয়েছে। তার পাশেই ছ'সাত ফুট দূরে একটা ভাঙাচোরা লোহালক্কড়ের

গাদা। দূর থেকে সেটাকে দেখে মনে হয় কালোর ছোপ লাগান একটা লাল ফোঁটা।

'দেখতে পেলেন?' মেজর জিজ্ঞেস করলেন। শাত্রভ ঘাড় নাড়তে বললেন, 'আরো বাঁয়ে পড়ে রয়েছে আমার ট্যাংকটা। ঐ, পোড়া ট্যাংকটা। সেদিন আমি...'

সার্জেণ্ট এসে জানাল মাঠের গায়ের একটা সরু পথ তারা মাইনমুক্ত করেছে।

শাত্রভ আর মেজর তাড়াতাড়ি তাঁদের লক্ষ্যমুখে এগিয়ে গেলেন। ট্যাংকটা দেখে শাত্রভের মনে হল যেন পড়ে আছে মস্ত একটা ভাঙা মাথার খুলি, চোখের বড় বড় কালো গর্তগুলো হাঁ করে চেয়ে। দুমড়োন, পোড়া, ফুলে ওঠা আর্মারটা লালচে মর্চেয় বিবর্ণ।

ড্রাইভারের সাহায্যে মেজর কোনরকমে ভাঙা ট্যাংকটার উপরে উঠলেন। ভিতরে ঢোকার খোলা দরজাটায় মাথা গলিয়ে অনেকক্ষণ ধরে ভিতরের বিষণ্ণ অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইলেন। শাত্রভও মেজরের পথ অনুসরণ করে সামনের ফাটা আর্মার প্লেটটার উপরে উঠে তাঁর পাশে দাঁড়ালেন। মেজর মাথা তুলে রোদের ঝাঁজে চোখ কুঁচকে বললেন, 'আপনি ভিতরে গেলে কোন লাভ হবে না। সার্জেণ্ট আর আমি আগে একবার ভাল করে দেখে নিই। আমরা যদি না পাই, আপনি নয় তখন নিজে গিয়ে একবার দেখে আসবেন।'

ক্ষিপ্রগতি সার্জেণ্টটি একলাফে ট্যাংকের ভিতর নেমে পড়ল, তারপর মেজরকেও ধরে নামিয়ে নিল। শাত্রভ দরজার মুখের কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভিতরে ঘন বিশ্রী দুর্গন্ধ। ইঞ্জিনের তেলের মৃদু গন্ধ এখনো অল্প অল্প আঁচ করা যায়। ট্যাংকের গায়ের ফুটো দিয়ে যথেষ্ট আলো আসছিল, তবু সতর্কতার জন্য মেজর টর্চটা জ্বালালেন। ভিতরের দুমড়োন মোচড়ান লোহালক্কড়ে নিজেকে ধাতস্থ করে নেবার জন্য তিনি কুঁজো হয়ে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলেন। নিজেকে ট্যাংক কম্যাণ্ডারের জায়গায় অনুমান করে মেজর ভাবতে লাগলেন দামী জিনিসপত্র কোথায় লুকন থাকতে পারে। যত সম্ভাব্য জায়গা, পকেট সব খুঁজে দেখলেন। সার্জেণ্টটি কোনরকমে ইঞ্জিনের কম্পার্টমেণ্টে ঢুকে চারিদিক হাতড়াতে লাগল।

বাইরে শাত্রভের উৎকণ্ঠা ক্রমেই বেড়ে চলেছে।

হঠাৎ মেজরের চোখে পড়ল সীটের পিঠের ক্রসপীসটা। তার কুশনের পিছনে কী একটা যেন অক্ষত অবস্থায় আটকে রয়েছে। জিনিসটা টেনে বের করে দেখলেন একটা ম্যাপ-কেস। চামড়াটা ফুলে সাদা হয়ে গেছে, কিন্তু নষ্ট হয়নি। হলদে সেলুলয়েডের ভিতর থেকে দেখা যাচ্ছে একটা ছাতাপড়া ম্যাপ। একটু হতাশ হয়ে ভুরু কুঁচকে মেজর টানাটানি করে মর্চে পড়া মুখটা খুললেন। ভাজ করা ম্যাপটার নিচে পাওয়া গেল শক্ত অয়েলক্লথে বাঁধান একটা ছাইরঙা নোটবই।

'এই একটা জিনিস পাওয়া গেছে। নিন, দেখুন!' ম্যাপ-কেসটা শাত্রভকে দিয়ে মেজর বললেন।

খাতাটা বের করে শাত্রভ সযত্নে গায়ে গায়ে লেগে যাওয়া পাতাগুলো ওল্‌টালেন। ভিক্তরের লেখা সার বাঁধা সংখ্যাগুলো চোখে পড়তে শাত্রভ আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন।

মেজর গুড়ি মেরে ট্যাংকের পেটের ভিতর থেকে উঠলেন। এক ঝলক হাওয়া তখন মধুর গন্ধ মাখান ফুলগুলোর বুকে দোলা লাগিয়েছে। সরু বার্চগাছ মর্মরশব্দ তুলে মাথা নুইয়ে যেন ভীষণ দুঃখে ট্যাংকের উপর ঝুঁকে পড়েছে। অনেক উঁচুতে ভেসে চলেছে সাদা মেঘ। দূর থেকে ভেসে আসছে কোকিলের সুরেলা ছন্দোময় ডাক।

দরজা খুলে কখন যে তাঁর স্ত্রী ঘরে ঢুকেছেন অধ্যাপক শাত্রভ তা খেয়ালও করেননি। হারমোনিয়ামের উপর ঝুঁকে পড়া নিশ্চল নিস্পন্দ শাত্রভকে দেখে তাঁর স্ত্রীর মমতাভরা ফিকে নীল চোখদুটিতে একটু উৎকণ্ঠার ভাব দেখা দিল।

'আলেক্সেই, খাবে না?'

শাত্রভ হারমোনিয়ামের ডালাটা বন্ধ করে দিলেন।

'তুমি আবার কী নিয়ে যেন চিন্তিত, তাই না?' সাইডবোর্ড থেকে প্লেট নামাতে নামাতে শাত্রভের স্ত্রী স্নেহের সঙ্গে বললেন।

'পরশুদিন অবজারভেটরিতে একবার বেলস্কির সঙ্গে দেখা করতে যাব। দিন দুয়েক ফিরব না।'

'আলেক্সেই, তোমার কী যেন হয়েছে। তোমার মতো ঘরকুনো লোক,

মাসের পর মাস ডেস্কের সামনে যার বাঁকা পিঠটা ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না, হঠাৎ আজ... কী হল তোমার? নিশ্চয়ই ছোঁয়া লেগেছে...'

'দাভিদভের, তাই তো?' শাত্রভ হেসে উঠলেন, 'না, ওলগা,তা মোটেই না! একচল্লিশ সালের পর দাভিদভের সঙ্গে আর দেখাই হয়নি।'

'তা ঠিক, কিন্তু প্রতি সপ্তাহে তোমরা দুজনে দুজনকে চিঠি লেখ!'

'ওটা বাড়িয়ে বললে। দাভিদভ এখন আমেরিকায়। ভূবৈজ্ঞানিকদের সম্মেলনে গেছে... ও, ভাল কথা মনে পড়ে গেল, দিন কয়েকের মধ্যেই ও ফিরবে। আজ রাত্রেই ওকে একটা চিঠি লিখতে হচ্ছে।'

অবজারভেটরির উদ্দেশে শাত্রভ বেরিয়ে পড়লেন। নাৎসীদের বর্বর আক্রমণে বিধ্বস্ত অবজারভেটরিটা তার ধ্বংসস্তূপ থেকে আবার মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

শাত্রভকে সবাই সাদর অভ্যর্থনা জানাল। তার অধ্যক্ষ আর বিজ্ঞান আকাদামীর সদস্য বেলস্কি স্বয়ং তাঁকে নিজের ছোট্ট বাড়ির একটা ঘরে রাখলেন। প্রথম দু'দিন শাত্রভ অবজারভেটরির যন্ত্রপাতি, তারার ক্যাটালগ আর চার্ট নিয়ে নাড়াচাড়া করে কাটালেন। তৃতীয় দিন শাত্রভকে শক্তিশালী একটা টেলিস্কোপ ব্যবহার করতে দেওয়া হল — তারা দেখার পক্ষে রাতটা ছিল সেদিন চমৎকার। নভোমণ্ডলের যেসব জায়গার কথা ভিক্তরের লেখায় বলা হয়েছে, শাত্রভকে বেলস্কি নিজেই সে জায়গাগুলো দেখিয়ে দিতে এগিয়ে এলেন।

বিরাট টেলিস্কোপওয়ালা হলঘরটার সঙ্গে ল্যাবরেটরির চেয়ে মস্ত ফ্যাক্টরীর কারখানা ঘরেরই মিল বেশি। শাত্রভের সঙ্গে ইঞ্জিনিয়ারিঙের কোনই সম্পর্ক নেই। কাজেই তাঁর মতো লোকের কাছে জটিল মেটাল কন্‌স্ট্রাক্‌শনগুলো সম্পূর্ণ রহস্যজনক ব্যাপার। শাত্রভ ভাবতে লাগলেন, তাঁর বন্ধু অধ্যাপক দাভিদভ যন্ত্রপাতি খুবই ভালবাসেন, তাঁর নিশ্চয় এখানে খুব ভাল লাগত। গোল টাওয়ারটায় বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি লাগান অনেকগুলো বোতামের মতো সুইচের প্যানেল। বেলস্কির সহকর্মী দক্ষহাতে নানারকম নাইফ-সুইচ্ আর বোতাম টিপে যন্ত্রটাকে চালাতে লাগল। বৈদ্যুতিক মোটরের গোঙানি শোনা গেল। টাওয়ারটা ঘুরে গেল। ওপেন-ওয়ার্কড্ গা,

ফীল্‌ড্‌গানের মতো দেখতে টেলিস্কোপটা দিগন্তের দিকে নেমে এল। মোটরের গোঙানিটা কমে একটা ক্ষীণ কান্নার আওয়াজে পরিণত হল; আন্দোলনটা আর প্রায় চোখেই পড়ে না।

বেলস্কির আহ্বানে শাত্রভ ড্যুরেলুমিনের তৈরী হালকা সিঁড়িটা দিয়ে উঠে গেলেন। উপরের মঞ্চটায় একটা হাতলওয়ালা চেয়ার। মেঝের সঙ্গে সেটা গাঁথা। দুজনে বসার পক্ষে যথেষ্ট প্রশস্ত। পাশে একটা ছোট্ট ডেস্ক, তার উপর নানারকম সব যন্ত্রপাতি, শাত্রভ যা জন্মে কখনো দেখেননি। বেলস্কি একটা ধাতব টিউব শাত্রভের দিকে টেনে বের করে দিলেন, টিউবটার প্রান্তে একজোড়া বাইনোকুলার লাগান, বাড়ির ল্যাবরেটরিতে শাত্রভ যে বাইনোকুলার ব্যবহার করেন সেই জাতীয়ই।

'এই বাইনোকুলারগুলো দিয়ে দুজন লোক একসঙ্গে দেখতে পারে,' বেলস্কি বললেন, 'এর ভিতর দিয়ে আমরা দুজনেই একই জিনিস দেখতে পাব।'

'হ্যাঁ, আমরা জীববিজ্ঞানীরাও এইরকমের যন্ত্র ব্যবহার করে থাকি,' অধ্যাপক শাত্রভ বললেন।

'চোখের পর্যবেক্ষণ এখন প্রায় বাতিল হয়ে গেছে,' বেলস্কি বলে চললেন, 'চোখ তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হয়ে পড়ে, যা দেখে তা ধরে রাখতে পারে না। আধুনিক জ্যোতিষচর্চায় খুব বড় সহায় হল ফোটোগ্রাফি। বিশেষ করে নক্ষত্র দর্শনে, আপনি যা নিয়ে এখন উৎসাহী। আপনি বলেছেন, যে কোন একটা তারা খুব বড় করে দেখাতে। এই দেখুন, দুটো খুব সুন্দর তারা, ফিকে নীল আর হলদে রঙের। "রাজহংস" নক্ষত্রমণ্ডলের। বাইনোকুলারটা যেমনভাবে চান সেইভাবে ঠিকঠাক করে নিন। দাঁড়ান, আলোটা নিভিয়ে দিই, আপনার চোখে তবে অন্ধকারটা সয়ে যাবে ...'

চোখদুটো কাচে লাগিয়ে শাত্রভ তাড়াতাড়ি স্ক্রুগুলো ঘুরিয়ে বাইনোকুলারটা ঠিক করে নিলেন। সামনের কাচের মাঝখানে ফুটে উঠল পাশাপাশি দুটো উজ্জ্বল তারা। অধ্যাপক শাত্রভ বুঝতে পারলেন, গ্রহ বা চাঁদ টেলিস্কোপে যেমন বড় করে দেখা যায়, তারার বেলায় তা হওয়া সম্ভব নয়, কারণ পৃথিবী থেকে তাদের দূরত্ব অনেক বেশি। তারপর আলোক রশ্মিকে আরো ঘনীভূত করে টেলিস্কোপ তাকে কেবল অনেক স্পষ্ট আর

উজ্জ্বল করে তোলে। তাই খালি চোখে যেসব লক্ষ লক্ষ তারা অদৃশ্য থেকে যায়, টেলিস্কোপে তারাও ধরা পড়ে।

দুটো ছোট্ট উজ্জ্বল আলোক ফোঁটার দিকে শাত্রভ চেয়ে রইলেন। তাদের ভাস্বরতা সবচেয়ে দামী রত্নের চেয়েও অনেকগুণ বেশি। তারা দুটো যেন গভীর অন্ধকার গহ্বরের মধ্যে পড়ে আছে। একই সঙ্গে ফুটে উঠেছে নিষ্কলুষ আলো আর অসীম দূরত্বের ভাব। দূর জগতের এই অপূর্ব দৃশ্য থেকে শাত্রভ আর কিছুতেই চোখ ফেরাতে পারেন না। বেলস্কি কিন্তু নির্লিপ্তচিত্তে চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, 'এবার অন্য কিছু দেখা যাক। এরকম সুন্দর রাত্রি সহজে আর পাওয়া যাবে না। টেলিস্কোপটাও পরে ব্যস্ত থাকবে। ছায়াপথের কেন্দ্রটা আপনি দেখতে চেয়েছিলেন, "নক্ষত্রচক্রের অক্ষ"।'

আবার মোটরের আওয়াজ শোনা গেল। শাত্রভ বুঝতে পারলেন মণ্ডটা নড়ছে। বাইনোকুলারের সামনে একটা নিষ্প্রভ আলো নেচে উঠল। বেলস্কি টেলিস্কোপটাকে আস্তে করে দিলেন। বিরাট যন্ত্রটা নিঃশব্দে প্রায় অদৃশ্যভাবেই নড়তে লাগল। শাত্রভের চোখের সামনে দিয়ে ভেসে গেল ধনুরাশি আর সর্প নক্ষত্রমণ্ডলে ছায়াপথের কিছুটা।

বেলস্কি অল্পের মধ্যেই খুব ভাল করে বললেন সবকিছুর পরিচয় আর অন্যান্য যাবতীয় খবর।

অনচ্ছ আভা থেকে ছায়াপথের নক্ষত্রচূর্ণ অজস্র আলোয় ফেটে পড়ল। তারপর সে আলো দীর্ঘকায় মেঘের রূপ নিল। তার মাঝখানে রইল দুটো কালো রেখা। এখানে ওখানে দেখা গেল কয়েকটা অতি উজ্জ্বল তারা; পৃথিবীর অপেক্ষাকৃত কাছেই তারা অতল অনন্ত শূন্যের বুক থেকে বেরিয়ে আছে।

টেলিস্কোপটাকে থামিয়ে বেলস্কি তার ম্যাগনিফাইং ক্ষমতা বাড়িয়ে দিলেন। কাচের সামনে আনলেন সমগ্র ছায়াপথটাকে — ঘন দীপ্ত বস্তুপুঞ্জ, তার মধ্যে তারাদের আলাদা করে দেখা যায় না। তার চারপাশে পুঞ্জীভূত লক্ষ লক্ষ তারা। তার কিছু ঘন, কিছু পাৎলা। এই সংখ্যাতীত তারার দল, আয়তনে আর ঔজ্জ্বল্যে যারা আমাদের সূর্যের চেয়ে কোন অংশে কম নয়, শাত্রভের মনে কেমন একটা অস্পষ্ট হীনতার ভাব এনে দিল।

‘এটা হচ্ছে ছায়াপথের মাঝখানটা,’ বেলস্কি বললেন, ‘পঁয়ত্রিশ হাজার আলোকবর্ষ দূরে। ঠিক কেন্দ্রস্থলটা আমাদের কাছে ঢাকা রয়েছে। খুব সম্প্রতি তার অস্পষ্ট, নিউক্লিয়াসের ইন্‌ফ্রা-রেড ছবি তুলতে সক্ষম হয়েছি, ঐদিকে, ডাইনে বিরাট কালো বস্তুপুঞ্জ কেন্দ্রস্থলটাকে আমাদের কাছ থেকে ঢেকে রেখেছে। কিন্তু তার চারদিকে তারারা ঘুরছে, তার মধ্যে রয়েছে সূর্য; তার গতিবেগ প্রতি সেকেণ্ডে ২৫০ কিলোমিটার; এই কালো পর্দাটা না থাকলে ছায়াপথটা আরো ভাস্বর হয়ে উঠত। রাত্রে আমাদের আকাশটা কালোর বদলে হয়ে উঠত ছাইরঙা। কিন্তু চলুন, এগন যাক ...’

নক্ষত্রজগতের ভিতরে দেখা গেল লক্ষ লক্ষ মাইল জোড়া কালো সমুদ্র।

বেলস্কি বললেন, ‘এরা হচ্ছে কালো ধুলো আর ঘন পদার্থের মেঘ। বিশেষ জাতের প্লেটে ফোটো নিয়ে দেখা গেছে এর ভিতর থেকে একেকটি তারা জ্বলে ওঠে, তাতে ইন্‌ফ্রা-রেড রশ্মি থাকে। এখানে বলে রাখি, এমন অজস্র তারা আছে যাদের কোনই আলো নেই। কাছেরগুলোকে জানতে পেরেছি তাদের শক্তিশালী রেডিও তরঙ্গ বিকিরণের ফলে — তাই এদের নাম “রেডিও তারা”।’

একটা মস্ত বড় নীহারিকাপুঞ্জে দেখা গেল এক অপূর্ব দৃশ্য। কালো কালো গহ্বরে ভরা আলোকিত ধোঁয়ার মতো নীহারিকা শূন্যে ঝুলে আছে, যেন ঝড়ে ছেঁড়া মেঘ। তার উপরে আর ডাইনে অস্পষ্ট ধূসর কুণ্ডলী। নক্ষত্রজগতের মধ্যবর্তী অতল গহ্বরে তারা ঢুকে যাচ্ছে। বহুদূরের তারার আলোর প্রতিফলন এসে পড়েছে মহাজাগতিক ধূলিকণার উপর। তার বিরাট আয়তনটা মনে মনে আঁচ করতে গিয়ে শাত্রভ শিউরে উঠলেন। ঐ যে কোন একটা কালো গহ্বর আমাদের সৌরচক্রটাকে অনায়াসেই গিলে ফেলতে পারে।

‘এবার ছায়াপথের ওপারে কিছু দেখার চেষ্টা করা যাক,’ বেলস্কি বললেন।

শাত্রভের টেলিস্কোপের কাছে গভীর অন্ধকার। সে অন্ধকার আমাদের ছায়াপথটাকে আলাদা করে রেখেছে ঐ জাতীয় অন্যান্য নক্ষত্র দ্বীপপুঞ্জের কাছ থেকে। বহু কষ্টে শাত্রভ কয়েকটা অত্যন্ত ক্ষীণ আলোর ফোঁটা দেখতে

পেলেন। সে আলো যেন কোনরকমে দৃষ্টিগোচর হয়ে কাঁপতে কাঁপতে নিভে গেল।

'এখন যা দেখছেন তা হচ্ছে আমাদের ছায়াপথের মতোই বিরাট নক্ষত্রজগৎ, তবে তাদের দূরত্ব ধারণার অতীত। এইখানে, পেগাসাসের দিকে দেখা যাচ্ছে মহাকাশে আমাদের জানা গভীরতম অংশ। এখন যে ছায়াপথটা দেখব সেটা হচ্ছে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। আকারে আর গঠনেও অনেকটা আমাদের এই বিরাট নক্ষত্রচক্রের মতোই। এই নক্ষত্রজগতেও নানা আকারের আর নানা ঔজ্জ্বল্যের তারা রয়েছে। সেই সঙ্গে রয়েছে একই রকমের কালো পদার্থের মেঘ। আমাদের মতোই সেই পদার্থের রেখা ছড়িয়ে পড়েছে নিরক্ষীয় অঞ্চলে। আমাদের মতোই তার চারদিকে গোল নক্ষত্রপুঞ্জ। এই নীহারিকাটা হচ্ছে উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রজগতের এম্৩১।'

লম্বাটে ডিমের মতো দেখতে একটা ম্লান আলোর মেঘের দিকে শাত্রভ চেয়ে রইলেন। তাঁর চোখে পড়ল কতগুলো সর্পিল ভাস্বর রেখা, তাদের মাঝে মাঝে কালো রঙের বিরতি।

নীহারিকার মাঝখানে দেখতে পেলেন যেন জমাট বাঁধা একটা আলোকিত পদার্থ দাঁড়িয়ে রয়েছে। জিনিসটা আসলে তারার সমষ্টি। এত দূর থেকে মনে হচ্ছে, সবকটা বুঝি মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। তার দুপাশ থেকে পাকান পাকান কী সব বেরিয়ে আছে। চারপাশে কালো চক্র মেশান পাৎলা আর নিষ্প্রভ বলয়। বলয়ের ধারটা, বিশেষ করে কাচের নিম্নপ্রান্তের কাছে সার সার গোল ফোঁটায় ভেঙে গেছে।

'ভাল করে দেখুন, অধ্যাপক! জীবাশ্মবিদ হিসেবে আপনার এতে কৌতূহল হওয়া উচিত। যে আলো আপনি এখন দেখতে পাচ্ছেন, সে আলো লক্ষ লক্ষ বছর আগে ঐ ছায়াপথ থেকে বিকিরিত হয়। পৃথিবীতে তখন মানুষ ছিল না!'

'অথচ ঐটেই আমাদের নিকটতম ছায়াপথের একটি!' শাত্রভ স্তম্ভিত হয়ে বললেন।

'ঠিক তাই! কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরের ছায়াপথেরও সন্ধান পাওয়া গেছে। তাদের আলোর গতি বছরে কোটি কোটি মাইল। আমাদের কাছে এসে

পেঁৗছতে লাগে একশ কোটি বছর। পেগাসাস নক্ষত্রজগতে এরকম ছায়াপথ আপনি দেখেছেন।'

'ধারণাতীত ব্যাপার! আপনি যতই বোঝান, ঐ বিরাট দূরত্ব আঁচ করার ক্ষমতা মনের নেই। অনন্ত, অপরিমেয় গভীরতা...'

আকাশের মধ্যে দিয়ে বেলস্কি অনেকক্ষণ ধরে শাত্রভকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন। অবশেষে শাত্রভ তাঁর আকাশচারী ভার্জিলকে সাবেগে ধন্যবাদ জানিয়ে শুতে গেলেন। কিন্তু অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁর ঘুম এল না।

চোখ বন্ধ করেও তিনি দেখতে পেলেন হাজার হাজার তারা। বিরাট বিরাট মেঘের মতো তারকাপুঞ্জ। শীতল পদার্থের কালো পর্দা আর আলোকিত গ্যাসের মস্ত টুকরো। হিমশীতল শূন্য গহ্বরে কোটি কোটি মাইল জুড়ে তারা ছড়িয়ে আছে। মাঝখানে কল্পনাতীত দূরত্বের ব্যবধান। ব্যবধান ঘোর কালো মহাশূন্যের, যার মধ্যে শক্তিশালী বিকিরণের দুর্বার স্রোত ছাড়া আর কিছুই নেই।

তারারা হল মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে সন্নিবিষ্ট পদার্থের বিরাট সঞ্চয়। সেই ভীষণ চাপের ফলে তাদের মধ্যে দেখা দেয় প্রচণ্ড তাপ। সেই তাপে উদ্ভূত পারমাণবিক প্রক্রিয়া থেকে উৎপন্ন হয় শক্তি। তাপ, আলো আর মহাজাগতিক রশ্মি মারফৎ বিরাট পরিমাণ শক্তি বের করে দিতে পারে বলেই তারারা তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পারে, কোন বিস্ফোরণ ঘটে না। এই শক্তির আধার তারাদের চারপাশে ঘোরে গ্রহদল, যারা তারাদের কাছ থেকেই নেয় পারমাণবিক শক্তি।

অজস্র বিচ্ছিন্ন তারা আর কালো, জমাট পদার্থের সঙ্গে মিশে এই গ্রহপরিবারগুলো একেকটি বিরাট চক্র গড়ে তুলেছে। বিপুল গভীর মহাশূন্যের ভিতর দিয়ে সে চক্র ছুটে চলেছে। মাঝে মাঝে আকাশ সমুদ্রের জাহাজের মতো তারারা একে অন্যের কাছে এসে পড়ে তারপর আবার কোটি কোটি বছরের জন্য দূরে চলে যায়। ছায়াপথগুলোরও বড় বড় জাহাজের সঙ্গে তুলনা দেওয়া যেতে পারে — হিমশীতল, অন্ধকার, অপরিমেয় মহাসমুদ্রের বুকে তারা ভেসে চলেছে একে অন্যের দিকে আলোর চোখ দিয়ে মিটিমিটি তাকাতে তাকাতে।

বিশ্বজগতের ছবিটা কল্পনা করতে গিয়ে শাত্রভের মনে এক অনাস্বাদিতপূর্ব

অদ্ভুত অনুভূতি দেখা দিল। বিরাট বিশ্বজগৎ — তার শীতল ভয়াবহ শূন্যতা, বিপুলকায় আগ্নেয় পদার্থ, দুর্গম দূরত্ব আর তার অন্তরের ঘটনাপ্রবাহের বিস্ময়কর স্থিতিকাল। ধূলোকণার মতো পৃথিবীর ভূমিকা সেখানে অত্যন্ত নগণ্য।

কিন্তু বিশ্বজগতের এই স্তম্ভিত করা রূপ কিছুক্ষণ পরেই বরবাদ হয়ে গেল প্রাণ আর তার বিরাট কীর্তি — মানুষের ধীশক্তির বিপুল গৌরবে। প্রাণ এতই নশ্বর আর ভঙ্গুর যে কেবল পৃথিবীর মতো গ্রহেই তার অস্তিত্ব সম্ভব। মহাকাশের কালো, প্রাণহীন গহ্বরের বুকে তার ছোট ছোট আলোর ফোঁটা উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে।

প্রাণের শক্তি আর টিঁকে থাকার ক্ষমতার উৎস তার জটিল সংগঠনে। মানুষের মন সবে বুঝতে সুরু করেছে সেই সংগঠনের স্বরূপ, বহু কোটি বছরের ঐতিহাসিক বিকাশের ফলে যা গড়ে উঠেছে। প্রাণ রূপ নিয়েছে ভিতরের বিরুদ্ধভাবের সংগ্রাম আর পুরনো থেকে নতুন, নতুন থেকে আরো নিখুঁত রূপের নিরন্তর পরিবর্তনের পর। মহাজাগতিক শক্তির ভীষণ বিরুদ্ধতা প্রাণকে বিনষ্ট করতে পারেনি। প্রাণ জন্ম দিয়েছে চিন্তার। চিন্তা দিয়েছে প্রকৃতি সংক্রান্ত জ্ঞান, বিশ্লেষণ করেছে তার নিয়মাবলী। তারপর প্রকৃতির বিরুদ্ধে তাদের প্রয়োগ করে জয় করেছে প্রকৃতিকে।

এইখানে এই মাটির বুকে আর মহাকাশের ঐ গভীরতায় প্রাণ প্রস্ফুটিত। প্রাণ হল চিন্তা আর কাজের এক বিরাট উৎস। কালের পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে তা সারা জগৎকে ভাসিয়ে দেবে, বিচ্ছিন্ন সব সারণিকে এক সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে গড়ে তুলবে চিন্তার অপরাজেয় মহাসমুদ্র।

শাত্রভ বুঝতে পারলেন রাত্রের অভিজ্ঞতা তাঁর মনে আবার সৃষ্টির প্রেরণা ও শক্তি জাগিয়ে তুলেছে, তাদের সক্রিয় করে তুলেছে। অবজারভেটরির এই রাত্রি আর তাও লির সেই বাক্স...

শাত্রভ বুঝতে পারলেন এবার তিনি তাঁর নতুন কাজে নির্ভয়ে এগিয়ে যেতে পারবেন, তা সে কাজ যতই অদ্ভুত হক না কেন।

"ভিতিম"এর ফার্স্ট মেট বেশ সহজ স্বাভাবিক ভাবেই চকচকে রেলিঙের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বিরাট স্টীমারটা যেন সবুজ জলের তালে

তালে দুলুনিতে ঘুমিয়ে পড়েছে। জলের গায়ে নৃত্যরত রোদের টুকরোর চুমকি। একটা লম্বা আর উঁচু গলুই বৃটিশ কার্গোম্যান কাছেই লম্বা মাস্তুলগুলোর ক্রস্‌দুটো অলস মন্থর চালে নাড়তে নাড়তে ধোঁয়া ছেড়ে চলেছে।

উপসাগরের দক্ষিণ তীরে খাড়া গোলাপী-লাল পাহাড়; তার গায়ে লাইলাক রঙের আভা। তীরের পায়ের কাছে ঘন ছায়া।

দৃঢ় পদক্ষেপের শব্দ শুনে অফিসারটি ঘুরে তাকিয়ে দেখতে পেল ব্রিজের মইয়ের উপর অধ্যাপক দাভিদভের বিরাট মাথা আর শক্তিশালী কাঁধ।

'এত আগে উঠেছেন যে?' অফিসারটি জিজ্ঞেস করল।

চোখ কুঁচকে নীরবে সূর্যের আলোয় আলোকিত দৃশ্যটা দাভিদভ একবার দেখে নিলেন। তারপর সস্মিত ফার্স্ট মেটের দিকে চেয়ে বললেন, 'হাওয়াইকে একবার বিদায় জানানর ইচ্ছে হল। বড় সুন্দর জায়গা... কখন রওনা হব?'

'ক্যাপ্‌টেন তীরে গিয়ে কাগজে সই মারছে। আমরা তো একেবারেই প্রস্তুত। ও ফিরে এলেই নোঙর তুলব। একেবারে সোজা ঘরমুখো।'

মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে দাভিদভ সিগারেটের জন্য পকেট হাতড়াতে লাগলেন। দাভিদভ বিশ্রাম পেয়ে খুবই খুসি। এই কয়দিন তাঁকে বাধ্য হয়েই বিনা কাজে কাটাতে হয়েছে, প্রকৃত বিজ্ঞানসেবীর ভাগ্যে এ সুযোগ বড় একটা জোটে না। দাভিদভ ফিরছেন সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো থেকে। ভূবিজ্ঞানী আর জীবাশ্মবিদদের — পৃথিবীর অতীত যারা খুঁড়ে বের করেন তাঁদের একটা সম্মেলন ছিল সেখানে।

ফিরতি পথটা সোভিয়েত জাহাজে ফেরার জন্য দাভিদভ বিশেষ ব্যগ্র ছিলেন, ঠিক সময়ে আবার "ভিতিম" জাহাজটাও পাওয়া গেল। হাওয়াইয়ে আসতে পেরে দাভিদভ আরো খুসি। প্রশান্ত মহাসাগরের অসীম বিস্তৃতিতে লুপ্ত এই রত্নটি একবার চট করে দেখে নেওয়ার সুযোগ তাঁর হল।

এখন চারদিকে তাকিয়ে বাড়ি ফেরার সম্ভাবনায় তিনি আরো খুসি। এই কয়দিন ধীরেসুস্থে পরম শান্তিতে দাভিদভ অনেক কথাই ভেবেছেন। তার ফলে অনেক সব কৌতূহলোদ্দীপক ধারণা তাঁর মাথায় এসেছে। এইসব ধারণা এখন বাস্তবে রূপ নেবার জন্য — তার মানে পরীক্ষা, তুলনা আর ব্যাখ্যার জন্য আকুল হয়ে উঠেছে। কিন্তু এখানে, এই ক্যাবিনে বসে তা সম্ভব নয়। প্রয়োজনীয় নোট্‌, বই, সংগ্রহের একান্ত অভাব এখানে।

দাভিদভ কপালের রগের কাছে আঙুল ঘষতে লাগলেন। তার মানে হয় কোন বাধা পেয়েছেন নয় বিরক্ত হয়েছেন।

একটা চওড়া তালবীথি কংক্রীট পীয়ারের বেরিয়ে থাকা কোণটার ডান দিকে এসে হঠাৎ থেমে গেছে। তাল গাছগুলোর ঘন, নরম মাথাগুলো নিষ্প্রভ তামার মতো জ্বলছে। গাছগুলো দূরে এগিয়ে গিয়ে ছায়া ফেলেছে সুন্দর সাদা সাদা বাংলোর উপর। বাংলোগুলোর সামনে নানা রঙের ফুলগাছ। ছোট ছোট উজ্জ্বল সবুজ গাছপালায় তীর আচ্ছন্ন। কালো ডোরা-কাটা একটা নীল নৌকো তীরের কাছে জলের উপর অল্প অল্প দুলছে। অল্পবয়সী তরুণতরুণীদের একটা ছোট দল হাসি ঠাট্টায় মেতে উঠে স্নানের জন্য তৈরী হচ্ছে। তাদের লাবণ্যেভরা জোয়ান শরীর সূর্যের আলোয় জ্বলছে ঘন ব্রোঞ্জের মতো।

দাভিদভের চোখ খুবই ভাল। পরিষ্কার আলোয় তীরের প্রতিটি ছোটখাট জিনিস তিনি অনায়াসেই দেখতে পাচ্ছেন। গোল ফুলের কেয়ারির মাঝখানে অদ্ভুত দেখতে একটা গাছের দিকে তিনি তাকিয়ে আছেন। গাছটার গোড়ার কাছে রুপোলি শীস্‌ওয়ালা কাঁটার মতো পাতা বেরিয়ে আছে। তাদের উপরে মস্ত একটা প্রায় মানুষপ্রমাণ লাল ফুল, দেখতে অনেকটা টাকুর মতো।

'ওটা কী ফুল বলতে পার?' দাভিদভ জিজ্ঞেস করলেন ফার্স্ট মেটকে।

'উঁহু,' তরুণ খালাসীটি গা ছেড়ে দিয়ে বলল, 'এজাতের ফুল আগেও দেখেছি। এখানকার লোকেরা বলে এফুল খুবই দুষ্প্রাপ্য ... কিন্তু অধ্যাপকমশাই, একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করি, যৌবনে আপনি খালাসীর কাজ করতেন, একথা কি সত্যি?'

হঠাৎ এরকম প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ায় দাভিদভ বিরক্ত হয়ে ভুরু কুঁচকে বললেন, 'হ্যাঁ সত্যি, কিন্তু সেকথায় কী দরকার! তুমি বরং ...'

বাড়ির ছাদগুলোর পিছনে কোথায় যেন একটা সাইরেন বেজে উঠতে উপসাগরের শান্ত জলে তার প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল।

ফার্স্ট মেট সতর্ক হয়ে উঠল। দাভিদভ চারিদিকে হতভম্বের মতো তাকাতে লাগলেন।

ছোট্ট সহরটা আর তার চওড়া মুখ উপসাগরটায় ভোরের শান্তি তখনো লেগে রয়েছে। তরুণ স্নানার্থীদের নৌকোটার দিকে দাভিদভ তাকালেন।

নৌকোর পিছনের গলুইয়ে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে, নিশ্চয় হাওয়াইনই হবে। জলপাইয়ের মতো তার গায়ের ত্বক। মেয়েটি খুশমেজাজে রুশ খালাসীদের উদ্দেশে হাত নেড়ে জলে ঝাঁপ দিল। তার স্নানের পোষাকের লাল ফুলগুলো পান্না-সবুজ রং তুলে কাচের মতো জল ভেঙে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। উপসাগরের বুকে দেখা দিল একটা ছোট্ট মোটরবোট। এক সেকেন্ড পরেই একটা গাড়ি ঘাটের কাছে এসে দাঁড়াল। "ভিতিমের" ক্যাপ্টেন লাফিয়ে নেমে স্টীমারের দিকে ছুটে এল। কোড্‌ফ্ল্যাগের দীর্ঘ সারি তখন পাক খেয়ে উঠে সিগ্‌ন্যাল মাস্তুলের উপর পৎপৎ করে নড়ছে। হাঁপাতে হাঁপাতে ক্যাপ্টেন ব্রিজের মই বেয়ে উঠে জ্যাকেটটার সাদা ধবধবে হাতাটায় মুখের ঘাম মুছে নিল।

'কী হয়েছে?' ফার্স্ট মেট উৎকণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞেস করল, 'ইয়েটা পড়তে পারছি না, মানে...'

'সবাই ডেকে এস!' গর্জে উঠে ক্যাপ্টেন মেশিন টেলিগ্রাফের হ্যান্ডেলটা চেপে ধরল, 'ইঞ্জিন তৈরী?'

কথা বলার নলটায় ঝুঁকে পড়ে ক্যাপ্টেন সংক্ষিপ্ত হুকুম দিয়ে বলল, 'সবাই ডেকে এস! পোর্টহোল বন্ধ কর ! ঘাটের কাছি খুলে ফেল!'

'রুশ জাহাজ, তোমরা কী করবে?' ইংরেজদের জাহাজের মেগাফোনটা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল।

'সমুদ্রে ওটাকে ধরব!' ক্যাপ্টেন সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল।

'ঠিক আছে! জোরসে ছোট পুরো দমে!' বেশ জোরের সঙ্গে ইংরেজটি হেঁকে উঠল।

"ভিতিমের" খোলটা উঠল কেঁপে। পিছন থেকে শোনা গেল জলের চাপা ঘড়ঘড় আওয়াজ। জাহাজঘাটাটা ধীরে ধীরে স্টারবোর্ডের দিকে সরে গেল। ডেকের উপর ছোটাছুটির আওয়াজ শুনে দাভিদভ একটু শংকিত হলেন। ক্যাপ্টেনের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন। ক্যাপ্টেন তখন সব কিছু ভুলে গিয়ে জাহাজ চালানর কাজেই ব্যস্ত।

সমুদ্র অত্যন্ত শান্ত। আগের মতোই তালে তালে দুলে চলেছে। খটখটে শুকনো আলোয় ভরা আকাশে এক ফোঁটা মেঘ নেই।

উপসাগরের মুখের দিকে বেঁকে জাহাজটা ধোঁয়া ছেড়ে এগতে লাগল।

ক্যাপ্টেন মস্ত একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রুমালটা বের করল। ডেকের সবার মুখ একনজর দেখে নিয়েই সে বুঝতে পারল প্রত্যেকে উৎকণ্ঠার সঙ্গে অপেক্ষা করে আছে। জানতে চায়, ব্যাপারটা কী।

'একটা মস্ত বেলোর্মি উত্তর-পূব থেকে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস তীর থেকে যতটা সম্ভব দূরে, সমুদ্রের বুকে পুরো গতিতে বেলোর্মির উপর গিয়ে পড়লেই আমরা রক্ষা পাব।'

দ্বীপ ছেড়ে জাহাজ কতটা এগিয়েছে দেখার জন্য ক্যাপ্টেন ঘুরে দাঁড়াল।

সামনে তাকিয়ে দাভিদভ দেখতে পেলেন অনেক ছোট ছোট ঢেউ তাদের দিকে পাগলের মতো তেড়ে আসছে। তাদের পিছনে আর্মির পুরোভাগের অনুগামী প্রধান বাহিনীর মতো ছুটে আসছে বিরাট এক ঢেউয়ের ধূসর প্রাচীর, দূর সমুদ্রের নীল দ্যুতি মুছে দিয়ে।

'খালাসীদের সবাইকে ডেকের নিচে যেতে বল।' ঝট করে টেলিগ্রাফ হ্যাণ্ডেলটার সুইচ চালিয়ে ক্যাপটেন বলে উঠল।

ছুটে আসা ঢেউগুলো ফেঁপে ফুলে উঠল। তীরের কাছে যতই তারা এগিয়ে আসে ততই তাদের চূড়াগুলো তীক্ষ্ন হয়ে ওঠে। "ভিতিমের" গলুইটা হঠাৎ উপরে উঠে সোজা দ্বিতীয় ঢেউটার চূড়ার নিচে ঢুকে গেল। ব্রিজের রেলিংটা দাভিদভ ধরে রয়েছেন। ঢেউয়ের নরম অথচ জোর ধাক্কার কাঁপুনিটা তাঁর হাতে এসেও পেঁছিল। ঢেউটা ব্রিজের সামনে উজ্জ্বল জলকণার ঘন মেঘ ছিটিয়ে ডেকের উপর দিয়ে ছুটে চলে গেল। মুহূর্তের মধ্যে "ভিতিমের" পিছনটা ঢেউয়ের মাথা থেকে নেমে পড়ল। কিন্তু সামনেটা আবার উপরে লাফিয়ে উঠল। খোলের অনেক ভিতরে নড়ে উঠল জাহাজের শক্তিশালী যন্ত্রপাতি। জাহাজটাকে ঠেলে ধরে পিছনে নিয়ে গিয়ে তীরের শক্ত গায়ে আছড়ে ফেলে চুরমার করে দেবার জন্য ঢেউগুলো ক্ষেপে উঠেছে। যন্ত্রপাতি মরীয়া হয়ে সেই ঢেউয়ের সঙ্গে সংগ্রাম করে চলেছে।

দৈত্যের মতো বিরাট ঢেউ প্রতি মুহূর্তে আরো লম্বা আর খাড়া হয়ে উঠে বিশ্রী চাপা গর্জন করতে করতে ছুটে আসছে। তার গায়ে এতটুকু ফেনার রেশ নেই। বিরাট মোটা ঢেউয়ের প্রাচীরের দ্যুতিহীন চমক দেখে দাভিদভের মনে পড়ে গেল তাঁর দেখা সোভিয়েত দূরপ্রাচ্যে সাগর তীরের

খাড়া ব্যাসল্‌ট্‌ পাহাড়গুলোর কথা। ঢেউটা ক্রমেই আরো উঁচু হয়ে উঠে আকাশ আর সূর্য ঢেকে দিল। তার সরু চূড়াটা "ভিতিমের" সামনের মাস্তুলটা ছাড়িয়ে মাথা তুলে দাঁড়াল। তার পায়ের কাছে ঘন, বিষণ্ণ ছায়া। সেই কালো গহ্বরে জাহাজটা পিছনে ঢুকে যাচ্ছে, যেন পরের মারাত্মক আঘাতের হাতে অসহায় ভাবে মাথা পেতে দিয়েছে।

ব্রিজের সবাই আপনা থেকেই সমুদ্রের এই আদিম প্রলয়ংকর রূপের কাঁছে মাথা নোয়াল। এক্ষুনি সেই প্রলয়ের মাঝখানে তারা পড়বে। জাহাজটা কেঁপে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। মহাসমুদ্রের দিকে তার যাত্রায় প্রচণ্ড বাধা পড়ল। ঢেউয়ের অন্ধশক্তির কাছে তার স্ক্রুর ছহাজার হর্স পাওয়ার কিছুই না।

প্রথম ধাক্কাতে ব্রিজের সবাই প্রাণভয়ে রেলিং আঁকড়ে ধরল। পরমুহূর্তেই দৈত্যের মতো ঢেউটা নিচে ঝরে পড়ে সবার চোখ কান ঢেকে দিল।

রেলিং জড়িয়ে ধরে খাবি খেতে খেতে অধ্যাপক তাঁর শরীরের প্রতিটি স্নায়ু দিয়ে অনুভব করতে লাগলেন জাহাজের খোলের কর্কশ গোঙানি। জাহাজটা বন্দরের দিকে পেছতে পেছতে সোজা হল, আবার স্টারবোর্ডের দিকে পিছিয়ে গেল। তারপর আবার সোজা হতে হতে গহ্বরের ভিতর থেকে উঠে এল। অত্যন্ত ধীরে ধীরে বেরতে বেরতে জাহাজটা হঠাৎ ধূসর প্রলয়ের ভিতর থেকে ছিটকে বেরিয়ে এল শান্ত, আলোকিত আকাশের দিকে।

ভীষণ গর্জন আর আওয়াজ দূরে ছড়িয়ে পড়ল। বিরাট ঢেউটার মাথা থেকে অধ্যাপক দেখতে পেলেন মহাসমুদ্রের উদার বিস্তার। ঢেউয়ের পিঠ বেয়ে জাহাজটা আলতোভাবে নেমে পড়ে এগিয়ে গেল। বিরাট ঢেউটার পর আরো ছোট ছোট ঢেউ তেড়ে এল। কিন্তু সেগুলো তেমন ভয়ানক কিছু নয়। ক্যাপটেন নাক ঝেড়ে কয়েকবার হেঁচে নিল। নিজের প্রতি সে তখন ভারী খুসি। দাভিদভ চোখ ঘষে নিলেন। গায়ের জামাকাপড় সব ভিজে জবজব করছে। ঢেউয়ের উপর ইংলিশম্যানকে ওঠা-নামা করতে দেখে হঠাৎ যেন তাঁর কী একটা মনে পড়ে গেল, তাড়াতাড়ি তীরের দিকে তাকালেন। জাহাজঘাটা আর সহরটা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বিরাট ঢেউটার দিকে চোখ পড়তে তাঁর বুক ভয়ে কেঁপে উঠল। ঢেউটা আরো লম্বা হয়ে উঠে ভীষণ বেগে ছুটে চলেছে। সবুজ বাগান, সাদা বাংলো আর জাহাজঘাটার সোজা, স্পষ্ট রেখাগুলো মুছে গেছে।

'আরেকটা আসছে!' অধ্যাপকের কানের কাছে চেঁচিয়ে উঠল ফার্স্ট মেট।

সত্যিই আরেকটা বিরাট ঢেউ জাহাজের দিকে এগিয়ে এল। আগে কেউ সেটাকে লক্ষ্য করেনি। "ভিতিমকে" যেন আচমকা আক্রমণ করার জন্যই ঢেউটা হঠাৎ মহাসমুদ্রের গহবর থেকে লাফিয়ে উঠেছে।

ঢেউয়ের পাহাড়টা কাঁধ তুলে কর্কশ গর্জন করতে লাগল, যেন রাগ তার ক্রমেই বেড়ে উঠছে। জাহাজটা আবার দাঁড়িয়ে পড়ে এদিক ওদিক দুলতে সুরু করল। ঢেউয়ের প্রবল প্রবাহের চাপে ক্লিষ্ট "ভিতিম" মরীয়া হয়ে এই মারাত্মক আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলল। ঢেউটা সরে গেল। তার পিছন পিছন এল আরো অনেকগুলো ছোট ছোট ঢেউ। মিনিট দুতিন পর তৃতীয় আরেকটা বিরাট ঢেউ ঝাঁপিয়ে পড়ল জাহাজের উপর, এবার অবশ্য ক্যাপ্টেনের টেলিগ্রাফিক সিগন্যাল শুনে জাহাজের যন্ত্রপাতি চট করে ঠিক সময় মতো "ভিতিমকে" পিছিয়ে আনতে পেরেছিল। তার ফলে ধাক্কাটা কম লাগল, ঢেউয়ের মাথাতেও জাহাজটা অনেক সহজেই উঠতে পারল।

পরিষ্কার, ঝলমলে, বাতাসহীন দিনে এই রহস্যজনক ঢেউয়ের সঙ্গে পুরো একটি ঘণ্টা লড়াই চলল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত "ভিতিম" ফুঁসে ওঠা সমুদ্রের বুকে দুলতে থাকল — জাহাজটা একেবারে ধোয়া মোছা হয়ে গেছে, তবে ক্ষতি কিছু হয়নি। অবশেষে ক্যাপ্টেন জানাল, বিপদ কেটে গেছে। এবার বন্দরে ফিরতে হবে।

দুঘণ্টা আগেই অধ্যাপক সহরটার সৌন্দর্য দু' চোখ ভরে উপভোগ করছিলেন। এখন আর কিন্তু তাকে দেখে চিনতে পারলেন না। সোজা সোজা পথ, ঝলমলে ফুলের বাগান আর নেই। বাড়িগুলোও অদৃশ্য। পড়ে রয়েছে কেবল ছড়ান অজস্র কড়ি বরগা, ভাঙা চাল আর আরো নানারকম সব জঞ্জাল। যে সুন্দর কুঞ্জবীথির কাছে ছেলেমেয়েরা স্নান করছিল, সে জায়গাটা এখন জলায় পরিণত হয়েছে, তার গায়ে ইতস্তত ছড়ান ভাঙা গাছের গুঁড়ির কালো ফোঁটা। জেটির দিকের কয়েকটা বড় বড় পাথুরে দালানের জানলা গেছে উড়ে, দেয়ালের কালো কোটরগুলো চেয়ে আছে বিষণ্ণভাবে। তাদের পায়ের কাছে যত্রতত্র গাদা হয়ে পড়ে আছে তীরের কুঁড়েঘর আর দোকানগুলোর ভগ্নাবশেষ।

ঢেউয়ের আঘাতে তীরের উপর ছিটকে পড়া বিরাট মোটর বোটটাকে মনে হচ্ছে প্রলয়ঙ্কর ঢেউয়ের বিজয়স্তম্ভ।

সমুদ্র নতুন বালি বিছিয়ে দিয়ে গেছে। তার উপর দিয়ে ছুটে চলেছে উজ্জ্বল জল ধারা। অত্যন্ত অসহায় ক্ষুদ্র মানুষ ধ্বংসাবশেষের মধ্যে খুঁজে বেড়াচ্ছে মৃতজনদের নয়ত জিনিসপত্র।

নীরব, নিরুৎসাহ সোভিয়েত খালাসীরা ডেকের উপর দাঁড়িয়ে বিমর্ষচিত্তে তাকিয়ে রয়েছে তীরের দিকে। নিজেদের সৌভাগ্যের আনন্দ তারা ভুলে গেছে। "ভিতিম" কংক্রীট পীয়ারে — সেটা ধ্বংসের হাত থেকে বেঁচে গেছে — নোঙর ফেলার সঙ্গে সঙ্গেই ক্যাপটেন খালাসীদের হুকুম দিল সহরবাসীদের সাহায্য করার। পাহারাদার ছাড়া জাহাজে আর কেউ রইল না।

সূর্যাস্তের পর দাভিদভ খালাসীদের সঙ্গে জাহাজে ফিরলেন। বিষণ্ণভাবে মুখ হাত ধুয়ে হাতের বিশ্রী আঁচড়গুলোয় ব্যাণ্ডেজ বাঁধলেন। তারপর সিগারেট ধরিয়ে অনেকক্ষণ পর্যন্ত পায়চারী করে চললেন ডেকের উপর।

জাহাজের কমিটির সভাপতি সেকেণ্ড ইঞ্জিনিয়ার দাভিদভকে এসে বলল, 'ঢেউগুলো কোথা থেকে এল সেকথা যদি আমাদের বুঝিয়ে বলেন।' বিধ্বস্ত দ্বীপটা তখন দিগন্তের ওপারে অদৃশ্য। ঠিক হল সভাটা ডেকের উপরেই বসবে।

এরকম অদ্ভুত পরিবেশে দাভিদভ আর কখনো বক্তৃতা দেননি। শ্রোতারা সবাই দাভিদভকে ঘিরে রয়েছে। কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে, কেউ বা ফোরহোল্ডের কাছে শুয়ে। জ্যাকেটে ঢাকা উইনশটাকে বক্তৃতা মঞ্চ হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। দাভিদভ তার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। মহাসমুদ্র অত্যন্ত শান্ত। ঘরমুখো জাহাজটার দ্রুতগতিতে বাধা জন্মানর মতো আর কিছুই কোথাও নেই।

প্রশান্ত মহাসাগরের এক বিস্তৃত বর্ণনা দাভিদভ দিলেন। পৃথিবীর বুকের বিরাট গহ্বর। এই গ্রহের সবচেয়ে বেশি জল তার গভীরেই রয়েছে। গহ্বরের চারপাশে, মহাদেশের কাছাকাছি, চাকার আকারে রয়েছে ভূত্বকের মালার মতো বিপুলকায় ভাঁজ। সমুদ্রের বিরাট গভীরতা থেকে তারা ধীরে ধীরে উঠে এসেছে। আলুশিয় আর জাপ দ্বীপপুঞ্জ, ডাচ্ ইস্ট ইণ্ডিজ

প্রভৃতি দ্বীপমালা হচ্ছে আসলে এইরকমেরই ভাঁজ, এখনো তাদের গঠনপ্রক্রিয়া শেষ হয়নি।

গঠনের এই প্রক্রিয়া নিরন্তর চলেছে; প্রতিটি ভাঁজের চূড়া হল উল্লিখিত দ্বীপ। ভাঁজগুলি ক্রমশ উপরে উঠছে — বছরে দুমিটার পর্যন্তও ওঠে — আর সেই সঙ্গে মহাসমুদ্রের দিকে ঝুঁকে পড়ছে।

দাভিদভ বললেন, ‘কল্পনা করতে চেষ্টা কর, প্রশান্ত মহাসাগরের সব জল বেরিয়ে গেছে ... তখন দেখতে পাবে দ্বীপ কোথাও নেই। রয়েছে কেবল উঁচু উঁচু পর্বতমালা। মহাসমুদ্রের কেন্দ্রের দিকে তারা অবনত। বিরাট বিরাট গহ্বরের উপর তারা ভয়াবহ ভাবে ঝুঁকে আছে। মস্ত মস্ত ঢেউ যেন জমাট বেঁধেছে। মহাদেশের দিকে মুখ করা, উল্টো দিকের ঢালুগুলো অত খাড়া নয়, কিন্তু অনেক দূর বিস্তৃত। তাদের নিচেও বেশ গভীর গহ্বর রয়েছে। মহাসমুদ্রের জলে সেসব ভরে থাকে। জাপান সাগর হল এইরকম গহ্বরেরই নিদর্শন। মহাদেশের দিকের ঢালুগুলোর ধারে ধারে রয়েছে আগ্নেয়গিরির মালা। ভাঁজগুলোর ভিতরের চাপ এতই ভীষণ যে তার ফলে তার ভিতরের শিলা গলে যায়। তারপর গলিত লাভার রূপে ভূত্বকে যেখানে যেখানে ফাঁক পায় সেখান দিয়ে বেরিয়ে আসে। ভাঁজগুলোর পায়ের চাপে মহাসমুদ্রের কেন্দ্রের দিকের গহ্বরগুলো ক্রমেই আরো গভীর হয়ে যায়। সেইখানেই দেখা দেয় বড় বড় ভূমিকম্পের কেন্দ্র।

‘ওরকম এক ভূমিকম্পেরই ফল হচ্ছে কালকের ঐ দুর্যোগ। উত্তরে কোথাও, বোধহয় আলুশিয় ভাঁজের পায়ের কাছে চাপের চোটে সমুদ্রের মাটি ডেবে গেছে, তার ফলে সমুদ্রগর্ভে দেখা দিয়েছে বিরাট এক ভূমিকম্প। এক বা একাধিক কম্পনের ফলে জন্ম নিয়েছে এক বিরাট ঢেউ। উৎস ছেড়ে দক্ষিণ মুখে হাজার হাজার মাইল ছুটে ঢেউটা কয়েক ঘণ্টা পরেই এসে পড়েছে হাওয়াইয়ে। খোলা সাগরের বুকে হলে জাহাজের আমরা ঢেউটা লক্ষ্যই করতাম না। কারণ তার ব্যাস এতই বিরাট (প্রায় ৯৪ মাইল) যে, জাহাজটা তার উপরে পুরোটা উঠে গেলেও আমরা কিছুই বুঝতে পারতাম না। কিন্তু কাছাকাছি মাটি থাকলে এরকমটা হতে পারে না। বিরাট জলরাশি বাধা পেলে বড় হয়ে, আরো উঁচুতে উঠে তীরের উপর প্রচণ্ড জোরে আছড়ে পড়ে। কিন্তু সে কথা বলা বাহুল্য, ঢেউয়ের ব্যবহার তোমরা নিজেরাই দেখেছ!

সমুদ্রের নিচে যে বালির চড়া থাকে ঢেউয়ের চেহারা আর চরিত্র স্বভাবতই তার দ্বারা নির্ধারিত হয়।

'এই জাতীয় ঢেউ প্রশান্ত মহাসাগরে প্রায়ই দেখা যায়। তার কারণ — তার ভূত্বকে এখনো ভাঁজ তৈরী হয়ে চলেছে। গত একশ কুড়ি বছরের মধ্যে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ ছাব্বিশবার এরকম ঢেউয়ের ঘা খেয়েছে। ঢেউগুলো চারিদিক থেকেই এসেছে। এসেছে আমাদেরটার মতো আল্যুশিয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে। তারপর জাপ দ্বীপমালা, কাম্‌চাৎকা, ফিলিপিন, সলোমন দ্বীপপুঞ্জ আর দক্ষিণ আমেরিকা থেকে। একবার মেক্সিকো থেকেও এসেছিল। শেষ ঢেউটা এসেছিল ১৯৩৮ সালে। ঢেউগুলোর বেগ হচ্ছে গড়ে তিনশ থেকে পাঁচশ নট ...।'

খালাসীরা তারপর প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে লাগল। সভাটা অনায়াসে আরো কয়েক ঘণ্টা চলত, কিন্তু পাহারা বদলীর জন্য মাঝখানেই থামিয়ে দিতে হল। তাঁবুর নিচে নিঃসঙ্গ দাভিদভ অনেকক্ষণ পায়চারী করলেন। ভুরু কুঁচকে ঠোঁট কামড়াতে কামড়াতে গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন।

অমন সুন্দর দ্বীপটা। মুহূর্তের মধ্যে এমন আচমকা ধ্বংস হয়ে গেল বলে দাভিদভ ভীষণ ব্যথা পেয়েছেন। খালাসীদের প্রায় সবকটা প্রশ্নই আশ্চর্যভাবে তাঁর চিন্তাধারার সঙ্গে মিলে গেছে। শুধু ভাঁজের গঠনপ্রক্রিয়াই নয়, গঠনের কারণটাও জানা অত্যন্ত দরকার। মাটির গভীরে কী ঘটছে যার ফলে এমন প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়, বিরাট শিলাপিণ্ড দুমড়ে মুচড়ে ভাঁজ হিসেবে ক্রমেই উপরে ওঠে? আমাদের গ্রহের গর্ভে কী ঘটছে সে বিষয়ে আমাদের জ্ঞান কী অসম্ভব রকম কম। পৃথিবীর ভিতরে যা আছে তার প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা প্রায় কিছুই জানি না। হাজার হাজার মাইল জোড়া রহস্যজনক পদার্থ আর লক্ষ লক্ষ বায়ুমণ্ডলের চাপে কী ভৌত আর রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটে চলেছে সে বিষয়ে আমাদের ধারণা খুবই স্বল্প।

অত্যন্ত সামান্য আণবিক পুনর্গঠনে, ঐ বিরাট বস্তুপিণ্ড অল্প একটু বেড়ে উঠলেই ভূত্বকের গায়ে বিরাট পরিবর্তনের সম্ভাবনা থাকে। তা গুঁড়িয়ে যেতে পারে, অনেক মাইল উঁচুতে উঠে যেতে পারে। কিন্তু আমরা জানি, সেরকম কোন ঘটনা কখনো ঘটে না। সুতরাং আমাদের এই গ্রহের ভিতরের বস্তুপুঞ্জ একটা সমশান্ত অবস্থাতেই আছে বলে ধরে নিতে হয়।

কেবল মাঝে মাঝে কোটি কোটি বছর পর কোন শিলাবলয় নরম হয়ে গিয়ে চাপের ফলে ভাঁজে পরিণত হয়, অনেকটা গলেও যায়। তারপর আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সঙ্গে বেরিয়ে আসে। সেই বেরিয়ে আসা চূর্ণ আর বিকৃত বস্তুপিণ্ড পৃথিবীর বুকে ভীষণ উঁচু আর বড় স্তূপের আকার নেয়। তারপর জল আর বাতাসের প্রভাবে সেই স্তূপ ক্ষয়ে গিয়ে দেখা দেয় নদী উপত্যকা আর পর্বতমালা, রূপ নেয় পাহাড়ে দেশ।

আশ্চর্যের ব্যাপার হল, অগ্ন্যুৎপাতের কেন্দ্র আর শিলাবিকৃতির অঞ্চলগুলো থাকে তুলনায় অগভীরে — পৃথিবীর বুক থেকে কয়েক ডজন মাইল নিচে। অথচ গ্রহের কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলো লুকিয়ে থাকে প্রায় দুহাজার মাইল পুরু স্তরের নিচে, অসীম শান্তিতে।

জাহাজের কিনারে গিয়ে দাভিদভ নিচে সমুদ্রের বুকের দিকে তাকালেন, যেন সাগরাঙ্ক থেকে পঞ্চাশ মাইল নিচে কী রহস্যজনক কাণ্ড ঘটে চলেছে তাই দেখতে চান।

আমাদের গ্রহের শক্ত ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া বস্তু গঠিত স্থায়ী রাসায়নিক মৌলিক পদার্থ দিয়ে — বিরানব্বইটি ইঁট, যা দিয়ে এই বিশ্বজগৎ তৈরী। পৃথিবীতে এই উপাদানগুলো স্থায়ী আর অপরিবর্তনীয়ই বলা যায়, কেবল অল্প কয়েকটি তেজস্ক্রিয়, আত্মবিসরণী উপাদান ছাড়া যেমন, ইউরেনিয়ম, সম্প্রতি যা অত্যন্ত খ্যাত হয়ে উঠেছে, থোরিয়ম, রেডিয়ম, পোলোনিয়ম। এই তালিকার সঙ্গে মেন্দেলেয়েভ টেবলের ৪৩, ৬১, ৮৫ আর ৮৭তম মৌলিক পদার্থগুলোও (টেক্‌নেটিয়ম, ইল্লিনিয়ম, এস্‌টাটিন্‌ আর ফ্র্যাংকিয়ম) যোগ করা হয়েছে। আপাতভাবে এদের সম্পূর্ণ বিসরণ ঘটেছে।

কিন্তু তারাদের ব্যাপার একেবারে অন্যরকম। ভীষণ চাপ আর তাপের ফলে তারায় মৌলিক পদার্থগুলোর রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। হাইড্রোজেন, লিথিয়ম আর বেরিল্লিয়মের রূপান্তর ঘটে হিলিয়মে। কার্বন পরিবর্তিত হয় অক্সিজেনে তারপর আবার কার্বনে। এই বিক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন হয় বিপুল পরিমাণ শক্তি — তাপ, আলো এবং আরো সব সমান জোরাল বিকিরণ।

পৃথিবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা যে ধারণাই পোষণ করি না কেন, একথা সুস্পষ্ট যে একসময়ে পৃথিবী ছিল তারার মতোই গলিত পদার্থের

গোলক। আমাদের গ্রহের ঠান্ডা হয়ে যাওয়া বস্তুপিণ্ডে হয়ত এখনো অস্থায়ী, অপরিচিত মৌলিক পদার্থ থাকতে পারে। সে যুগের পারমাণবিক প্রক্রিয়ার অবশিষ্ট।

একথা অনায়াসেই মনে করা যেতে পারে যে এই সব মৌলিক পদার্থ যেমন ইউরেনিয়ম, পৃথিবীর ত্বকের কাছাকাছি স্তরেই ছড়ান। তার ফলে তারা থাকে সুপ্ত অবস্থায়। কিন্তু বস্তুর নিরন্তর নড়াচড়া, অদলবদলের ফলে এমন সব মৌলিক পদার্থের বিরাট বিরাট সঞ্চয় গঠিত হয় যাদের পারমাণবিক ভার অত্যন্ত বেশি, যেমন ইউরেনিয়ম আর থোরিয়ম।

তারপর, আমরা জানি, বিসরণের ফলে ক্রমান্বয়ে একের পর এক শক্তিশালী বিক্রিয়া ঘটতে থাকে। তাতে বিপুল পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয় আর ভূত্বকের অংশগুলোও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

ভূত্বকের নিচে যেসব শক্তি কাজ করে চলেছে তারা যদি সত্যিই নক্ষত্র বস্তুর দীর্ঘকাল আগে নিভে যাওয়া পারমাণবিক রূপান্তরের অবশেষ হয়, সমুদ্রগর্ভের পারমাণবিক বিক্রিয়ার ফলেই যদি আমাদের গ্রহের পাহাড়গুলোর জন্ম হয়ে থাকে, তবে এই বিক্রিয়ার উৎস আমরা কোন না কোন সময়ে খুঁজে পাবই। আগ্নেয়গিরি অঞ্চলেই এদের খুঁজতে হবে, প্রশান্ত মহাসাগর আর অন্যান্য জায়গায় যে সব ভঙ্গিল পর্বত দেখা দিয়েছে সেইখানে। সমুদ্রগর্ভের বিক্রিয়ামালার ফলে যে শক্তিশালী বিকিরণ উপরে উঠে আসে তার সাহায্যে পারমাণবিক বিসরণের স্থান খুঁজে পাওয়া সম্ভব হতে পারে।

অনেক কাল আগে যে সব অঞ্চলে ভাঁজ আর পাহাড় গড়ে উঠেছে সে অঞ্চলের প্রাণীদের উপরে এই সব বিকিরণের প্রবল প্রভাব পড়াও খুবই সম্ভব।

মধ্য এশিয়ার লুপ্ত সরীসৃপদের বিরাট সমাধিক্ষেত্রগুলোর কথা দাভিদভের মনে পড়ল। ঐ সব সমাধিক্ষেত্র নিয়ে তিনি কাজও করেছেন। একটা জায়গায় একসঙ্গে লক্ষ লক্ষ সরীসৃপের দেহাবশেষ — ব্যাপারটা খুবই অদ্ভুত। দাভিদভ এর একটা ব্যাখ্যা খুঁজে পাবার অনেক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সফল হননি।

বৈজ্ঞানিকের সহজাত প্রবৃত্তির ফলে দাভিদভ বুঝতে পারলেন তাঁর এই অনুমানের মূল্য অসীম।

দাভিদভ গভীর চিন্তায় মগ্ন। সময় যে ওদিকে বয়ে চলেছে, সে খেয়াল তাঁর নেই। হঠাৎ ঘড়িতে চোখ পড়তে তিনি বিরক্ত হয়ে বলে উঠলেন, 'ঐ যা, অনেকক্ষণ খাবার সময় হয়ে গেছে।'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তারার মানুষ

দরজার কাচের প্লেটে লেখা:

অধ্যাপক ই. আ. দাভিদভ
বিভাগীয় অধ্যক্ষ

শাত্রভের মুখে একটা দুষ্টু হাসি ফুটে উঠল, দরজায় জোরে ধাক্কা দিলেন। বাঁ হাতে তাঁর মস্ত একটা বাক্স।

'ভিতরে এস!' দাভিদভের জোরাল, মোটা গলা শোনা গেল। বেশ বোঝা গেল এই ব্যাঘাতে ভদ্রলোক বিরক্ত হয়েছেন।

শাত্রভ একটু ঝুঁকে তাড়াতাড়ি ভিতরে ঢুকলেন। নামান ভুরুর নিচে চোখদুটো তাঁর জ্বলছে।

'হ্যালো!' চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে দাভিদভ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সত্যিই আশ্চর্য করে দিলে! কত বছর পর!'

শাত্রভ বাক্সটা টেবিলের উপর নামিয়ে রাখলেন। তারপর সুরু হল আলিঙ্গন।

তাঁর দশাসই বন্ধুর কাছে শাত্রভকে অত্যন্ত ছোটখাট দেখাল। নানাদিক দিয়েই এঁদের দুজনে প্রচুর অমিল। দাভিদভের বিরাট, খেলোয়াড়সুলভ চেহারা। হাঁটা চলাও বেশ ধীর মন্থর আর অনায়াস, তাঁর বিষণ্ণ বন্ধুটির মতো ক্ষিপ্র আর উত্তেজিত নয়। শাত্রভ আর দাভিদভের মুখেরও কোন মিল নেই। দাভিদভের মস্ত বড়, ভোঁতা নাক। কপালটা খাড়া। মাথায় একরাশ ঘন চুল। মিল রয়েছে কেবল দুজনের চোখে — স্বচ্ছ, উজ্জ্বল, বুদ্ধিদীপ্ত। বোধ হয় সংহত চিন্তা আর মনোবলের দীপ্তিই এই মিলের কারণ।

পুরনো বন্ধুকে দাভিদভ বসতে দিলেন। দুজনেই বেশ উৎসাহিত হয়ে উঠেছেন। গত কয়েক বছর ধরে চিঠিতে ভুল করে যে সব কথা লেখা হয়নি

তাই নিয়ে সুরু হল জোর আলোচনা। শেষকালে দাভিদভ নিজের কানটা মুচড়ে উঠে পড়লেন। ঘরের কোণে গিয়ে ওভারকোটের পকেট থেকে একটা বড়সড় গোছের মোড়ক বের করলেন। সেটা খুলে ভিতরের জিনিসগুলো শাত্রভের সামনে মেলে ধরলেন।

'এই নাও, আলেক্সেই পেত্রভিচ, একসঙ্গে সবটা খেয়ে নাও! যা বলছি শোন!' শাত্রভ আপত্তি জানাবার জন্য হাত তুলতে দাভিদভ গর্জে উঠলেন। দুজনেই তারপর হেসে ফেললেন।

'আবার ১৯৪০'এ ফিরে গেছি, তাই না?' শাত্রভ হেসে বললেন, 'এখনো তাহলে তুমি খেতে ভুলে যাও, আর তোমার স্ত্রীর কাছে তার জন্য ধমক খাও?'

দাভিদভ হোহো করে হেসে উঠলেন। 'ঠিক, এগুলো যদি ফেরৎ নিয়ে যাই তবে বউ আর আস্ত রাখবে না। কাজেই, ভাই, আমায় সাহায্য কর, ১৯৪০'এ যেরকম করতে। ভাল কথা, চল, মিউজিয়ামে যাই। একটা নতুন জিনিস তোমায় দেখাব, খুবই কৌতূহলজনক। তোমার জন্যও কিছু কাজ আছে ...'

'না, ইলিয়া আন্দ্রেয়েভিচ, আমি এখন যা নিয়ে কাজ করছি তার গুরুত্ব এর চেয়ে বেশি। সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত। আমি তোমার সাহায্য আর উপদেশ চাই। তোমার ঐ চমৎকার মাথাটি আমার এই কাজে একটু খাটাতে হবে।'

'বেশ কৌতূহলজনক বলে মনে হচ্ছে!' শেষ লাইনটা একবার দেখে নিয়ে পাণ্ডুলিপিটা সরিয়ে রেখে দাভিদভ বললেন, 'ও, তোমার চিঠিটা সপ্তাহখানেক আগে পেয়েছি, কিন্তু এখনো জবাব দেওয়া হয়ে ওঠেনি। আমি কিন্তু মানতে পারলাম না ...'

'আমার অভিযোগগুলো? জানই তো, মাঝে মাঝে ওরকম হয়...' শাত্রভ দোষী দোষী ভাব করে বললেন, 'তোমার চমৎকার দার্শনিক তত্ত্ব আমি মেনে নিয়েছি। তাতে ফলও পেয়েছি প্রচুর। অবশ্য তার জন্য শক্তিরও প্রয়োজন, তা না হলে সেই একই ...'

'কোন তত্ত্বের কথা বলছ?' দাভিদভ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

'তোমার এই মন্ত্রের মতো কথাগুলোয় যে তত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে —

"হাসিমুখে সহ্য করে চল।" যুদ্ধের সময় তোমার এই নীতি আমার খুব কাজে লেগেছিল!'

দাভিদভ হাসিতে ফেটে পড়লেন। তারপর দম নিয়ে বললেন, 'হাসিমুখে সহ্য করে চল! সেটাই তো ঠিক! কাজ করে যাওয়াই চাই। বাধা বিঘ্ন অনেক, তা জানি। আমাদের বিজ্ঞান বড় গোলমেলে — মাটি খোঁড়া, বিরাট বিরাট সংগ্রহ, তারপর ক্লাসিফিকেশনের কাজ। তাছাড়া লোকের এতই অভাব যে অত্যন্ত সামান্য কাজেও অনেক সময় নষ্ট করতে হয়। কিন্তু তুমি কী যেন বলছিলে, কী একটা নাকি ভাল কাজের সন্ধান নিয়ে এসেছ?'

'ব্যাপারটা অত্যন্ত অসাধারণ। এই বাক্সটার ভিতরে একটা অপূর্ব জিনিস আছে। ব্যাপারটা এতই অবিশ্বাস্য যে তোমাকে ছাড়া আর কাউকে একথা জানাতে আমার সাহস হয়নি।'

দাভিদভ এবার অস্থির হয়ে উঠলেন। চীনা হরফ আর পোস্টমার্কওয়ালা হলদে কার্ডবোর্ডের বাক্সটা খুলতে খুলতে শাত্রভের মুখে ফুটে উঠল আগেকার সেই দুষ্টু হাসি।

'তাও লিকে তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই?'

'নিশ্চয়! তরুণ চীনা জীবাশ্মবিদ। খুবই ক্ষমতা ছিল ছেলেটির। ১৯৪০ সালে একটা অভিযান থেকে ফেরার পথে মুক্ত চীনের শত্রুদের হাতে খুন হয়।'

'ঠিক। তার কয়েকটা আবিষ্কার আমি ক্লাসিফাই করি। তার সঙ্গে আমার চিঠিপত্রও চলত। তাও লি আমাদের এখানে আসবে বলেও ভাবছিল। কিন্তু আমাদের দেখা হওয়া কপালে ছিল না,' শাত্রভ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'মোট কথা, তার শেষ অভিযানের সময় তাও লি আমায় একটা ভারী অদ্ভুত জিনিস পাঠায়। এই বাক্সের মধ্যেই সেটা রয়েছে। সেই সঙ্গে সে লেখে, পরে এর একটা বিস্তৃত বিবরণ সে আমায় পাঠাবে। কিন্তু সে বিবরণ তাও লি আর লিখে যেতে পারেনি। চুংকিং'এর পথে জেচুয়ানে সে নিহত হয়।'

'অভিযানের জায়গাটা কোথায়?'

'সিকিয়াং প্রদেশে।'

'দীর্ঘ পথ! দাঁড়াও, তার মানে তাও লি গিয়েছিল হিমালয়ের পূবপ্রান্তের পাহাড়গুলোয়। জেচুয়ান পর্বতমালা আর হিমালয়ের পূবপ্রান্তের মাঝখানে

কোথাও। আরে, বিখ্যাত কাম্ তো ওখানেই। আমাদের খ্যাতনামা আবিষ্কারক প্র্জেভালস্কি যার এত স্বপ্ন দেখেছেন!'

শাত্রভ মৃদু হেসে তাঁর আনন্দ প্রকাশ করলেন, 'ভূগোলটা তোমার দেখছি সত্যিই ভাল করে জানা আছে! আমায় তো বহুকষ্টে ম্যাপ ঘেঁটে জায়গাটা বের করতে হয়েছিল। কাম্ হচ্ছে সিকিয়াং'এর উত্তর-পশ্চিম অংশে। তাও লি ঐখানেই কাজ করছিল। কাম'এর পূব অংশে, এন্দা অঞ্চলে।'

'আচ্ছা! তা এবার তোমার অত্যাশ্চর্য জিনিসটা দেখাও। কাম'এ সবকিছুই পাওয়া যেতে পারে!'

টিস্যুপেপারে ভাল করে মোড়া একটা জিনিস বের করে শাত্রভ মোড়কটা খুললেন। তারপর দাভিদভের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। মাটি থেকে খুঁড়ে বের করা একটা হাড়ের টুকরো। হাড়টা দেখে মনে হয় কেমন যেন আকারহীন।

ফিকে ধূসর রং শক্ত, ভারী টুকরোটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে দাভিদভ বললেন, 'এটা হচ্ছে বিরাট এক হিংস্র ডাইনোসরের মাথার পিছনের হাড়ের টুকরো। তবে এতে তেমন উল্লেখযোগ্য তো কিছুই দেখছি না।'

শাত্রভ কিছু বললেন না। হাড়টা আরেকবার দেখে দাভিদভ চমকে উঠলেন। টেবিলের উপর সেটা রেখে তাড়াতাড়ি একটা চকচকে হলদে বাক্স থেকে টিউবাকার আইপীস্টা দাভিদভ বের করে নিলেন। তারপর আইপীসের উপর ঝুঁকে পড়ে লেন্সের ভিতর দিয়ে চেয়ে রইলেন তাঁর বিরাট হাতে শক্ত করে ধরে রাখা ডাইনোসরের হাড়টার দিকে। কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। শাত্রভ একটা দেশলাই জ্বাললেন। বাইনোকুলার থেকে চোখ তুলে দাভিদভ ছানাবড়া চোখে তাকিয়ে বললেন:

'অবিশ্বাস্য! ব্যাখ্যার অতীত! খুলিটার সবচেয়ে মোটা জায়গাটাই ফুটো হয়ে গেছে। ফুটোটা খুবই সংকীর্ণ। কোন জন্তুর শিং বা দাঁত কখনো এত সরু ফুটো করতে পারে না। যদি কোন অসুখের ফলে হয়ে থাকে তাহলে তো ধারগুলোয় বিকৃতির চিহ্ন থাকত। সুস্থ হাড়ের উপরেই ফুটোটা হয়েছে। সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। একটা বুলেট যেন খুলির দুদিকের দেয়াল ভেদ করে চলে গেছে। স্রেফ পাগ্লামি মনে না হলে আমি তো এটা বুলেটেরই ফল বলতাম! কিন্তু না! ফুটোটা তো গোল নয়। সরু ডিমের আকারের, যেন

কেটে ফেলা হয়েছে... প্রস্তরীভবনের সময় অবশ্য আলগা জিনিসে ভরে গিয়েছিল।'

বাইনোকুলারটা দাভিদভ একপাশে সরিয়ে দিলেন, 'ভূতুড়ে স্বপ্নে আমি কখনো ভুগিনি, আর এমুহূর্তে মাথাটাও ঠিক আছে, পেটে কিছু পড়েনি। তাই বলছি, ব্যাখ্যার অতীত এক অদ্ভুত ব্যাপার আমাদের সামনে উপস্থিত!'

বাক্সের ভিতর থেকে শাত্রভ আরেকটা মোড়ক বের করলেন। ঘর আবার কাগজের খড়খড় শব্দে ভরে গেল।

'তোমার সঙ্গে আমি তর্ক করতে চাই না,' শাত্রভ ধীরে ধীরে বললেন, 'ব্যাপারটা অদ্ভুত। এর একাধিক কারণও খুঁজে বের করা যেতে পারে। কিন্তু ঠিক এই জাতেরই আরেকটা "কেস্" তোমার সব সন্দেহ দূর করে দেবে। এই নাও দুনম্বর কেস্!'

আরেকটা হাড়ের টুকরো শাত্রভ দাভিদভের সামনে টেবিলের উপর রাখলেন। হাড়টা খাঁজ-কাটা আর চ্যাপ্টা। দাভিদভ বোধহয় সিগারেটে একটু জোরেই টান দিয়েছিলেন, কাশতে কাশতে তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠল।

'হিংস্র ডাইনোসরের বাঁ কাঁধের হাড়,' দাভিদভের কাছে ঝুঁকে পড়ে শাত্রভ বললেন, 'কিন্তু আগের ডাইনোসরটা নয়। এটা আরো বুড়ো আর আকারে বড়।'

হাড়ের ছোট্ট ডিমের মতো ফুটোটার দিকে ঠায় তাকিয়ে থেকে দাভিদভ ঘাড় নাড়লেন। ডাইনোসরের বিরাট কংকালের একটা ছোট্ট টুকরো তাঁর সামনে ধরা রয়েছে।

'ঠিক সেই একই ফুটো!' রহস্যজনক ফুটোটার ধারগুলোয় আঙুল বোলাতে বোলাতে দাভিদভ উত্তেজিতভাবে বললেন।

'এবার দেখাব তাও লির নোট!' বিজয়ের উল্লাসটা প্রাণপণে চেপে রাখার চেষ্টা করে শাত্রভ বললেন। তাও লির আবিষ্কারের যে সম্ভাবনা তাতে মাথা ঘুরে যায়। কিন্তু শাত্রভ তার সঙ্গে আগেই পরিচিত বলে তাঁর পক্ষে মাথা ঠিক রাখা মোটেই কঠিন হল না।

মসৃণ, প্রবহমান রুশীর বদলে ঘরটা এবার ভরে উঠল ইংরিজীর কাটাকাটা চালে। চীনা জীবাশ্মবিদের ছোট্ট নোটটা শাত্রভ ধীরে ধীরে পড়ে চললেন:

"...এন্দার চল্লিশ মাইল উত্তরে, মেকঙের বাঁতীরের উপনদীগুলোর

মাঝখানে একটা মস্ত গহ্বর দেখতে পাই, এখন সেটা জুজেবু নদীর উপত্যকা। জায়গাটা হচ্ছে টের্শারি লাভার স্তরে ঢাকা একটা পাহাড়ের গহ্বর।

"নদীটা এই লাভার স্তর কেটে সোজা এগিয়ে গেছে। স্তরটা ত্রিশ ফুটের বেশি পুরু নয়। স্তরের নিচের আলগা বালি পাথরে ডাইনোসরীয় হাড় আর পুরো কংকালের এক বিরাট স্তূপ আমি আবিষ্কার করি। কতগুলো হাড়ে অদ্ভুত একধরনের ক্ষতচিহ্ন দেখতে পাই। আপনাকে সেরকম দুটো নিদর্শন পাঠাচ্ছি। জিনিসটা দেখে আমি অত্যন্ত অবাক হয়ে গেছি তাই তাড়াতাড়ি এবিষয়ে আপনার মত জানতে চাই। সবকটা ক্ষতচিহ্নই যে একধরনের, তা নয়। একেক জায়গায় মনে হচ্ছে যেন মস্ত বড় ছুরি দিয়ে হাড়গুলো কেটে ফেলা হয়েছে। ঘা'টা যে সুস্থ হাড়ের উপর পড়ে মৃত্যুর কারণ হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই উপত্যকার নানা জায়গায় পাওয়া এই জাতীয় ত্রিশটিরও বেশি নিদর্শন আমি চুংকিং'এ নিয়ে যাচ্ছি। নিদর্শনগুলোতে তাদের জায়গা অনুসারে লেবেল্ মেরেছি।

"এই নিদর্শনদুটি আমি অবিলম্বে আপনাকে পাঠাতে চাই। তাই বিস্তারিত চিঠি লেখার আর এখন সময় নেই। জেচুয়ানে পেঁছেই আপনাকে বড় করে চিঠি লিখব।"

শাত্রভ চুপ করে গেলেন।

'ব্যস, এই পর্যন্তই?' দাভিদভ অধীর হয়ে উঠলেন।

'হ্যাঁ। ওর আবিষ্কার যেমন বিরাট, চিঠিটা তেমনি ছোট্ট।'

'দাঁড়াও, আলেক্সেই পেত্রভিচ, আমায় একটু ভাবতে দাও। এ যেন একটা স্বপ্ন! এস, মাথা ঠাণ্ডা করে ব্যাপারটা নিয়ে কিছুক্ষণ আলোচনা করা যাক তা না হলে আমি পাগল হয়ে যাব!'

'কী বলতে চাও তা বুঝতে পেরেছি। এই ঘটনার যে স্বতঃসিদ্ধ ব্যাখ্যা মনে আসে, বৈজ্ঞানিকের পক্ষে তা মেনে নিতে সাহসের প্রয়োজন হয়। আমাদের এতদিনের যত প্রিয় তত্ত্ব এর ফলে ধূলিসাৎ হতে বসেছে। তোমার কাজে তুমি নির্ভীকতার যে পরিচয় দিয়ে থাক আমি আমার কাজে তা কখনো দিতে পারিনি। কিন্তু এবার তুমিও দেখছি গভীর জলে পড়েছ!'

'ঠিক আছে, যতদূর সম্ভব নির্ভীকভাবেই কাজ করব। এখানে আমরা একা। দুজন বিশিষ্ট জীবাশ্মবিদের, খুব রেখে ঢেকে বললেও, মাথার

গণ্ডগোল হয়েছে — একথা বলার মতো কেউ এখানে নেই। এস, তবে সুরু করা যাক! একথা ধরে নিচ্ছি যে, এই হিংস্র ডাইনোসরগুলোকে কোন একরকমের অত্যন্ত শক্তিশালী অস্ত্র দিয়ে মারা হয়েছে। অস্ত্রগুলোর ভেদ করার শক্তি আমাদের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের চেয়ে অনেক বেশি। একথাও প্রমাণ হচ্ছে যে, এই জাতীয় অস্ত্র যাদের সংস্কৃতি আর বুদ্ধির মান অত্যন্ত উঁচু কেবল তাদের পক্ষেই তৈরী করা সম্ভব। একথা স্বীকার কর?'

'সম্পূর্ণ স্বীকার করছি। সুতরাং — মানুষ!' শাত্রভ যোগ করলেন।

'হ্যাঁ। কিন্তু ডাইনোসরদের কাল হচ্ছে ক্রিটাকিয়াস পর্ব। ধর, সাত কোটি বছর আগে। বিজ্ঞান একথা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছে যে পৃথিবীতে মানুষ এসেছে প্রাণিবিকাশের বিরাট প্রক্রিয়ার একেবারে শেষ পর্বে। ছ'কোটি নব্বই লক্ষ বছর পরে। তারপর আরো লক্ষ লক্ষ বছর মানুষকে জন্তুর মতো কাটাতে হয়েছে। অবশেষে, খুব সম্প্রতি সে ভাবতে আর কাজ করতে শিখেছে। অত আগে মানুষ দেখা দিতে পারে না — বিশেষ করে যার প্রযুক্তিগত জ্ঞান এত উন্নত। এখন আর একটিমাত্র সম্ভাব্য সিদ্ধান্ত রয়েছে: ডাইনোসরদের যারা মেরেছে তারা পৃথিবীবাসী নয়। তারা অন্য জগৎ থেকে এসেছে...'

'ঠিক,' শাত্রভ দৃঢ়তার সঙ্গে বলে উঠলেন, 'আর আমি...'

'একমিনিট। এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের যুক্তিতে কোন ফাঁক দেখা যায়নি। কিন্তু এর পর আমাদের অসম্ভবের রাজ্যে এসে পড়তে হবে। জ্যোতিষ আর এস্‌ট্রোফিজিক্‌সের হালের সব আবিষ্কারে আমাদের পুরনো ধারণাগুলো একেবারে পাল্টে গেছে। অন্য জগতের অতিথিদের নিয়ে অনেক বই লেখা হয়েছে। বৈজ্ঞানিকরা এই সেদিন পর্যন্ত ভাবতেন, আমাদের সৌর জগৎটা বুঝি একটা অতুলনীয় ঘটনা। এখন কিন্তু সে ধারণা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। আরো অনেক তারারই যে গ্রহপরিবার আছে তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। বিশ্বজগতে তারার সংখ্যা যখন গণনার অতীত, তখন গ্রহপরিবারের সংখ্যাও নিশ্চয় খুবই বিরাট। কাজেই, একমাত্র পৃথিবীই যে মানুষের প্রাণের অধিকারী, সে কথা আর বিশ্বাস করা চলে না। বিশ্বজগতের অন্যান্য অংশেও যে প্রাণের বিকাশ ঘটেছে, একথা নির্ভয়ে ঘোষণা করা যেতে পারে। একথাও অনায়াসে ভাবা যেতে পারে যে প্রাণ সব জায়গাতেই অভিব্যক্তির নিয়ম মেনে চলে, তাই মননশীল প্রাণীর জন্মও সবসময়ই সম্ভব।

'এই তো সব তথ্য পেলে। কিন্তু এইসঙ্গে একথাও খেয়াল রাখতে হবে, আমাদের নিকটতম যে তারার গ্রহপরিবার রয়েছে সে তারাও আমাদের কাছ থেকে অনেক অনেক দূরে। এতই দূরে যে তার আলোর বেগ সেকেণ্ডে ২০০,০০০ মাইল হলেও সে আলো পৃথিবীতে পৌঁছতে বহু বছর লেগে যায়। পদার্থবিদ্যার নিয়ম অনুসারে মহাকাশযাত্রী কোন জাহাজের পক্ষে এরকম প্রচণ্ড বেগে ছোটা সম্ভব নয়। এর চেয়ে কম জোরে ছুটলে তো পৌঁছতে হাজার বছর লেগে যাবে।

'হাল আমলে কতগুলো অন্ধকার অদৃশ্য তারা আবিষ্কার করা গেছে তাদের বিকিরিত রেডিও তরঙ্গের সাহায্যে। আমাদের সৌর জগতের কাছাকাছি এরকম অনেক রেডিও-তারা আছে। কিন্তু প্রথমত, মহাকাশযাত্রী জাহাজের পক্ষে তারাগুলো অত্যন্ত দূরে। দ্বিতীয়ত, তাদের কোন গ্রহে প্রাণ আছে কিনা সে বিষয়েও যথেষ্ট সন্দেহ আছে, কারণ তাদের বিকিরণ এতই কম যে তা থেকে প্রয়োজনীয় তাপ পাওয়া সম্ভব নয়।

'আমাদের গ্রহপরিবারের মধ্যে একমাত্র মঙ্গল আর শুক্রগ্রহে মানুষ থাকতে পারে, কিন্তু সে সম্ভাবনাও অত্যন্ত কম। শুক্র অত্যন্ত গরম। আবর্তনও খুবই মন্থর। তার বায়ুমণ্ডল অত্যন্ত ঘন, তাতে অবাধ অক্সিজেনের একান্ত অভাব। তাই শুক্রগ্রহে প্রাণের সম্ভাবনা খুবই কম। অত্যন্ত বুদ্ধিমান আর সুসভ্য প্রাণী তো একেবারেই অসম্ভব। মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা যায়। মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডল অত্যন্ত পাৎলা আর হালকা। তার তাপও খুবই কম। মঙ্গলগ্রহে যদি প্রাণ থাকে তবে তা খুবই প্রাথমিক স্তরে অনুন্নত অবস্থায় রয়েছে। প্রাণিবিকাশের যে প্রবল শক্তি পৃথিবীতে মানুষের জন্ম সম্ভব করেছে মঙ্গলগ্রহে তার অভাব আছে। এবিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। শনি, বৃহস্পতি, ইউরেনাস্ আর নেপ্চুনের মতো দূরের বড় বড় গ্রহগুলোর কথা আর ধরলাম না। এরা অত্যন্ত ভীষণ। দান্তের ইন্ফার্নোর নিম্নাঞ্চলের মতোই, অন্ধকার আর জমাট হিমশীতল। যেমন, শনি—শনি হল ভীষণ ঘন বরফের দানবমুষ্ঠিতে আঁটা পাথুরে নিউক্লিয়াস। তার ব্যাসের পরিধি হল ৭০,০০০ মাইল। চারদিকে ১৫,০০০ মাইল ঘন বায়ুমণ্ডলের আবরণ। সূর্যের আলো সে আবরণ ভেদ করতে পারে না। তার উপর যত বিষাক্ত গ্যাস — এমোনিয়া

আর মিথেনে তা ভরা। এই বায়ুমণ্ডলের নিচে রয়েছে চিরন্তন বিষণ্ণ অন্ধকার, —১৫০° সেণ্টিগ্রেড তুহিন। আর লক্ষ লক্ষ বায়ুমণ্ডলের চাপ। ভয়াবহ ...'

'আমারও মনে হয়,' শাত্রভ বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'আমাদের এই গ্রহপরিবারের আর কোথাও মানুষ নেই। আর আমি...'

'ঠিক তাই। আমাদের গ্রহপরিবারে আর কোথাও প্রাণ নেই। দূরের নক্ষত্রজগৎ থেকেও পৃথিবীতে আসা সম্ভব নয়। তবে এই অদ্ভুত অতিথিরা এল কোথা থেকে? সেটাই বুঝতে পারছি না!'

'ইলিয়া আন্দ্রেয়েভিচ, আমার কথাটা তুমি সবটা শোননি। তোমার মতো পাণ্ডিত্য আমার নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি মোটামুটিভাবে একটা সিদ্ধান্তে পেঁৗছেছি। তারারা তো জানই সবসময় চলছে। আমাদের ছায়াপথের ভিতরে তারা চলছে। ছায়াপথটা নিজেও আবার আবর্তিত হচ্ছে। অন্যান্য আরো অসংখ্য ছায়াপথের মতো অজানা লক্ষ্যে ছুটে চলেছে। লক্ষ লক্ষ বছর পর পর হয়ত তারা কাছাকাছি এসে যায়।'

'কিন্তু তাতে আমাদের কী এসে যায়? আমাদের ছায়াপথের আয়তন এতই বিরাট যে এই সৌরমণ্ডলের কাছে অন্য কোন ছায়াপথের আসার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। তাছাড়া তারাপথগুলো নির্দিষ্ট করাও তো সম্ভব নয়।'

'মেনে নিলাম, কিন্তু শুধু এই সর্তে যে তারাদের চলাচল কোন বাঁধাধরা নিয়মের বশবর্তী নয়। কিন্তু সেকথা যদি ঠিক না হয়? সে নিয়ম যদি খুঁজে বের করা যায়, তখন?'

'হুঁ!' কথাটা দাভিদভের তেমন বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হল না।

'আচ্ছা, তবে তোমায় সব কিছু খোলসা করেই দেখাই। আমার এক প্রাক্তন ছাত্র তৃতীয় বর্ষে আমাদের বিভাগ ছেড়ে গণিত আর জ্যোতিষ বিভাগে ঢোকে। তার একটা অত্যন্ত কৌতূহলজনক আর সুপ্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব আছে। আমি সংক্ষেপেই বলব। আমাদের সৌরজগৎ ছায়াপথের ভিতরে একটা বিরাট উপবৃত্তাকার কক্ষে ঘুরছে। প্রতি বাইশ কোটি বছরে একটি আবর্তন সম্পূর্ণ হয়। এই কক্ষ আমাদের ছায়াপথের যে নক্ষত্র "চক্র" রয়েছে, তার অনুভূমিক সমতলের দিকে অল্প ঝুঁকে থাকে, তাই সূর্য আর গ্রহরা বিশেষ সময়ে ছায়াপথ "চক্রের" নিরক্ষীয় সমতলে যে কালো বস্তুকণা আর বিসরিত ঘন

পদার্থের পর্দা রয়েছে তা ভেদ করে ফেলে। এই সময়ে কেন্দ্রাঞ্চলে যে ঘনীভূত নক্ষত্র পরিবার রয়েছে সূর্য ও তার গ্রহগুলো তার কাছে আসে। যেমন ধনু রাশির নক্ষত্র জগৎ। তাই অন্যান্য অজানা গ্রহপরিবারের কাছে আসাও সৌরমণ্ডলের পক্ষে সম্ভব। তার ফলে শূন্য পেরিয়ে অন্য গ্রহে যাওয়াও সম্ভব হতে পারে।'

দাভিদভ চুপ করে বন্ধুর কথা শুনে চলেছেন। হাতটা তাঁর বাইনোকুলারের দণ্ডটার উপর যেন জমে গেছে।

'তত্ত্বটা হচ্ছে এই,' শাত্রভ বলে চললেন, 'পাণ্ডুলিপিটা পাওয়া গেছে যুদ্ধক্ষেত্রে, ছেলেটি যেখানে মারা যায়। আমি সদ্য সেখান থেকে ফিরছি। ছেলেটি মারা যায় তেতাল্লিশ সালে,' শাত্রভ একটু থেমে আবার উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলেন, 'এই তত্ত্বে ছেলেটি একটি সম্ভাবনার কথাই কেবল আলোচনা করেছে,' "কেবল"এর উপর জোর দিয়ে শাত্রভ বললেন, 'যা অবিশ্বাস্য তাকে আমরা সত্যিকার ঘটনা বলে মেনে নিতে পারি না, কিন্তু দুটো স্বতন্ত্র পর্যবেক্ষণের ফল যখন মিলে যায়, তখন আমরা যে ঠিক পথেই চলছি সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যেতে পারে।' থুৎনিটা বাড়িয়ে দিয়ে শাত্রভ বিশেষ একটা ভঙ্গী করে থেমে গেলেন। 'আমার ছাত্র তার লেখায় বলছে যে, প্রায় সাত কোটি বছর আগে আমাদের সৌরজগৎ, ছায়াপথের কেন্দ্রে যে ঘনীভূত অঞ্চল রয়েছে তার কাছাকাছি এসেছিল!'

দাভিদভ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সাংঘাতিক!' এটাই তাঁর অভ্যাস।

শাত্রভ গম্ভীর হয়ে বলে চললেন, 'একটা অবিশ্বাস্য অনুমান যখন আরেকটার সঙ্গে মিলে যায়, তখন সেটা বাস্তবে পরিণত হয়। নিচের এই কথাগুলো আমরা নির্ভয়ে মেনে নিতে পারি: ক্রিটাকিয়াস পর্বের কোন এক সময়ে আমাদের গ্রহপরিবার আরেকটা গ্রহপরিবারের কাছে আসে। দ্বিতীয় গ্রহপরিবারটাতে তখন মানুষ ছিল। মানে এক জাতের অত্যন্ত বুদ্ধিমান প্রাণী। সেই প্রাণীরা নিজেদের গ্রহ ছেড়ে আমাদের গ্রহের দিকে যাত্রা করে, মহাসমুদ্রের বুকে লোকে যেমন জাহাজ বদলায়। তারপর যে চিন্তাতীত দীর্ঘকাল পার হয়েছে তার মধ্যে গ্রহদুটো একে অন্যের থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। অজানা তারার অধিবাসীরা পৃথিবীতে বেশি দিন থাকেনি। তাই তাদের আগমনের কোন স্পষ্ট চিহ্নও রেখে যায়নি। কিন্তু

আমাদের গ্রহে তারা যে এসেছিল একথা ঠিক। গ্রহান্তরে যাত্রার কার্যকরী উপায়ের কথা আমরা এখন ভাবছি, অথচ সাত কোটি বছর আগেই তারা সে যাত্রা সম্ভব করেছিল। আমার বক্তব্যে তোমার কোথাও কোন আপত্তি আছে?'

দাভিদভ উঠে পড়লেন। বন্ধুর দিকে নীরবে তাকিয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন, 'তোমার কথা সত্যি হতেও পারে। যদিও সবকিছু এখনো পরিষ্কার হয়নি। যেমন এত গ্রহনক্ষত্রের মধ্যে ছোট্ট একটা বালির কণার মতো এই পৃথিবীটাকেই বা তারা কেন বেছে নিল? আরো প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা যেতে পারে। কিন্তু একথা ঠিক মূল বক্তব্যটা যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য। অদ্ভুত, বিস্ময়কর কিন্তু সম্ভব। কিন্তু এই আবিষ্কার তুমি কি সবার কাছে প্রকাশ করা উচিত বলে মনে কর?'

শাত্রভ মাথা নাড়ল। 'না, না! তার কোন দরকার নেই। এজাতীয় আবিষ্কারে তাড়াহুড়ো করা একেবারেই চলবে না।'

'ঠিক বলেছ, ভাই। ভাল করে দেখে নাও, তারপর ঝাঁপ দাও, তাই না? প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রমাণ একেবারে হাতে মুঠোয় থাকা চাই। আমাদের লেনিনগ্রাদের "যুক্তি"র মতোই জোরাল প্রমাণ, ঠিক কিনা বল?'

শাত্রভ মৃদু হাসলেন। "যুক্তিটা" হল একটা মস্ত লোহার ডাণ্ডা। লেনিনগ্রাদে একসঙ্গে কাজ করার সময় যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা তর্ক চলত তখন দাভিদভ থেকে থেকেই ঐ ডাণ্ডার ভয় দেখাতেন।

'ঠিক! এবার তোমার সঙ্গে আমার বাকি কাজের কথাটা বলি। আমি ভূবিজ্ঞানী বা ফীল্ড্ ওয়ার্কার কিছুই নই। আমি শুধু চেয়ারে বসেই স্বপ্ন দেখি। আমার কাজে তোমার মতো লোকের প্রয়োজন। তোমার সম্মান...'

'হা, হা! মোট কথা, তুমি চাও, ঐ নক্ষত্রবাসী আর ডাইনোসরদের যুদ্ধক্ষেত্রে আমিও গিয়ে পড়ি!'

তারপর একটুখানি ভেবে নিয়ে দাভিদভ বলে চললেন, 'সিকিয়াং জায়গাটা চিত্তাকর্ষক। বিশেষ করে আমাদের মতো জীবাশ্মবিদদের পক্ষে। একথা তুমি নিশ্চয়ই জান যে সিকিয়াং'এ টের্শারি পর্বের শেষ দিকে প্রাচীন আর নতুন জাতের স্তন্যপায়ী জীব একই সঙ্গে দেখা দিয়েছিল। সে এক অদ্ভুত জগাখিচুড়ি। তার কোন কোনটা পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলে লক্ষ লক্ষ

বছর আগেই লোপ পেয়েছে। কোন কোনটা আবার খুবই নতুন। এখন অবশ্য তারা সবাই লোপ পেয়েছে।

'তাছাড়া জায়গাটাও সুন্দর!' দাভিদভের গলায় একটা আন্তরিক উৎসাহ ফুটে উঠল, 'দীর্ঘ তুষারাবৃত পাহাড়; ঠাণ্ডা, শুকনো মালভূমি আর গভীর উপত্যকা, গ্রীষ্মাঞ্চলের বিচিত্র জৌলুষে ভরা। গ্রামের মাঝে মাঝে বিরাট অনতিক্রম্য গহবর... মাইলখানেকের ব্যবধান। এ গাঁয়ের লোকেরা ও গাঁয়ের লোকেদের দেখতে পায় কিন্তু কাছে যেতে পারে না, কারণ মাঝখানে ভীষণ গভীর উপত্যকা। উপরে বইছে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝড়। আর তার নিচের জঙ্গলে যত হিংস্র জন্তুর বাস, বিজ্ঞান যার সন্ধানও জানে না। ভারত, চীন আর সিয়ামের অনেক বড় বড় নদীর উৎস এখানে — ব্রহ্মপুত্র, ইয়াংৎসে, মেকং। চমৎকার জায়গা! তিব্বত, ভারতবর্ষ, সিয়াম আর বর্মার সংযোগস্থল!

'দুঃখের বিষয়, এবছর মানে ১৯৪৬ সালে, কমিউনিস্ট বৈজ্ঞানিকদের এদেশে ঢোকা বারণ,' দাভিদভ পকেট থেকে একটা বিরাট, পুরনো ধরনের ঘড়ি বের করলেন, 'এখনো দুটো বাজেনি। এরকম বিরাট উত্তেজনার মুহূর্তে সময় কী অদ্ভুতভাবে এগয়!' দাভিদভ উঠে পড়ে শাত্রভের দিকে তাঁর চাবির গোছাটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'বাক্সটা ঐ বইয়ের আলমারীতে রেখে দাও। আমাদের যথাসাধ্য করতেই হবে, একথা একেবারে ঠিক হয়ে রইল ... প্রথমে তুশিলভের সঙ্গে দেখা করতে হবে। মস্কোয় কয়েক দিন থাকবে তো? সব ব্যবস্থা হওয়া পর্যন্ত? তার মানে আরো সপ্তাহখানেক — তার আগে সব শেষ হওয়া সম্ভব না। তুমি কিন্তু আমার ওখানে থাকবে। এক্ষুনি আমি আমার সেক্রেটারি আর বাড়ির লোকদের টেলিফোনে জানিয়ে দিচ্ছি, আমাদের ফিরতে একটু দেরী হবে।'

অধ্যাপক দাভিদভের ফ্ল্যাটের আসবাবপত্রে মোটেই বড়লোকী ভাব নেই। গম্ভীর নিস্তব্ধতায় বাড়িটা ভরা। লম্বা জানলাগুলো দিয়ে মৃদু পায়ে ভিতরে এসে পড়েছে গ্রীষ্মগোধূলির নীলচে আলো। কাঁধদুটো কুঁজো করে শাত্রভ নীরবে পায়চারী করে চলেছেন। দাভিদভ তাঁর বিরাট লেখার টেবিলটার পিছনে আরামকেদারায় গোমড়ামুখ করে বসে।

দ্বজনেই গভীর চিন্তায় মগ্ন। দ্বজনের মন দ্বপথে কাজ করছে, কিন্তু চলেছে একই দিকে। কেউই আলো জবালতে চান না, যেন ঘনায়মান সন্ধ্যার অন্ধকারে নিজেদের মর্মবেদনা ঢেকে রাখতে চান।

'আমি কালকেই রওনা হব,' শাত্রভ অবশেষে বললেন, 'আর আমি অপেক্ষা করতে পারি না, তাছাড়া অপেক্ষা করে কোন লাভও নেই। একবার "না" বলে দিয়েছে, ঐ শেষ, আর কিছ্ব হবে না। এখন ভেবে দেখলে বোঝা যায়, এতে অবাক হবার কিছ্ব নেই। যাকগে, ভবিষ্যতের কর্মীদের জন্য কাজটা এখন তোলা থাক—এই যত বাজে সীমান্তের বাধা যখন একেবারে ঘ্বচে যাবে, তখন তারা ব্যাপারটার স্বরাহা করবে।'

দাভিদভ কিছ্ব বললেন না। জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন। আকাশে, রাস্তার ওপারের বাড়িগ্বলোর মাথায় ছোট ছোট নিষ্প্রভ তারাগ্বলো জবলছে।

'একটা বিরাট আবিষ্কারের দোরগোড়ায় ভিখারীর মতো দাঁড়িয়ে আছি, অথচ ম্বখের সামনে দরজাটা বন্ধ করে দিল। কী বিশ্রী!' শাত্রভ বলে চললেন, 'এই ব্যর্থতা জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমায় যন্ত্রণা দেবে। অন্য হাজার সফলতায়ও আমি সান্ত্বনা পাব না।'

দাভিদভ হঠাৎ দ্বহাত ম্বঠো করে মাথার উপর তুলে জোরে জোরে নাড়তে লাগলেন, 'এভাবে ছেড়ে দিলে চলবে না! সব রকম সাহায্য আমরা পাব, একথা নিশ্চিত! কাম্ জাহান্নমে যাক! ডাইনোসরের সঙ্গে লড়াইয়ের ক্ষেত্রেই যে তারা-মান্বষদের চিহ্ন পাব, তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? প্ৃথিবীতে এসে তারা যে কেবল একটা জায়গাতেই আটকে ছিল, সে কথা মনে করার কারণ কী? আমাদের নিজেদের দেশে যে ক্রিটাকিয়াস সঞ্চয় রয়েছে সেগ্বলোকে কেন খ্বঁড়ে দেখি না? একথা তো জানাই, অল্পবয়সী উঁচু পর্বতমালায় এজাতীয় সঞ্চয়ের সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। কাম অঞ্চলেই যে তা প্রথম আবিষ্কার করা গেছে, সেটা মোটেই আকস্মিক নয়। ভূত্বক যেখানে অসংখ্য ছোট ছোট ওঠা আর ডেবে যাওয়া অংশে ভেঙে গেছে কেবল সেখানেই যতরকমের ছোট ছোট আকস্মিক সঞ্চয় অবশ্যম্ভাবী ক্ষয় আর বিল্বপ্তির হাত থেকে রক্ষা পেয়ে টি'কে থাকতে পারে। তার মানে ক্রিটাকিয়াস পর্বের যেসব গহবরের কোন বদল ঘটেনি, ক্রমশ পলি পড়ে পড়ে যারা ঢাকা পড়ে

গেছে তাদের গর্ভে। সমতলে খংঁজে কোন লাভ নেই, কারণ সেখানকার সব চিহ্ন নষ্ট হয়ে গেছে। কাজাকস্তান, কির্গিজিয়া, উজবেকিস্তান, মধ্য এশিয়ার সর্বত্র খোঁজার মতো অজস্র জায়গা পাওয়া যাবে। এই সব পাহাড়গলো আল্‌পাইন উৎপত্তির বিরাট পর্বের অন্তর্গত। সে পর্ব সরু হয় ক্রিটাকিয়াস পর্বের শেষে। খোঁড়ার জায়গা অনেক পাওয়া যাবে, কিন্তু আগে ভাল করে জানতে হবে কী আমরা খংঁজে বের করতে চাই...'

'কিন্তু ইলিয়া আন্দ্রেয়েভিচ!' শাত্রভ বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, 'কী খংঁজতে হবে তা তো জানাই আছে—মানে, কাকে খংঁজতে হবে!'

'সেইখানেই আমরা ভুল করেছি। ঐ রহস্যজনক আগন্তুকদের চেহারাটা আগে ঠিক করে নিতে হবে। হয়ত তারা শধ্ব প্রোটোপ্লাজ্‌ম্‌, যার কোন চিহ্ন কোথাও থাকে না। তারপর তাদের আসার উদ্দেশ্যটাও খংঁজে বার করতে হবে। চেহারাটা আঁচ করতে পারলে খংঁড়ে কী পেতে চাই সে বিষয়ে আমাদের ধারণা পরিষ্কার হবে। উদ্দেশ্যটা ধরতে পারলে কোথায় খংঁড়লে ফল পাওয়া যেতে পারে সেটাও বঝতে পারা যাবে। আমাদের গ্রহের কোন অংশ তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে? এ নিয়ে যতই ভাবা যায়, সাফল্যের সম্ভাবনা ততই কমে আসে। অবশ্য তা বলে যে অনসন্ধান করব না তা নয়! একাজটাও তবে এস, দজনে আলাদা আলাদা ভাগে ভাগ করে নিই, আমাদের থিসিস নিয়ে একসঙ্গে কাজ করার সময় আগে যেমন করতাম। তুমি কাজ করে চল জীববিদ্যার পরিপ্রেক্ষিত থেকে, তার মানে একনম্বর সমস্যার ভার তোমার উপর। আমি কাজ করে চলি ভূবিদ্যার অংশটা নিয়ে। অনসন্ধানের স্থান নির্বাচন আর তার কাজকর্ম পরিচালনার ভার থাক আমার উপর। এর মধ্যেই কয়েকটা ভাল আইডিয়া মাথায় এসে গেছে—মধ্য এশিয়ার বিরাট বিরাট ডাইনোসরীয় সঞ্চয় এতদিন কি আর এমনি এমনি আবিষ্কার করে বেড়িয়েছি।'

'আমায় যে কাজের ভার দিলে, সেটা কিন্তু বড্ড কঠিন!' শাত্রভ বললেন, 'অন্য জগতে কী জাতের প্রাণ আছে তা আমি কী করে আঁচ করব, বল! ওকাজ মানষের ক্ষমতার অতীত!'

'এরকম দর্বলচিত্ত লোক আমি দচোখে দেখতে পারি না!' দাভিদভ হঠাৎ রেগে উঠলেন, 'কাজটা কঠিন, সেকথা ঠিক, এবিষয়ে কোন তথ্য

কোথাও পাওয়া যাবে না, অনুমানের উপর নির্ভর করতে হবে। মনের শক্তিই আমাদের একমাত্র আশা। কাণা দেয়াল ভেঙে আমাদের এগতে হবে। তোমার মতো মাথা যদি কিছু খুঁজে না পায়, তবে আর কে পাবে, বল? প্রাণের বিচিত্র রূপের ওসব ধারণা মন থেকে ঝেড়ে ফেল — ওসব তুলে রাখ গল্পলেখক আর তাদের পাথর আর লোহা আর আরো কী কী সবের মানুষদের জন্য। আমাদের ওসব নিয়ে মাথা ঘামালে চলবে না। প্রাণের শক্তির তত্ত্বের কথা মনে রাখ। সে তো আর হঠাৎ গজায়নি, বিশেষ নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারেই তা রূপ নিয়েছে। আমার মতে তার মূলসূত্রগুলো হচ্ছে এই — বিজ্ঞানের প্রতি সত্যনিষ্ঠ হতে হলে এইগুলো নিয়েই আমাদের সুরু করতে হবে। এক, বস্তুর সমতা একটা অবিসংবাদিত সত্য — পৃথিবীর মতো অন্য সবখানেই রয়েছে মূল বিরানব্বইটি মৌলিক পদার্থ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র যে একই রাসায়নিক আর প্রাকৃতিক নিয়ম কাজ করছে সেকথাও নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে। তা যদি সত্যি হয় তবে,' টেবিলের উপর জোর ঘুঁষি মেরে দাভিদভ বললেন, 'অত্যন্ত জটিল অণু নিয়ে গঠিত সজীব পদার্থের মূলে প্রধানত কার্বন আছে — এই উপাদানটি নানা জটিল সংযোগ গড়ে তুলতে সক্ষম। দুই, প্রাণ তার প্রাথমিক রূপে সূর্যের বিকিরিত শক্তি নিয়ে বেঁচে থাকে। বেঁচে থাকে সবচেয়ে বিস্তৃত আর কার্যকরী রাসায়নিক অক্সিজেনঘটিত বিক্রিয়ার সাহায্যে। বুঝতে পারছ?'

'সবই সমান,' শাত্রভ বললেন, 'যতক্ষণ না...'

'একমিনিট। অণুর গঠন যত জটিল হবে, বেশি তাপে তাদের ভাঙনও তত সহজেই ঘটবে। তারার বস্তুর তাপ অত্যন্ত বেশি বলে তাতে কোন রাসায়নিক সংযোগ ঘটে না। যে সব তারার তাপ অত বেশি নয় — যেমন, অপেক্ষাকৃত কম গরম লাল তারাদের বর্ণালী আর সৌরকলঙ্ক — তাদের মধ্যে অত্যন্ত প্রাথমিক গোছের রাসায়নিক সংযোগ দেখা যায়।

'সুতরাং, একথা বলা যেতে পারে প্রাণের প্রকাশ সম্ভব কেবল অপেক্ষাকৃত কম তাপে। তার রূপ অত্যন্ত অদ্ভুতও হতে পারে। তেমনি আবার তাপ খুব কম হলে চলবে না। তাতে অণুদের চলার বেগ হবে খুবই মন্থর, রাসায়নিক বিক্রিয়াও যাবে বন্ধ হয়ে, প্রাণের অস্তিত্বের জন্য যে শক্তির প্রয়োজন তা আর উৎপন্ন হবে না। এসব কথা বিচার করে আমরা প্রাণের অস্তিত্বের অনুকূল

সংকীর্ণ তাপ পরিধি প্রায় যথাযথভাবেই খুঁজে বের করতে পারি। লম্বা লম্বা যুক্তির ফিরিস্তি আউড়ে তোমার ধৈর্যের উপর আমি জুলুম করব না। এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে তাপ পরিধিটা আরো অনেক যথাযথভাবে নির্দিষ্ট করা যায়: তরল জলের অস্তিত্বের পরিধি। জীবের প্রাণের সক্রিয়তার জন্য যে মূল সলিউশন বা দ্রবণ প্রয়োজন, তা পাওয়া যায় জলে।

'প্রাণ যাতে প্রকাশ পেয়ে ক্রমশ জটিলতর হয়ে উঠতে পারে, তার জন্য দীর্ঘকালের ঐতিহাসিক বিকাশের প্রয়োজন। তার মানে তার অস্তিত্বের অবস্থা হওয়া চাই স্থায়ী। তাপ, চাপ, দীপ্তি আর যে সমগ্র ব্যাপারটাকে আমরা পৃথিবীর বুকের প্রাকৃতিক অবস্থা বলে থাকি, তার বদল ঘটা চাই অতি অল্প মাত্রায়।

'এখন, চিন্তাশক্তির প্রকাশ ঘটতে পারে কেবল সেইসব জটিল জীবের মধ্যে যাদের এনার্জেটিক্‌স্‌ অত্যন্ত উন্নত আর যারা একদিক দিয়ে দেখতে গেলে পরিবেশের প্রভাব থেকে কিছু পরিমাণে মুক্ত।

'গাছ আলোর সাহায্যে কার্বনের সংশ্লেষণ ঘটাতে পারে। যে সব প্রাণীর জারণক্ষমতা আছে, তাদের তুলনায় গাছের শক্তি সঞ্চয় ব্যবস্থা অনেক পরিমাণে আদিম। তাই গাছেরা অনেক বড় আকারে বেড়ে উঠলেও চলতে পারে না। বিরাট বিরাট গাছগুলো জীবজন্তুর মতো অমন জোরে আর তাড়াতাড়ি শরীর সঞ্চালন করতে পারে না। তাদের কলকব্জা অন্য ধরনের।

'মোট কথা, পৃথিবীতে প্রাণ যে রূপে আর যে অবস্থায় বিকাশ পেয়েছে তা মোটেই আকস্মিক নয়। তা প্রাকৃতিক নিয়মেরই অনুযায়ী। একমাত্র এই জাতীয় প্রাণই ঐতিহাসিক উন্নতির দীর্ঘপ্রক্রিয়া, তার মানে অভিব্যক্তির পথ ধরে এগতে পারে। সমস্যার পরিধিটা তবে এখন আরো ছোট হয়ে এল। প্রোটোজোয়া থেকে বুদ্ধির বিকাশের সম্ভাব্য ধারাটা এখন কেবল ঠিক করতে হবে। অন্য সব অনুমানের ফল হবে কেবল উৎকট কল্পনা আর অজ্ঞের মতো আজেবাজে বকুনি।'

'আমার উপর বড্ড বেশি রেগে গেছ, ইলিয়া আন্দ্রেয়েভিচ! সমস্যাটা নিয়ে মাথা ঘামাতে আমি কখনো আপত্তি করিনি। কথা দিচ্ছি, আমার সিদ্ধান্ত আমি গড়ে তুলব। সব তোমায় যথাসময়ে জানাব।'

'আপনার টেলিফোন, ইলিয়া আন্দ্রেয়েভিচ। গত কয়েকদিন ধরে আপনাকে ওরা অজস্রবার ফোন করেছে।'

গ্যালিপ্রুফ ছেড়ে জোর করে উঠতে উঠতে দাভিদভ একটা ক্লান্তি আর বিরক্তির আওয়াজ করলেন। প্রুফের লম্বা তাড়াটার গায়ে লেখা: "অধ্যাপক দাভিদভ। অত্যন্ত জরুরী! দয়া করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পাঠিয়ে দেবেন।" প্রুফের নিচে রয়েছে দুটো প্রবন্ধ। লেখাদুটোর সম্বন্ধে দাভিদভের মত চেয়ে পাঠান হয়েছে। ও দুটোও "যত তাড়াতাড়ি সম্ভব" পাঠানর কথা, কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি। দাভিদভ এতদিন কাম্‌ অভিযানের ব্যবস্থায় ব্যস্ত ছিলেন। এর মধ্যে অজস্র কাজ জমে গেছে। বাড়িতে আবার একটা মোটা থিসিস্‌ পড়ে আছে। যার থিসিস সে দাভিদভের মন্তব্যের অপেক্ষায় রয়েছে। তিন ঘণ্টা পরেই একটা লম্বা সভা বসবে। এইমাত্র একজন ল্যাবরেটরী এসিস্ট্যাণ্ট এসে তার কাজ দেখিয়ে কী কী করতে হবে জেনে গেল। শাত্রভের অপূর্ব আবিষ্কার সম্পর্কে এখন কত চিঠি লিখতে হবে তা একমাত্র ভগবানই জানেন, অথচ এই সময়েই এত কাজ ঘাড়ে চেপেছে।

রিসিভারটা ধড়াম করে নামিয়ে রেখে দাভিদভ আবার প্রুফের তাড়া নিয়ে বসলেন। কলমটা তাঁর ভয়ানকভাবে খ্যাঁচখ্যাঁচ করে প্রুফের ভুল কেটে চলল। সেই সঙ্গে চলল প্রুফরীডারদের শ্রাদ্ধ। ছাপা লাইনগুলো তারপর দাভিদভের চোখের সামনে নাচতে সুরু করল। দুয়েকটা ভুল নজর এড়িয়ে গেছে দেখে দাভিদভ বুঝতে পারলেন এবার থামার সময় হয়েছে। চোখদুটো ঘষে আড়ামুড়ি ভেঙে দাভিদভ হঠাৎ তাঁর জোরাল বেসুরো গলায় একটা একঘেয়ে, বিষণ্ণ গান গাইতে সুরু করলেন, 'ভল্‌গা মা গো...!'

আধা বন্ধ দরজাটায় একটা জোর টোকা শোনা গেল। দাভিদভ যে বিদ্যালয়ে কাজ করেন তার সহাধ্যক্ষ অধ্যাপক কল্‌ৎসভ্‌ ভিতরে ঢুকলেন। তাঁর মুখে একটা ব্যঙ্গের হাসি, মেয়েদের মতো লম্বা আর বাঁকা পাতার আড়ালে তাঁর কালো চোখদুটো অত্যন্ত বেমানান রকম করুণ।

'তোমার গান শুনে আমার বুক ফেটে যাবার জোগাড়,' কল্‌ৎসভ হেসে বললেন।

'আর বল কেন? কাজের আর শেষ নেই। তাও যত সব বাজে কাজ। কাজের কাজ করার উপায় নেই। যত বুড়ো হচ্ছি ততই রাজ্যের বাজে কাজে

নাকানিচোবানি খেতে হচ্ছে। আগের মতো শরীরে শক্তি নেই, বেশি রাত পর্যন্ত কাজ করতে এখন কষ্ট হয়। তাই খালি নাকে দড়ি অবস্থায় চক্কর খেয়ে মরছি!' দাভিদভ গর্জে উঠলেন।

'থাম, থাম, অত চেঁচিও না!' গোমড়া মুখ করে বললেন কল্‌ৎসভ, 'সব ঠিক হয়ে যাবে। নিজের অমন জোরাল শরীরটার দিকে একবার চেয়ে দেখ না। কলির হারকিউলিস!' কল্‌ৎসভ হেসে উঠলেন, 'এই নাও, আল্‌মা-আতা থেকে একটা চিঠি এসেছে। ব্যাপারটায় তুমি নিশ্চয়ই কৌতূহল অনুভব করবে।'

বাড়িগুলোর মাথার উপরে ফ্যাকাশে আকাশ। গ্রীষ্মের ভোর খুব সকাল সকালই হয়। তার আলোয় খোলা জানলার কাছের টেবিল-ল্যাম্পটা ম্লান হয়ে এসেছে। দাভিদভ সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তামাকটা কেমন বিস্বাদ ঠেকছে, ধোঁয়াটাও ক্লান্ত বুকের ভিতরটায় জ্বালা ধরিয়েছে। কিন্তু কাজ শেষ — সামনে বই আর কাগজপত্রের ভীড়ের মধ্যে পড়ে রয়েছে এগারটা চিঠি, মধ্য এশিয়ার ক্রিটাকিয়াস সঞ্চয় নিয়ে যারা কাজ করছে তাদের কাছে লেখা। এখন কেবল খামে পোরা বাকি। তাহলেই চিঠিগুলো সকালবেলার ডাকেই চলে যাবে। দাভিদভ ঠিকানা লিখতে লাগলেন, তাঁর স্ত্রী যে কখন ঘরে ঢুকেছেন, সে দিকে তাঁর খেয়ালও নেই। ছোট ছোট মুঠো দিয়ে দাভিদভের স্ত্রী বাচ্চা মেয়ের মতো চোখদুটো ঘষে নিলেন। তারপর বেশ রেগে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'তোমার লজ্জা করছে না? কী রকম আলো হয়ে গেছে। অথচ কথা দিয়েছ, রাত জেগে কাজ করবে না, সেকথা বুঝি একেবারে ভুলে গেলে? এদিকে বলবে "ক্লান্ত লাগছে", তারপর আবার এইভাবে কাজ করে চলবে! সত্যি লজ্জা হওয়া উচিত!'

'এই শেষ হয়ে গেল। দেখছ তো, আর পাঁচটা খাম কেবল বাকি আছে,' দাভিদভ দোষী দোষী ভাব করে বললেন, 'আর কখনো রাত জেগে কাজ করব না। আজকে যে উপায় ছিল না... যাও, তুমি গিয়ে শুয়ে পড়।'

শেষ ঠিকানাটা লিখে দাভিদভ আলো নিবিয়ে দিলেন। সকালের ম্লান আলো আর ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরে ঢুকে একটা স্বচ্ছ, শান্ত জ্যোতিতে সবকিছু ভরে দিল।

আকাশের দিকে তাকিয়ে দাভিদভ কপাল চাপড়ালেন। মধ্য এশিয়ার পাহাড়ে গহ্বরে তারা-মানুষদের অনুসন্ধান — ব্যাপারটা হঠাৎ তাঁর কাছে অত্যন্ত অসম্ভব বলে মনে হল।

পৃথিবীতে জীবজন্তুর জীবাশ্ম তুলনায় প্রচুর আছে, সেকথা ঠিক। তার কারণ এককালে কোটি কোটি প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াত। তার অনেকেই এমন জায়গায় মরেছে যেখানে পাথর হয়ে সংরক্ষিত থাকাটা সম্ভব। এরকম হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু অন্য জগতের ঐ অতিথিরা তো দলে খুব বেশি ভারী হতে পারে না। যদি বা তাদের আসার কোন চিহ্ন থেকে যায়, সে চিহ্ন খুঁজতে হবে পরবর্তী বিরাট সঞ্চয় স্তূপের তলে। হাজার হাজার কিউবিক মাইল শিলার ভিতরে। তার জন্য প্রয়োজন বিরাটায়তনের খোঁড়ার কাজ। হাজার হাজার কিউবিক ফুট পাথর তোলার জন্য চাই বিরাট এক শ্রমিকবাহিনী। উপরের স্তরগুলো তুলতে হবে কয়েকশ' শক্তিশালী এক্সকাভেটরের সাহায্যে। সে এক কল্পনাতীত ব্যাপার! এমন বিরাটায়তনের খোঁড়ার কাজে যে পরিমাণ টাকার প্রয়োজন তা জোগাবার সাধ্য কোন দেশের নেই, তা সে যতই ধনী হক না কেন। প্রত্নজীববিদ্যার কাজে সাধারণত ৪,০০০ বর্গ ফুট জুড়ে খোঁড়ার কাজ চালান হয়। একাজে সে তো সমুদ্রে এক ফোঁটা জল। সত্যিই, সাফল্যের কোন সম্ভাবনাই নেই!

সাদা চোখে এই কঠিন বাস্তব সত্যটা দেখে দাভিদভের মাথা হতাশায় নুয়ে পড়ল। তাঁর আইডিয়া হাস্যকর, পরিকল্পনা বৃথা।

শাত্রভের কথাই ঠিক। তার পরিষ্কার মাথা। তাই সে বেশ বুঝতে পেরেছিল কাজটা কী ভীষণ কঠিন।

"সাংঘাতিক!" দাভিদভ মনে মনে চেঁচিয়ে উঠলেন, "এই সব সন্দেহ এখন আমায় আর এক ফোঁটাও ঘুমতে দেবে না। মনটাকে অন্য কথায় ব্যস্ত রাখতে হবে। ঠিক, কল্ৎসভের চিঠিটা গেল কোথায়। তাতে কী আছে, কে জানে?"

ব্রীফ-কেস খুলে দাভিদভ চিঠিটা খুঁজে পেতে বের করলেন।

চিঠিটা একজন বিখ্যাত ভূবিজ্ঞানীর লেখা। তিনি জানাচ্ছেন এবছরেই তিয়েন-শান'এর অনেকগুলো পাহাড়ে গহ্বরে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ একটা বিরাট নির্মাণকাজ সুরু হবে। অনেক খাল কাটা হবে আর জলবিদ্যুৎ

কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। খাল তৈরীর ব্যাপক কাজে দুটো গুরুত্বপূর্ণ সংযোগ গড়ে উঠবে, চু নদীর ভাঁটি অঞ্চলের দু'নম্বর নির্মাণক্ষেত্রে আর কার্কারিয়ান গহ্বরের নিকটবর্তী পাঁচ নম্বর ক্ষেত্রে। সে কাজে ক্রিটাকিয়াস সঞ্চয়ের উপরের স্তরগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে। এই স্তরগুলোয় প্রচুর পরিমাণে ডাইনোসরের হাড় সঞ্চিত আছে। তাই জীবাশ্মবিদদের সবসময় খোঁড়ার কাজে চোখ রক্ষা অতি অবশ্যই প্রয়োজনীয়। এর জন্য রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিটির সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে হবে। পরে নির্মাণকাজের ব্যবস্থাপকদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে সরজমিনে কাজ করতে হবে।

চিঠি পড়তে পড়তে দাভিদভের মনে হল তাঁর হতাশার ভাবটা যেন ক্রমশ কেটে যাচ্ছে। বেশ বুঝতে পারলেন এক দুর্লভ সৌভাগ্য তাঁদের সহায় হয়ে এসেছে। বিজ্ঞানের প্রয়োজনের সঙ্গে মিল ঘটেছে জাতীয় অর্থনীতির। মেহনতী মানুষের পুরো শক্তি এখন নিয়োজিত হবে এই খোঁড়ার কাজে। অত্যন্ত কল্পনাবিলাসী জীবাশ্মবিদও কখনো এরকম বৃহদায়তন খোঁড়ার কাজের স্বপ্ন দেখেননি। তাও লি'র বিরাট বিস্ময়কর আবিষ্কারের সমর্থনে কিছু প্রমাণ এবার পাওয়া যেতে পারে। ভাগ্য যদি অনুকূল হয়, তবে তাঁরা প্রমাণ করে দেবেন যে শুধু পৃথিবীতে নয়, এই বিশ্বজগতের অন্যত্রও মানুষ আছে।

সহরের উপর উঠেছে উজ্জ্বল, নতুন সূর্য। মেঘগুলো যেন স্বচ্ছ সোনালী জলের মাথায় লাইলাক রঙের ফেনা। সহরের গুঞ্জনে ঘর ভরে উঠেছে।

দাভিদভ উঠে দাঁড়িয়ে লোভীর মতো জোরে জোরে কিছুটা খোলা হাওয়া টেনে নিলেন। তারপর পর্দাগুলো টেনে দিয়ে জামাকাপড় ছাড়তে সুরু করলেন।

সদ্য শেষ-করা খুলির ছবিটা শাত্রভ টেনে নিয়ে বাজে কাগজের ঝুড়িতে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। তারপর টেবিলের বইয়ের গাদা থেকে টেনে নিলেন একটা ছোট্ট পুস্তিকা।

সেটা আর খোলা হল না, তার আগেই হারিয়ে গেলেন নিজের আগেকার দুশ্চিন্তায়।

প্রথম আবিষ্কারকের পথ — নিশিতা দুরত্যয়া! অনেকক্ষণ ভাবতে ভাবতে মনটা হঠাৎ যত আজগুবি অনুমানের অন্ধ জঞ্জাল ছেড়ে উপরে উঠে যায়। কিন্তু চিন্তার সেই ঊর্ধ্বযাত্রা যেমন দুর্লভ তেমনি দুর্মূল্য। অত্যন্ত বিশ্রী আর কষ্টকর এই বিপজ্জনক পথ বেয়ে ধীরে ধীরে ওঠা। কাঁধে তথ্যের হাড়ভাঙা বোঝা। সে বোঝা ক্রমশই টানছে নিচে, আরো নিচে...

কিন্তু কাজটা তাঁর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, মহান। সাত কোটি বছর আগে অন্য জগতের ঐ লোকেরা কী অসীম সাহস আর অধ্যবসায়েরই না পরিচয় দিয়েছে! তাদের নির্ভীক মন আর বুদ্ধি গ্রহান্তরে যাত্রার বিপদ আপদের কথা ভেবে দমে যায়নি। ঐ অজানা তারা-মানুষরা সাহসে ভর করে নিজেদের জগৎ ছেড়ে অন্য জগতে যাত্রা করেছে। জগৎদুটো যে প্রচণ্ড বেগে একে অন্যের থেকে দূরে চলে যাচ্ছে তা তারা ভাল করেই জানত। জানত, প্রতি সেকেণ্ডে তাদের গ্রহ দূরে সরে যাচ্ছে, মাঝখানে গড়ে উঠছে শত শত মাইলের ব্যবধান। তারা কিন্তু ঠিক তাদের কাজ, তা সে যাই হক না কেন, শেষ করে ফিরে গেছে...

ফিরে নিশ্চয়ই গেছে নয়ত এই পৃথিবীতে পা দিয়েই মারা পড়েছে। যদি তারা থেকে যেত তাহলে প্রকৃতির যে পরিবর্তন তারা অবশ্যই ঘটাত তার চিহ্ন অনেক আগেই পাওয়া যেত। সেরকম কোন চিহ্ন যখন পাওয়া যায়নি তখন একথা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে পৃথিবীতে তারা খুব কম সময়ই ছিল। তারা — মানে কোন রহস্যময় জগতের সেই রহস্যময় মানুষেরা।

না! হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। যে কাজের ভার তিনি নিয়েছেন তা শেষ করতেই হবে। আগন্তুকদের চেহারা নির্ণয় করতে হবে। দাভিদভ নিশ্চয় তাঁর রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করে আছেন...

দাভিদভ! তাঁর কাজ কিরকম চলছে কে জানে? আসল ব্যাপারটা ছাড়া আর সবকিছুই তাঁকে দাভিদভ লিখেছেন। বুলেটের চিহ্নওয়ালা হাড়গুলো নিয়ে মস্কোয় তাঁদের সেই স্মরণীয় আলাপের পর দেড় বছর পার হয়ে গেছে। ঐ দশাসই লোকটিকেও নিশ্চয় অনেক ঝামেলা পোয়াতে হচ্ছে...

শাত্রভ যখন তাঁর সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, অধ্যাপক দাভিদভ তখন একটা ধুলোভরা রাস্তা দিয়ে গাড়ি চড়ে ছুটে চলেছেন। সাদা ধুলো

হেডলাইটের সামনে লাফিয়ে উঠে মেঘের মতো ভীড় করছে গাড়ির পিছনে, মুছে ফেলছে নিচু দিগন্তের তারাগুলোকে।

উইন্ড-শীল্ডের ভিতর দিয়ে দাভিদভ দেখতে পেলেন সামনে একটা লাল আলো ক্রমেই বড় হয়ে উঠছে। ইঞ্জিনের শব্দ ছাপিয়ে ক্রমে শোনা গেল কাজের নানা বিচিত্র আওয়াজ।

আধঘণ্টা পরে দাভিদভ নির্মাণকাজের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আর তাঁর বিদ্যালয়ের একটি জুনিয়ার সহকর্মীকে নিয়ে বিরাট কাজের প্রচণ্ড আয়তনে স্তম্ভিত হয়ে চলে গেলেন নির্মাণক্ষেত্রের একেবারে উত্তর কোণে।

লম্বা লম্বা খুঁটিতে বাঁধা জোরাল ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌ব্‌গুলোকে যেন কুয়াশায় ঘিরে রেখেছে। বাঁ দিকে ঘন ধুলোর পর্দা। যন্ত্রের প্রচণ্ড গর্জনে ট্রলির ছুটে চলা আর তাদের মাল নামানর শব্দ চাপা পড়ে গেছে।

খালের গভীর খাত ক্রিটাকিয়াস সঞ্চয়টা কেটে সোজা বেরিয়ে গেছে। তার দু'তীর সত্তর ফুট উঁচু। খাতটা অত্যন্ত মসৃণ যেন দানব ছুরি দিয়ে তা কাটা হয়েছে। তার বুকে দেখা যাচ্ছে নুড়ির স্তর, অজস্র বড় বড় পাথর। হলদে বালি আর নানা রকম উজ্জ্বল অভ্র আর জিপ্‌সাম সম্বলিত শিস্‌তোজ্‌ বালিপাথর।

চারপাশের স্তেপে যে অন্ধকার রাত্রির রাজত্ব এখানে তার অস্তিত্বও নেই। এ হল বিপুল ব্যাপক কর্মোদ্যোগের স্বতন্ত্র জগৎ, প্রাচীন কাজাখী মরুভূমির চেহারা যা সম্পূর্ণই বদলে দিয়েছে।

দাভিদভ এগিয়ে গেলেন রোদে পোড়া তামাটে লোকদের ঠেলেঠুলে। তারা তাঁর দিকে ফিরেও চাইল না। তাদের দক্ষ হাতে তখন বেরিয়ে পড়া শক্ত পাথরের গায়ে বসান অটোমেটিক পিকগুলো থরথর করে কাঁপছে। লোহার কঙ্কালের মতো দেখতে কতগুলো বিরাট বিরাট যন্ত্র ধুলোর ভিতর তাদের বিপুল বহর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মালচালাইয়ের যন্ত্রটা ক্রমাগত মাটি নামিয়ে চলেছে। তার কাছে ভীড় করে দাঁড়িয়েছে বড় বড় লরীগুলো।

'আমাদের পক্ষে বেশ চমৎকার বদল হল, ইলিয়া আন্দ্রেয়েভিচ!' দাভিদভের সহকর্মী চেঁচিয়ে বলল।

দাভিদভ স্মিত হেসে কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন এমন সময় হঠাৎ ধুলোয় ঢাকা আকাশে বিরাট ধনুকের আকারের একটা চাপা আলো দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে মাটিও কেঁপে উঠল।

'আরেকটা ব্লাস্ট,' সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বললেন, 'আরো ১,০০,০০০ কিউবিক ফুট বেরিয়ে পড়বে। আট নং নির্মাণক্ষেত্রে ওরা এক্সকাভেটরের জন্য নালা খুঁড়ছে।'

যে "নালা"টার ধার দিয়ে এগচ্ছিলেন দাভিদভ তার নিচে আরেকবার তাকালেন। দুসারি আলো নিয়ে নালাটা তীরের মতো চলে গেছে যতদূর চোখ যায়। আরো উত্তরে গিয়ে সেটা পড়েছে সিকি মাইল চওড়া একটা খাদে। ঐখানেই পাওয়া গেছে ডাইনোসরের সমাধি, জীবাশ্মের বিরাট স্তূপ। হাড়গুলো খাদের বুকে আড়ভাবে বিরাট ঢিবির মতো উঠে গেছে। বেশ বোঝা যায় আরো অনেক দূর পর্যন্ত তারা ছড়িয়ে আছে। বড় বড় কাঠের গুঁড়ির মতো হাড়গুলো যেমন তেমন ভাবে গাদা করা। পুরো ঢিবিটা কুড়ি ফুট উঁচু। হাড়ের মাঝে মাঝে বড় বড় নুড়িপাথর। পুরো কঙ্কাল কোথাও দেখা যাচ্ছে না, কেবল নানা জাতের লুপ্ত সরীসৃপের নানা মাপের ভাঙা হাড়। এক্সকাভেটরগুলো এই লক্ষ লক্ষ দানব জন্তুর কবরখানা খুঁড়ে খাদের বুকটা সাফ করে ফেলেছে। ভোরের আলোয় হাড়গুলোকে দেখাচ্ছে কালো, বিষণ্ণ।

অনেক উঁচুতে সূর্যটা প্রাণপণে জ্বলে উঠেছে। কালো হাড়গুলো এত গরম যেন ফার্নেসে পোরা হয়েছে।

'এখানে যা দেখবার তা তো দেখা হল,' রুমালে মুখ মুছে দাভিদভ বললেন, 'দু নম্বর নির্মাণক্ষেত্রের মতোই। হাড়ের আরেকটা ঢিবি। কুড়ি বছর আগে বজাবার উত্তরে চু নদীর দক্ষিণ তীরে এর চেয়েও একটা বড় ঢিবি আমি খুঁড়ে বের করেছিলাম — সেটা ছিল কুড়ি মাইল লম্বা। ইলি নদীর উপত্যকায় তাশ্‌খন্দের কাছে আর কারা-তাউয়েও এই জাতের বিরাট কবর আছে। সবকটাই একেবারে একরকমের। লক্ষ লক্ষ মিশ্রিত হাড়ের সমষ্টি। একটা পুরো কঙ্কাল বা খুলি কোথাও নেই। এসব হাড় গবেষকদের তেমন কাজে লাগবে না। এগুলো হচ্ছে ক্ষয়ে যাওয়া কবরের অবশিষ্ট। আসল কবরগুলোর আকার আমরা কল্পনাও করতে পারি না।'

'কবরগুলোর উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন নতুন আইডিয়া আপনার মনে এসেছে কি?' দাভিদভের সহকারী জিজ্ঞেস করল, 'আপনার লেখা যা প্রকাশিত হয়েছে তাতে আপনার বক্তব্য একটু...'

'অস্পষ্ট, তাই তো?' দাভিদভ মাঝখানেই বলে উঠলেন, 'শুধু অস্পষ্ট নয়, ভুলও। ঘটনাটার পুরো চেহারাটা আমি তখন বুঝতে পারিনি।'

'এখন আপনার কী মনে হয়?'

'কিছুই না!' দাভিদভ একটু কাটা কাটা ভাবেই জবাব দিলেন, 'চল, এবার এগতে হয়। তিন ঘণ্টার মধ্যে রওনা হলে সন্ধ্যার আগেই লুগোভায়ায় পেঁছব। মস্কোর ট্রেন ছাড়ে রাত একটায়।'

'আর আমি — আমি কি এখানেই থেকে যাব?'

'নিশ্চয়ই। সহকর্মীদের নিজে বেছে নেবেন। এই সব জঞ্জালের মধ্যে হয়ত হঠাৎ একটা কিছু পেয়ে যেতে পারেন। তাছাড়া অন্য কবরও পাওয়া যেতে পারে। অবশ্য নুড়ি আর নরম পাথর হলে সেই একই হাল হবে। এইখানে আমি বিশেষ কিছু আশা করি না। পাঁচ নম্বর নির্মাণক্ষেত্র অন্য ব্যাপার: বালি, কাঁকর আর বালিপাথর। নুড়ি খুবই কম, নেই বললেই চলে। স্তারোজিলভ অবশ্য ছমাস হয়ে গেল কোন খবরই পাঠাতে পারেনি। সবই বেফায়দা। খারাপ লাগে ...'

তিনটি তরুণ গবেষকছাত্রদের ঘরে বসে আছে। তাদের একজন ডেস্কের উপরে আসীন হয়ে ঘরের কোণে যে মেয়েটি বসে আছে, তার সঙ্গে কী নিয়ে যেন জোর আলোচনা জুড়েছে।

ঘন লাল চুলগুলো ভীষণভাবে টানতে টানতে সে বলে চলেছে, 'এখনকার জগৎদৃশ্য মানবজাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণের জন্য অনেক পরিমাণে দায়ী। আক্রমণকারী যারা তাদের হাতের পারমাণবিক শক্তি সভ্যতা আর সংস্কৃতির পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। আমাদের ভূবিদ্যা আর জীবাশ্মবিদ্যা মোটেই বিজ্ঞানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র নয়। সেই জন্যই মনে হচ্ছে, আমি যে পথ বেছে নিয়েছি, সেটা হয়ত ঠিক পথ নয়। অন্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হবার চেষ্টা করা উচিত ছিল। যেন সবকিছুর বাইরে এক ধারে পড়ে আছি। একথা মনে না হয়ে কিছুতেই পারে না। আমাদের দেশের পারমাণবিক শক্তি যারা

গড়ে তুলছে তাদের কাজে যোগ দেবার জন্য আমি সব কিছুই করতে পারি। সমাজতন্ত্রের দেশের পদার্থবিদ্যায় প্রচুর উন্নতি করাই চাই, তাই না, জেনিয়া?'

'ধর তাই না হয় হল,' মেয়েটি বলল, 'কিন্তু অঙ্কে যার মাথা নেই, সে কী করবে বল? যেমন, আমি। অঙ্ক আমার একটুও ভাল লাগে না—আমি কী করে পদার্থবিদ্যা নিয়ে কাজ করব বল?'

'ওটা কোন বাধাই নয়। পদার্থবিদ্যার কোন কোন ক্ষেত্রে, আমার তো মনে হয়, অঙ্কের প্রায় কোনই দরকার নেই ... মাথা নাড়ছ কেন?' আরেকটি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ছাত্রের দিকে তাকিয়ে ছেলেটি হেঁকে উঠল। অন্য ছাত্রটি এতক্ষণ নীরবে এদের কথা শুনে যাচ্ছিল।

'জীবাশ্মবিদ্যার পক্ষে তবু আরো অনেক কিছু বলার আছে!' জেনিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে উঠল। 'পদার্থবিদ্যার প্রয়োজন আরো বেশি, সেকথা ঠিক, কিন্তু জীবাশ্মবিদ্যাও প্রয়োজনীয়। জ্ঞান, তুমি তো জান...'

দরজাটা হঠাৎ দড়াম করে খুলে গেল। একটি পাৎলা ছিপছিপে মেয়ে দৌড়ে ঘরে ঢুকল।

'এই, অধ্যাপক এসে গেছেন!' মেয়েটি চেঁচিয়ে উঠল, 'অফিসে দেখলাম। শীগ্‌গিরি এখানে এসে যাবেন! কোথায় তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নেবে, তা না, বসে বসে খালি বকর বকর জুড়েছ!'

জেনিয়া দরজার দিকে ফিরে তাকাল। 'মিখাইল আর আমার মধ্যে একটা জোর আলোচনা চলছিল।'

'আমি সব জানি: জীবাশ্মবিদ্যা বাদ দিয়ে পারমাণবিক গবেষণায় নেমে পড়! তোমার এই বিরাট সিদ্ধান্তের জন্য সবাই অপেক্ষা করে বসে আছে। পারমাণবিক প্রতিভা তার সত্যিকার পথ খুঁজে পেয়েছে! বরং অধ্যাপকের সঙ্গে কথা বলে দেখ তিনি কী বলেন। শুনেছি ভদ্রলোক চটে গেলে চমৎকার কথা বলেন।'

'তামারা, তুমি ক্ষেপে গেছ,' মিখাইল অস্বস্তিতে চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি এখন ওঁর মতো হোমরা চোমরা লোকের কাছে গিয়ে বলি আর কি — "আপনার ঐ বিজ্ঞানে কিস্যু হবে না মশাই!" তারপর আমরা আবার ওঁর সহকারী!'

'ঠিক সেইটেই চাই!' একরোখা তামারা বলে উঠল, 'এসব আলোচনা

বন্ধ করার সময় অনেক দিন হয়ে গেছে। জেনিয়াকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে একেবারে বিরক্ত করে তুলেছ...'

দরজায় জোর টোকা। মিখাইল লাফিয়ে ডেস্ক থেকে নেমে পড়ল। জেনিয়া ঠিক করে নিল মাথার চুলগুলো। ঘরে ঢুকলেন দাভিদভ, হাসিখুসিতে উজ্জ্বল। আকর্ণ বিস্তৃত হাসি হেসে দাভিদভ সবাইকে অভ্যর্থনা জানালেন, তারপর দুচার কথায় বুঝিয়ে বললেন তাঁর মস্কো যাত্রার উদ্দেশ্যটা।

'এবার তোমরা বল, কী কাজ করছ। যদি কোন প্রশ্ন থাকে তাও জিজ্ঞেস করতে পার। তামারা নিকোলায়েভ্না, তুমিই বল।'

তামারা একটু অপ্রস্তুতে পড়ে হেসে বলল, 'আপনাকে প্রথমে একটা সাধারণ প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারি? মানে, আপনার যদি এক্ষুনি যাবার তাড়া না থাকে।'

'না, না, কিছু তাড়া নেই। জানই তো, তোমাদের প্রশ্নের জবাব দিতে আমি খুবই ভালবাসি।'

'মিখাইল... মানে, আমরা সবাই আলোচনা করছিলাম, যে কাজের ক্ষেত্র আমরা বেছে নিয়েছি, সেটা ঠিক হয়েছে কিনা। আজকের দিনে আমাদের ফসিল... মিখাইল বলে আমাদের এখন ফিজিক্স নিয়ে পড়া উচিত... সেদিন পেত্রভের এক বক্তৃতায় আমরা গিয়েছিলাম... তাঁর সব কথা বুঝতে পারিনি, কিন্তু খুবই কৌতূহলজনক!' এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে ফেলে তামারা যোগ করল, 'আপনি কী বলেন জানতে চাই। এ বিষয়ে আপনার কী উপদেশ?'

দাভিদভ গম্ভীর হয়ে গিয়ে ভুরু কুঁচকলেন। কিন্তু কোন রাগের চিহ্ন কোথাও দেখা গেল না, তামারা অন্য রকম আশা করেছিল।

ধীরে ধীরে সিগারেট কেসটা বের করে দাভিদভ বললেন, 'জানলাটা তো খোলা — তার মানে সিগারেট খাওয়া যেতে পারে... সমস্যাটা গুরুতর। তোমাদের বক্তব্য আমি বেশ বুঝতে পারছি। যে কোন টেকনিকাল বিপ্লব ঘটলে পর, বিজ্ঞানের যে শাখাগুলো তার প্রভাবের বাইরে পড়ে তাদের গুরুত্ব কমে যায়। তার ফলে তোমরা তরুণেরা পড় দুশ্চিন্তায়, যদিও আপন আপন ক্ষেত্রে তোমরা দক্ষতা অর্জন করেছ। আমারও সন্দেহ হত... কিন্তু একটা কথা শোন...'

সিগারেটটা ধরিয়ে অধ্যাপক চিন্তামগ্নভাবে ধোঁয়ার কুণ্ডুলীটার দিকে চেয়ে রইলেন।

তারপর সুরু করলেন, 'কোন কোন লোক বিজ্ঞানের কোন পথ তারা বেছে নিল তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। তারা পরিচালিত হয় আকস্মিক ঘটনা নয়ত স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা। প্রায়ই তারা নিজের নিজের ক্ষেত্রে বেশ সাফল্যও অর্জন করে। আমি কিন্তু এদের প্রকৃত বিজ্ঞানসাধক বলে মনে করি না। নিজের ইচ্ছা আর ক্ষমতা অনুসারেই বিজ্ঞানের পথ বেছে নেওয়া চাই। জ্ঞানের জন্য যখন তুমি তৃষিত হয়ে ওঠ, আকুল হয়ে ওঠ একটু নিঃশ্বাসের জন্য পাগল মানুষের মতো, তখনই তোমার পক্ষে বিজ্ঞানের নতুন পথ নির্দেশ সম্ভব হয়। তখনই কেবল নিজের কাজে তুমি তোমার মনপ্রাণ ঢেলে দিতে পার, বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পূর্ণ ডুবিয়ে দিতে পার নিজের ব্যক্তিত্বকে।

'আমায়ও প্রথম দিকে অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্ব পার হতে হয়েছে। প্রথমে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ি। ইঞ্জিনিয়ারিং আমি ভালও বাসি। কিন্তু আমার আসল কাজ হচ্ছে ইতিহাস। সেই কারণেই আমি আমাদের পৃথিবী আর প্রাণের আদিম ইতিহাসে আকৃষ্ট হই। ভালই হক আর মন্দই হক, এই নিয়েই আমার জীবন এখন তৃপ্ত। আমি পদার্থবিদ নই, আজকের দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজে আমার কোন অংশ নেই, সেটা দুঃখের কথা। কিন্তু তাহলেও আমি যে পথ বেছে নিয়েছি, তাতে আমার কোন ভুল হয়নি। কারণ আমার ক্ষমতা আর স্বার্থের সঙ্গে ঘটেছে তার সম্পূর্ণ সুষমা।

'তাছাড়া আমাদের কাজের প্রয়োজনকেও খাট করে দেখলে চলবে না। জ্ঞানের অন্যান্য শাখার চেয়ে এর ভবিষ্যৎ অনেক বৃহৎ। পরে, আরো পরে আমরা যখন আমাদের পুরো মনোনিবেশ মানুষের উপর নিবদ্ধ করতে পারব, তখন আমাদের এই শাখা খুবই প্রাধান্য পাবে। মানুষ হচ্ছে মাছ থেকে শ্রেষ্ঠ স্তন্যপায়ী জীবের ক্রমবিকাশের সুদীর্ঘকালে অভিব্যক্ত জটিল রূপ। অভিব্যক্তির প্রত্যেকটা ধাপের পরিচয় না পেলে মানুষের বায়োলজি আমরা বুঝতে পারব না। চিকিৎসার ভবিষ্যৎ, মানবজাতির রক্ষা নির্ভর করছে এই কাজের উপর। সেই সঙ্গে আরো অনেক সমস্যা। এই সব সমস্যা এখনো বহু দূরে, কিন্তু তবু তারা প্রতিদিনই এগিয়ে আসছে। তাই তাদের সমাধানের জন্য এখন থেকেই আমাদের সবকিছু ভাল করে জেনে প্রস্তুত হতে হবে।

'বিজ্ঞানের যে শাখা আমরা বেছে নিয়েছি, তাকে পরিত্যাগ না করার আরো একটা কারণ আছে! যে জাতি তার ভবিষ্যৎ নিয়ে ব্যস্ত, জ্ঞান ও সংস্কৃতির সর্বাঙ্গীন বিকাশ তার ঘটানই চাই। সেই সঙ্গে উদার, ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী। বিজ্ঞানের বিকাশ এমন সব নিয়মের বশবর্তী যা বর্তমান প্রয়োজনের সঙ্গে সবসময় মেলে না। বৈজ্ঞানিককে তার যুগের বিরোধী হলে চলবে না। তেমনি আবার নিজের কালের গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকাও তার পক্ষে অন্যায়। নিজের কালকে তার ছাড়িয়ে যাওয়া চাই, কারণ তা না হলে সে হয়ে উঠবে বৈজ্ঞানিক ব্যুরোক্রেট, অচলায়তনে আটকা পড়া স্বৈরাচারী। বর্তমানের কথা ছাড়া আর কিছু না ভাবলে তার বুদ্ধির ধার যাবে ক্ষয়ে; তেমনি আবার বর্তমানকে নিয়ে সে যদি একেবারেই মাথা না ঘামায়, তবে তাকে বলব নিছক স্বপ্নদ্রষ্টা। এমনকি মহামতি পিটারও তা ভাল করে জানতেন। ফসিল হাড় সংগ্রহ করার জন্য তাঁর আদেশের কথা ভেবে দেখ। সে আবার সেই কী ভীষণ দুঃসময়ের কালে, দেশ তখন কী দরিদ্র, সংস্কৃতির দিক দিয়ে কী ভীষণ পিছিয়ে পড়ে!'

সিগারেটটা নিবিয়ে দাভিদভ অন্যমনস্ক হয়ে মেঝের উপরেই ফেলে দিলেন। আর কেউ সেটা লক্ষ্যও করল না। জেনিয়া তখন টেবিলের উপর ভর দিয়ে স্থির দৃষ্টে দাভিদভের দিকে তাকিয়ে। তামারা দর্পিত ভঙ্গীতে মাথা তুলে খাড়া দাঁড়িয়ে। মিখাইলের মাথা নোয়ান।

'ব্যাপারটাকে এবার অন্য কোণ থেকে দেখা যাক,' অধ্যাপক বলে চললেন। 'পশ্চিমের অনেক বুদ্ধিজীবী এর মধ্যেই হার মেনে নিয়েছেন। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস পারমাণবিক শক্তি হচ্ছে সভ্যতার মৃত্যুবাণ। এর মধ্যেই তাঁদের সংস্কৃতি টেকনিকাল প্রগতির দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে পড়েছে। প্রকৃতির উপর মানুষের আধিপত্য ক্রমেই বেড়ে চলেছে, কিন্তু পশ্চিমের ওরা মানুষকে নতুন যুগের উপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত করতে ভুলে গেছে। ওদেশের মানুষের সামাজিক চেতনার মান তাই প্রায়শই তাদের বাপদাদাদের চেয়ে বেশি উন্নত নয়। তোমরা, সোভিয়েত তরুণতরুণীরা, সংস্কৃতির কর্মী হতে চাও, গড়ে তুলতে চাও মানবজাতির ভাবী সুখ। তোমাদের তবে স্বদেশের শক্তির প্রতি গভীর বিশ্বাস রাখতে হবে। যে পথ তোমরা গ্রহণ করেছো, তার প্রয়োজন সম্বন্ধে সব সন্দেহ মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। আমরা আমাদের

কাজে সংস্কৃতির জন্য সংগ্রাম করে চলেছি। যে বর্বররা পারমাণবিক যুদ্ধের চরম পন্থা নিয়ে প্রস্তুত তাদের হাত থেকে সংস্কৃতিকে রক্ষা করা সত্যিই মহৎ কাজ।

'পারমাণবিক শক্তি আজকের দিনে কী ভূমিকা নিয়েছে, তা তোমরা কি জান? বিরানব্বইটি মৌলিক পদার্থের অধিকাংশেরই রয়েছে অত্যন্ত স্থায়ী নিউক্লিয়াস। সেই নিউক্লিয়াসগুলো ভাঙতে যে শক্তির প্রয়োজন হয়, তা তাদের বিসরণের ফলে উৎপন্ন শক্তির চেয়ে বেশি। এটা কিছু খাপ-ছাড়া ব্যাপার নয়। আমাদের গ্রহের, সেই সঙ্গে অন্যান্য গ্রহেরও বিকাশ ঘটেছে অসংখ্য কোটি বছর ধরে। সেই বিকাশের কালে একধরনের নির্বাচনের প্রক্রিয়াও ঘটে গেছে — যাকিছু যথেষ্ট টেঁকসই নয়, তাই বিসরণের পর আরো টেঁকসই নতুন রূপ নিয়েছে। অস্থায়ী আইসোটোপরা — মেন্দেলেয়েভ টেবলের সুরুতেই যেসব মৌলিক পদার্থ রয়েছে, তার মধ্যে অক্সিজেনও পড়ে — আর বিশেষ করে লিথিয়ম, বেরিল্লিয়ম, বোরম আর কার্বন অনেক সহজেই তেজস্ক্রিয় রূপ উৎপন্ন করতে পারে। কিন্তু ঐ সব মৌলিক পদার্থ নিয়ে যে পারমাণবিক যন্ত্র কাজ করবে, তার পক্ষে প্রয়োজন বিরাট বস্তুপুঞ্জ, প্রচণ্ড তাপ আর চাপ। তা না হলে তার পক্ষে কাজ করা অসম্ভব। ঐ মৌলিক পদার্থগুলোই রয়েছে তারাদের এনার্জেটিক্স বা শক্তি ব্যবস্থার মূলে। এখনো পর্যন্ত তাদের আমরা কাজে লাগাতে পারিনি। আমার মতে তা করতে এখনো অনেক দিন বাকি, কারণ বিক্রিয়ামালা বা চেন্ রিএক্শনের জন্য প্রয়োজন বিশেষ একটা পরিমাণগত অবস্থার। মেন্দেলেয়েভ তালিকার শেষে যে মৌলিক পদার্থগুলো রয়েছে, পারমাণবিক ওজন তাদের সবচেয়ে বেশি। এই মৌলিক পদার্থগুলোর বিক্রিয়ামালাকে কাজে লাগান আমরা প্রায় সম্ভব করে তুলেছি। এটাও কিন্তু আকস্মিক নয়। সবচেয়ে ভারী মৌলিক পদার্থগুলোর নিউট্রনের সংখ্যা অনেক। সেই সঙ্গে তাদের ভাঙনও ঘটে সহজে। আর তার ফলে উৎপন্ন হয় নিউট্রনীয় বিক্রিয়া। এখন পর্যন্ত আমরা কেবল এই মৌলিক পদার্থগুলোর বিক্রিয়ামালাকেই টেকনিকাল প্রয়োজনে লাগাতে পেরেছি। কিন্তু এই ভাঙনও মোটেই সম্পূর্ণ নয়। ভারী মৌলিক পদার্থের পরমাণু শুধু ভেঙে দুভাগ হয়ে যায়। তার প্রতিটি ভাগ গড়ে তোলে মেন্দেলেয়েভ টেবলে নির্দিষ্ট স্থায়ী মাঝারি মৌলিক পদার্থগুলো। এই ঘটনার সঙ্গে

কিছুটা শক্তিও বেরিয়ে যায়। পূর্ণ ভাঙন আর স্থায়ী মৌলিক পদার্থের বিক্রিয়ামালা কিন্তু এখনো অনেক দূরের ব্যাপার।

'পারমাণবিক শক্তির উপর আমরা এখন পর্যন্ত যে আধিপত্য লাভ করেছি, তা সীমিত। এখন পর্যন্ত আমরা কেবল টেবলের সবশেষের, সবচেয়ে ভারী মৌলিক পদার্থ ইউরেনিয়মের ধর্মকেই আয়ত্তে আনতে পেরেছি — ইউরেনিয়মের ধর্ম হল দুটো অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা মৌলিক পদার্থে ভেঙে যাওয়া। তোমরা যে মনে কর যে কোন বস্তুর শক্তিই আমরা আয়ত্তে আনতে পেরেছি, তা ঠিক নয়। তালিকায় ইউরেনিয়মের স্থান হল স্বাভাবিক স্থায়ী মৌলিক পদার্থের শেষ প্রান্তে। ইউরেনিয়মের পারমাণবিক ওজন বাড়িয়ে দিয়ে যে কৃত্রিম পদার্থ তৈরী করা যায় তা তোমরা জান। যেমন নেপ্‌চুনিয়ম, প্লুটোনিয়ম, কৃত্রিম ৯৩ আর ৯৪তম মৌলিক পদার্থগুলি। ইউরেনিয়মকে ৯৫ আর ৯৬তম মৌলিক পদার্থ — আমেরিকিয়ম আর কিউরিয়মেও পরিবর্তিত করা যেতে পারে, এমনকি শততম বা আরোও বেশি মৌলিক পদার্থে।

'এই সব মৌলিক পদার্থ অস্থায়ী। এদের ভাঙন ঘটে সহজেই। ভেঙে যাওয়া প্লুটোনিয়মের শক্তিই হচ্ছে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ক্ষমতার উৎস। সেই সঙ্গে ইউরেনিয়মের অস্থায়ী রূপ, তথাকথিত ২৩৫ নং আইসোটোপের শক্তি। পদার্থের যখন পরিবর্তন ঘটছিল, সে সময় নিশ্চয় ইউরেনিয়মের চেয়ে ভারী অন্য মৌলিক পদার্থ ছিল। কিন্তু কালের গতির সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে তারা তালিকার প্রধান, স্থায়ী, মৌলিক পদার্থগুলোকে গড়ে তুলেছে। কাজেই ইউরেনিয়মকে আমরা সেই সব অতিগুরু মৌলিক পদার্থের অবশিষ্ট বলেই মনে করতে পারি। ইউরেনিয়মের পরিমাণ খুব অল্প, পাওয়া যায় ভূত্বকের উপরি ভাগে। সেখানে অপেক্ষাকৃত কম তাপ আর চাপের ফলে তা অপরিবর্তিত থেকে যায়। ইউরেনিয়ম আর হয়ত থোরিয়ম — ইউরেনিয়মের সঙ্গে তার খুবই মিল আছে — এখনো অনেক দিন পর্যন্ত পারমাণবিক শক্তির একমাত্র অবলম্বন হিসেবে কাজ করে চলবে। কারণ ইউরেনিয়মের বিসরণ ধর্মের প্রয়োগ আর অন্যান্য মৌলিক পদার্থের শক্তিপ্রয়োগের মাঝখানে যে বিরাট ফাঁক আছে তা পার হতে দীর্ঘকাল পেরিয়ে যাবে। ইউরেনিয়ম আর থোরিয়ম অত্যন্ত দুর্লভ। পৃথিবীতে কম

পরিমাণেই পাওয়া যায়। সেই জন্যই পারমাণবিক সম্পদের ভাণ্ডার এতই অকিঞ্চিৎকর ...'

'আপনার টেলিফোন, ইলিয়া আন্দ্রেয়েভিচ! দূরের কোন জায়গা থেকে এসেছে,' দরজার বাইরে থেকে কে যেন ডেকে বলল।

'এখুনি আসছি!' দাভিদভের মুখে হঠাৎ ভীষণ ভ্রূকুটি দেখা দিল, 'পারমাণবিক শক্তি সম্বন্ধে এইটুকুই কেবল বলবার ছিল... ইউরেনিয়ম পৃথিবীতে খুব অল্পই আছে, তার সঞ্চয় খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবার সম্ভাবনা। কাজেই ভবিষ্যতের কথা ভেবে আমাদের এই মহামূল্য সম্পদের বিরাট ভাণ্ডার খুঁজে বের করতে হবে। আর আমরা...'

দাভিদভ চুপ করে গিয়ে কপালের রগের কাছটা ঘষতে লাগলেন। উপরের দিকে চেয়ে মৃদু স্বরে বলে চললেন, 'ইউরেনিয়মের বিরাট সঞ্চয়... গ্রহের গঠনপর্বের অবশিষ্টাংশ। দূর ছাই মরুক গে, যাক যত জঞ্জাল!'

অধ্যাপক সজোরে ঢোঁক গিলে ঘর থেকে প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেলেন।

'ভদ্রলোকের হঠাৎ হল কী?' সবার হতভম্ব ভাবটা ভেঙে দিয়ে বলল তামারা, 'শেষকালটায় তো রীতিমত গালাগাল সুরু করলেন।'

'আরে দূর! দেখছ না, ঐ টেলিফোনটাই যত নষ্টের গোড়া,' জেনিয়া রেগে বলল, 'এমন চমৎকার আলোচনাটা দিল মাটি করে।'

'আমি বলছি, ওঁর কিছু একটা হয়েছে। বইয়ের আলমারীটার জন্য ওঁর মুখ তোমরা দেখতে পাওনি। নইলে দেখতে মুখটা কি রকম বদলে গিয়েছিল, যেন ভূত দেখেছেন।'

'ঠিক বলেছ, তামারা,' মিখাইলও সজোরে জানাল, 'নিশ্চয় ভদ্রলোকের মাথায় হঠাৎ কিছু একটা দেখা দিয়েছে।'

মিখাইলের আন্দাজটাই ঠিক প্রমাণ হল। দাভিদভ জোরে জোরে পা ফেলে করিডর দিয়ে এগিয়ে গেলেন। হঠাৎ মাথায় যে আইডিয়াটা এসেছে, সেটা নিয়েই তিনি তখন ভাবছেন। দুবছর আগের একটা ঘটনা তাঁর মনে পড়ল — মহাসমুদ্রের গভীর বুকের দিকে তিনি চেয়ে আছেন। মাথায় ঘুরছে ভূত্বকে যে বিরাট বিরাট আন্দোলন ঘটে তার শক্তির উৎস সম্বন্ধে একটা নতুন আইডিয়া — তখনো খুবই আবছা। তারপর তিনি এ ব্যাপার নিয়ে আরো অনেক ভেবেছেন, জোগাড় করেছেন নতুন নতুন তথ্য। ক্রমশ

হালের ঘটনা থেকে অতীতের পাহাড় সৃষ্টির প্রক্রিয়ার খবর নিয়েছেন। সময় আর জায়গা অনুসারে তারা অনেক বেশি বৃহৎ। এখন ভাগ্যই এনে দিয়েছে তাঁর অনুমানের সবচেয়ে বড় প্রমাণ!

দাভিদভ রিসিভারটা তুলে নিলেন। ওদিক থেকে কোন সাড়া নেই, কিন্তু দাভিদভ কানে রিসিভার চেপে দাঁড়িয়েই রইলেন। তাঁর মন তখন অনেক দূরে।

মধ্য এশিয়ায় ডাইনোসরদের সমাধি নিয়ে দাভিদভ গত কুড়ি বছর ধরে ভেবে চলেছেন। কিন্তু ধাঁধাটার কোন জবাব তিনি এখনো পাননি। তিয়েন-শানের পায়ের কাছে জমে আছে দানব সরীসৃপদের হাড়ের বিরাট বিরাট স্তূপ। নানা সময়ের লক্ষ লক্ষ নিদর্শন সেখানে পাওয়া যায়। প্রাচীন কালে সেগুলো আরো অনেক বড় ছিল। এখনকার এই সঞ্চয়গুলো হচ্ছে তাদের অবশিষ্টাংশ। টের্শারি পর্বে ক্রমান্বয়ে অনেক পাহাড় সৃষ্টি হওয়ায় সঞ্চয়গুলো ক্ষয়ে গেছে।

একটা বিশেষ জায়গায় সরীসৃপদের এরকম দলে দলে মৃত্যুর কারণ কী হতে পারে? মড়ক নয় নিশ্চয়ই! না, সময় আর জায়গার দিক দিয়ে ঘটনাটা মিলে যায় বিরাট পাহাড় সৃষ্টির যুগের সঙ্গে; যে সময়ে গড়ে ওঠে তিয়েন-শান, হিমালয়, ককেশাস আর আল্পস্ পর্বতমালা। ক্রিটাকিয়াস পর্বে, তার মানে সাত কোটি বছর আগে ঐ পাহাড়গুলো সার সার সমান্তরাল ভাঁজে ধীরে ধীরে উপরে ওঠে — প্রশান্ত মহাসাগরে এখন যা ঘটছে। দুটো প্রক্রিয়ায় কেবল একটা জায়গাতে অমিল। ক্রিটাকিয়াস পর্বের তিয়েন-শান ভাঁজগুলো দেখা দিয়েছে মহাসমুদ্রের বদলে মাটির বুকে, সাগর তীরে। সে সব জায়গায় তখন ছিল নানা রকম জীবজন্তুর বাস। তাছাড়া, ক্রিটাকিয়াস পর্বের ভাঁজগুলো গড়ে উঠেছিল এখনকার চেয়ে অনেক বৃহৎ আকারে। এখনকার মতো তখনো পাহাড়ের জন্ম ঘটেছে ইউরেনিয়ম — মানে সাধারণত অতিগুরু মৌলিক পদার্থের আকরিকের ভাঙনের ফলে।

এই অনুমান যদি সত্যি হয়, তবে একথা নির্ভয়ে মনে করা যেতে পারে যে পারমাণবিক বিক্রিয়ার শক্তি উদ্ভূত জোরাল বিকিরণ বিশেষ বিশেষ জায়গায় মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে। তার ফলেই ঘটেছে বিরাট জায়গা জুড়ে প্রাণের ধ্বংস। অন্য অঞ্চল থেকে আগত প্রাণীরাও তার হাত থেকে রক্ষা পায়নি।

বুদ্ধিহীন সরীসৃপরা এই অনিবার্য বিপদের কথা কিছুই জানতে পারেনি। এ ঘটনার পর ছোটখাট প্রাণীরা একেবারেই লোপ পেয়ে যায়। কিন্তু ডাইনোসরদের বিরাট বিরাট হাড়ের বিস্ময়কর বিপুল সঞ্চয় মাটির ভিতর সঞ্চিত থেকে যায়। না, এই ঘটনাচক্র মোটেই আকস্মিক নয়।

"অন্য ঘটনাচক্রটাও তো তবে আকস্মিক না হতেও পারে? ঐ একই জায়গায় তারা-বাসীদের চিহ্ন কেন পাওয়া গেল?

"যে জোরাল বিকিরণের ফলে ডাইনোসরদের মৃত্যু ঘটেছে, বিশেষ ধরনের যন্ত্র দিয়ে তাকে নিশ্চয়ই ধরা যেতে পারে। ঘটনাটা ঘটেছিল তারা-বাসীরা এ গ্রহে আসার হাজার হাজার বছর আগে। তারা যখন ঐ অঞ্চলেই ঘুরছিল, তখন নিশ্চয়ই পারমাণবিক শক্তির উৎস সন্ধানেই তারা এসেছিল। তাই যদি হয় তবে — যাক গে, মরুক গে! পৃথিবীর সবচেয়ে নতুন পর্বতমালা তিয়েন-শান আর হিমালয়ের ধারেই আমাদের চিহ্ন খুঁজতে হবে। তার মানে যেখানে খুঁজছি, সেখানেই! দ্বিতীয় অনুমানটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ: ইউরেনিয়ম আর ভূত্বকের অন্যান্য অতিগুরু মৌলিক পদার্থ একেক সময়ে গাঢ় হয়ে ওঠে বলেই যদি পাহাড়ের সৃষ্টি আর অগ্ন্যুৎপাত ঘটে থাকে তবে বিশেষ বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলে ঐ জাতীয় গাঢ় মৌলিক পদার্থের অবশিষ্টাংশ আমরা পেতে পারি। মাটির যত ভিতরে ঢোকা সম্ভব পেতে পারি সেখানেই। এখন প্রয়োজন পাহাড় সৃষ্টি হয়েছে এরকম এক বা একাধিক অঞ্চলে তারা-বাসীদের চিহ্ন, তবেই স্থির নিশ্চিত হতে পারব..."

'কথা বলুন,' রিসিভারের ওদিক থেকে হঠাৎ শোনা গেল, 'আল্মা-আতার সঙ্গে।'

দাভিদভ চমকে উঠে চিন্তাস্রোতের মুখ বন্ধ করে দিলেন — আল্মা-আতা থেকে হয়ত কোন গুরুত্বপূর্ণ খবর পাওয়া যেতে পারে!

দূর থেকে একটা পরিষ্কার গলা ভেসে এল। ভূবিদ্যা ইন্স্টিটিউটের বৈজ্ঞানিক সেক্রেটারীর গলা।

'ইলিয়া আন্দ্রেয়েভিচ! পাঁচ নং নির্মাণক্ষেত্র থেকে স্তারোজিলভ ফোন করেছিল। ডাইনোসরের কঙ্কাল পাওয়া গেছে, কিন্তু তাতে কোন ক্ষতের চিহ্ন আছে কিনা তা ঠিক বুঝতে পারলাম না। স্তারোজিলভ আপনাকে খবরটা

জানাতে বলল। ও বলছে, আপনার এখানে আসা খুবই দরকার। ওকে কী বলব, বলুন?'

'বল, কালকেই আমি এরোপ্লেনে রওনা হচ্ছি!' দাভিদভ তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন।

'আপনার সঙ্গে আরো দুয়েকটা কথা আছে,' সেক্রেটারী বলে উঠল, 'কিন্তু সে কালকে হবে এখন। ঠিক আছে, আপনার জন্য তবে অপেক্ষা করে থাকব।'

'অনেক ধন্যবাদ!' দাভিদভ সানন্দে গর্জে উঠলেন, 'সবাইকে আমার নমস্কার জানিও। কাল দেখা হবে।'

ইন্‌স্টিটিউটের কার্য ব্যবস্থাপককে পরদিনের প্লেনে সীট বুক করতে বলে দাভিদভ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন কল্‌ৎসভের সন্ধানে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বুদ্ধির দৃষ্টি

রাস্তাটা একটা সরু নদীর পাড় ঘেঁষে ঘুরে ঘুরে উপরে উঠে গেছে। গিরিসংকটের বিরাট উঁচু দেওয়াল নেমেছে খাড়া নিচে। সামনে তাকালে নদীটা আর দেখা যায় না। কেবল মনে হয় ঢালু দেওয়ালগুলো যেন একটার উপর দিয়ে আরেকটা চলে গেছে।

বাঁদিকের সবচেয়ে কাছের ঢালটি বিষণ্ণ কালো ছায়ায় ঢাকা। পাহাড়টার খাঁজকাটা পাড় ধরে এক সার ফারগাছ দাঁড়িয়ে, ডালপালাগুলো ফুটে উঠেছে অতি স্পষ্ট রেখায়। দূরের ঢালগুলো ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে গেছে। আরও পিছনের সাদা কুয়াশায় ঢাকা ঢালুগুলো এক স্বর্গীয় দৃশ্য গড়ে তুলেছে। বহুদূরে বরফঢাকা একটা উঁচু চূড়া ক্রমে বিরাট পাহাড়ে পরিণত হয়ে আরও সুদূরে চলে গেছে। পাহাড়টার ধূসর পাথুরে বুকে চমক তুলেছে খসে পড়া বরফের মালা। আরও উঁচুতে জমাট বাঁধা, শুভ্র পবিত্র বরফে তার খাঁজকাটা প্রান্ত সমান রেখায় ঢাকা। ঘন মেঘ অলস মন্থর গতিতে ভেসে চলেছে, যেন বিরাট একটা বজরা দুই পাহাড়ের মাঝের বরফ সমুদ্র দিয়ে কোন রকমে নিজেকে টেনে নিয়ে চলেছে।

খাড়া পাহাড় বেড়ে পথটা গিরিপথের দিকে উঠতে সুরু করল। ইঞ্জিনের গর্জন ক্রমে আরও বেড়ে উঠল। ঠাণ্ডা, পরিষ্কার হাওয়া ছুটে এল গাড়ীটাকে অভ্যর্থনা করতে, আধখোলা জানলা দিয়ে নদীর স্রোতের মতো হুহু করে ঢুকে পড়ল ভিতরে।

মোটরের স্পন্দন যখন স্বাভাবিক হয়ে এল দাভিদভ বুঝলেন তাঁরা গিরিপথে পেঁাছে গেছেন। গাড়ীটা জোরে নেমে গেল উপত্যকার দিকে। উপত্যকাটা বেশ চওড়া আর সমান, চারিদিক তিন প্রস্থ পাহাড়ের সারে ঘেরা।

উপত্যকার বুকে দাঁড়িয়ে দাভিদভ দেখলেন সুদীর্ঘ খাঁজকাটা বালিপাথর আর মাটির আস্তর, কোথাও কুণ্ডিত হয়ে অতি বিরাট মাথা সরু মিনার আর গোল গম্বুজের আকার নিয়েছে। দ্বিতীয় সারিটা সেজেছে পাহাড়ে ফারের চকচকে ডোরা-কাটা আবরণে, বেগুনি-ধূসর ঢালের প্রচ্ছদপটে তাকে দেখাচ্ছে মিশ কালো। আর আকাশের বুকে বিজয়গর্বে উঁকি দিচ্ছে বরফঢাকা খাঁজকাটা চূড়ার সার — যেন একটা বিরাট দুর্গের প্রাচীর উপত্যকাটাকে সাবধানে আড়াল করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

একটা চওড়া খাত দাভিদভের চোখে পড়ল, উপত্যকাটাকে দু'ভাগে চিরে চলে গেছে। দেখতে পেলেন একটা বিরাট বাঁধের প্রাচীর, মাটির মস্ত দেওয়াল, গভীর গহ্বর, মজুরদের সাদা তাঁবুর দীর্ঘ সারি।

বিরাট বিরাট নির্মাণ ক্ষেত্র দেখে দাভিদভ অভ্যস্ত, কিন্তু তবু লেসের মতো কংক্রীটের গাঁথনি দেখে তিনি উৎসাহিত না হয়ে পারলেন না। ঠিক, প্রধান হাইড্রোপাওয়ার স্টেশনটি ওখানেই হবে। ওরই একটা গহ্বরে ডাইনোসরের কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছিল। তাদের সমাধি যখন হয় তখন চারপাশে এই সব পাহাড় অবশ্য ছিল না। এরা দেখা দিয়েছে আরো পরে। ভূপৃষ্ঠের গভীরে কোন পারমাণবিক বিক্রিয়ার শক্তি এদের ঠেলে তুলে দিয়েছে। হয়ত এই অগ্ন্যুৎপাত দেখে পারমাণবিক শক্তির উৎস সন্ধানী নক্ষত্রবাসীরাও আকৃষ্ট হয়েছিল।

একটা লম্বা চুনকাম করা বাড়ীর সামনে এসে গাড়ীটা থামল।

'এসে গেছি, কমরেড দাভিদভ,' দরজাটা হাট করে খুলে ড্রাইভার বলল।

'ঘুম পাচ্ছে নাকি? তা পথটা তো বেশ ভালই ছিল, ইচ্ছে করলে সারাটা পথই ঘুমতে পারতেন।'

দাভিদভ তাঁর চিন্তাজাল ছিঁড়ে তাড়াতাড়ি নেমে এলেন স্তারোজিলভের সঙ্গে দেখা করতে। স্তারোজিলভ দ্রুত পায়ে তাঁর দিকে এগিয়ে এল। তার চোখ পর্যন্ত চুলে ঢাকা। হলদে ধুলোয় ওভারঅলটা ভরে গেছে। আসমানী রঙের চোখদুটোয় আনন্দের চমক।

'চীফ! (স্তারোজিলভ যখন ছাত্র ছিল তখন বহুবার অধ্যাপক দাভিদভের সঙ্গে অভিযানে গেছে। সেই অবধি দাভিদভকে সে জেদ করেই "চীফ" বলে ডাকে। ঐ ডাকের মধ্যে দিয়ে আজও যেন সে সহযাত্রীর বিশেষ সুযোগসুবিধাটুকুর দাবী জানায়।) আপনার জন্য একটা মস্ত খবর আছে! দীর্ঘ প্রতীক্ষা এবার সার্থক হয়েছে। বিশ্রাম করে কিছু মুখে দিয়ে নিন তারপর আপনাকে নিয়ে যাব। সবচেয়ে দক্ষিণের গহ্বরটি, এখান থেকে আধ মাইলেরও কম পথ !'

'কে বললে আমি ক্লান্ত?' দাভিদভ তাকে থামিয়ে দিয়ে বলে উঠলেন, 'চল, নিয়ে চল।'

স্তারোজিলভের হাসি তার মুখ ছাপিয়ে যেন মাথা বেড়ে ছড়িয়ে পড়ল। 'এই তো চাই, চীফ!'

ড্রাইভারের অসন্তুষ্ট চাহনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে স্তারোজিলভ জোর করে কোন রকমে গাড়ীতে উঠে বসল। তার নোংরা ওভারঅলের অবস্থা দেখে ড্রাইভার বিরক্ত।

'দক্ষিণ থেকে বেরিয়ে থাকা কঠিন ইয়েলিনের একটা বিরাট আস্তর ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ডাইনোসরদের অবশিষ্টাংশ খুঁজে পেলাম,' স্তারোজিলভ তাড়াতাড়ি বলে চলেছে, 'প্রথমত কয়েকটা আলাদা আলাদা হাড়গোড় পাওয়া গেল। তারপর আরো খোঁড়ার পর কঙ্কালটা। শিংওয়ালা, নিরামিষাশী ডাইনোসরটা হচ্ছে মোনক্লোন। খুলিটা ছাড়া বাকি অংশটা এক্কেবারে ঠিক আছে। খুলিটাতে রয়েছে গর্ত। একটা ছোট ডিমের আকারের গর্ত সোজা হাড়ের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে। গর্তটার কারণ কিছু বলতে পারেন?'

দাভিদভের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। কোনরকমে বললেন:

'আর কিছু আছে?'

'বহু দিন পর্যন্ত আর কিছু পাইনি। পরশু হঠাৎ গহ্বরটার মুখের কাছে স্তূপ করা হাড়গুলো পাওয়া গেছে। কিন্তু আলাদা আলাদা হাড় নয় আবার কঙ্কাল। অদ্ভুত ব্যাপার হল নিরামিষাশী, আমিষাশী জাতেরই কঙ্কাল। কারনোসোরের পিছনের থাবা আর সেরাটোপোসের খুর খুঁজে পাওয়া গেছে। কতগুলো হাড় ভাঙ্গা, যেন একটা প্রচণ্ড শক্তি সেগুলোকে আঘাত করেছে। আপনাকে বাদ দিয়ে আর বেশি দূর খোঁড়াখুঁড়ি করতে সাহস হয়নি। ডাইনে চলুক। নিচে রাস্তা পাবে,' স্তারোজিলভ ড্রাইভারকে বলল, 'এবার বাঁয়ে।'

কয়েক মিনিট পর দাভিদভ একটা বিরাট কঙ্কালের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। বালির উপর হাড়গুলো জ্বলজ্বল করছে। সাবধানে পরিষ্কার করে, ভাল ভাবে রাখার জন্য স্তারোজিলভ সেগুলোতে বার্ণিশ লাগিয়েছে।

মেলে রাখা লেজ আর কুঁকড়ে গুটিয়ে থাকা থাবার পাশ দিয়ে হেঁটে গিয়ে দাভিদভ হাঁটু গেড়ে কুৎসিৎ কঙ্কালটার খুলির পাশে বসে পড়লেন, মুখটার ডগায় একটা ছোট তলোয়ারের মতো শিং।

চোখের জায়গায় সুরক্ষিত হাড়ের চক্র, এককালে তা মুখটাকে ভয়ঙ্কর করে তুলেছিল কিন্তু আজ চিরদিনের মতো প্রস্তরীভূত।

কিছুক্ষণের মধ্যে দাভিদভ দেখলেন বাঁ চোখের তলায় একটা ডিমের আকারের গর্ত, সিকিয়াঙে তাও লি যেমনটি দেখেছিল। মিসাইলটা খুলির ঠিক ভিতর দিয়ে চলে গিয়ে যেখান দিয়ে বেরিয়েছে সেখানেও একটা গর্ত হয়েছে। গর্তটা রয়েছে এখনও মাটির নিচে পোঁতা ডান চোখের কোটরের ঠিক পিছনে।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তারা-মানুষরা এখানেই থাকত। সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে এদের চিহ্ন খোঁজার চেষ্টাটা তবে ঠিকই হয়েছিল। আর কী চিহ্ন খুঁড়ে বের করবে? অন্য কোন চিহ্ন কি আর আছে?

খোঁড়া কবরখানার প্রান্ত আর গহ্বরের দেওয়ালটা দাভিদভ পরীক্ষা করলেন। চোখের সামনে পড়ে থাকা একটি হাড়েও ক্ষতের কোন চিহ্ন নেই। দেখা গেল হাড়গুলো ভেঙে গেছে ঐ প্রাণীদের মৃত্যুর পর, যখন ধীরে ধীরে মাটি জমে আর পর পর আস্তর পড়ে জন্তুটা সমাধিস্থ হতে সুরু করেছে তখন।

দাভিদভ স্তূপীকৃত হাড়ের উপর থেকে মাটি সরিয়ে ফেলার হুকুম দিলেন। সম্পূর্ণ এলাকা জুড়ে একই সঙ্গে হাড়গুলোর উপর থেকে সাবধানে স্তর সরিয়ে ফেলতে হবে। হিসাব করে দাভিদভ দেখলেন ২,০০,০০০ কিউবিক ফিট মাটি সরান দরকার।

'ভয় হচ্ছে, কাজটা বোধহয় খুবই কঠিন।' দাভিদভ সন্দিগ্ধ ভাবে বললেন।

'আপনি ব্যস্ত হবেন না।' স্তারোজিলভ আশ্বাসের হাসি হেসে বলল, 'মজুরের দল তাদের ভাষায় শিংওয়ালা কুমীর খুঁড়ে বের করে এতই মজা পেয়েছে যে হলপ করে জানিয়েছে, কাজটা তারা শেষ করবেই। সার্জনের মতোই সাবধানে তারা হাড়গোড়গুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করবে। সেদিন আমাদের সভায় কাজটার গুরুত্বের কথা ওদের বুঝিয়ে বলেছিলাম। মজুরদের সর্দার তা শুনে যা বলল তাই হুবহু আপনাকে শোনালাম। পরশু রবিবার। ন শ' লোক স্বেচ্ছায় ডাইনোসর ওঠানর কাজে কাল যোগ দেবে বলেছে।'

'ন শ'? সাংঘাতিক!' অধ্যাপক বললেন।

'অফিস থেকে জানিয়েছে চোদ্দটা এক্সকাভেটর, ট্র্যান্স্পোর্টার, লরী প্রভৃতি যা কিছু দরকার সবই আমাদের দেওয়া হবে,' স্তারোজিলভ বলল, 'রবিবার আমরা যে খোঁড়ার কাজ সুরু করব, জীবাশ্মবিদ্যায় তা আর কখনো কেউ দেখেনি।'

দাভিদভ উল্লাসে চীৎকার করে বললেন, 'শ্রমিকরা এবার বিজ্ঞানের সাহায্যে তাদের বলিষ্ঠ নিঃস্বার্থ হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।' সন্ধানের সাফল্য সম্পর্কে তিনি এখন সম্পূর্ণ আস্থাবান। ধাঁধার উত্তরটা যে হাজার হাজার ঘন মাটির আস্তরের নিচে গোপন রয়েছে সেটা আর তাঁর কাছে বিরাট বাধা বলে মনে হল না। সমস্ত সন্দেহ, দ্বিধা, বাধা ভুলে নিজেকে তাঁর সর্বশক্তিমান মনে হল। শ্রমিকদের সহায়তায় তিনি বালির কবল থেকে নক্ষত্রবাসীদের সাত কোটি বছরের গোপন তথ্য উদ্ঘাটিত করবেন। ব্যর্থতার চিন্তা তাঁর মাথায়ও এল না। সে কথা ভাবাও যায় না। বিশেষ করে মানুষের অস্ত্রে মারা পড়া ডাইনোসরের কঙ্কাল যখন পাওয়া গেছে!

'চীফ, কোথায় খুঁড়তে হবে দেখিয়ে দিন?' স্তারোজিলভের

গলা দাভিদভের কানে গেল, 'মনে রাখবেন ইয়েলিন বালির আস্তরটা তেরছা ভাবে উত্তর-পশ্চিম থেকে দক্ষিণ-পূবে চলে গেছে। বাঁদিকে নদীর বালির ঠেকা দেওয়া আছে।'

দাভিদভ গহ্বরটার ভিতর থেকে গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে এসে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন পাহাড়ের পা পর্যন্ত চলে যাওয়া স্তেপের দিকে। তার গায়ে এখনো মানুষের হাত পড়েনি।

'ধর, যদি ঐ গর্তটা থেকে ডান দিকে চৌকো করে খুঁড়ে আবার এখানে ফিরে আসি?'

'কিন্তু তাহলে বাঁদিকের কোণটা চলে যাবে নদীর বালি পর্যন্ত।' স্তারোজিলভ উত্তর দিল।

'চমৎকার। ঠিক এটাই আমি চাইছিলাম। আমরা একটা প্রাচীন নদীর পাড় ধরে খুঁড়ে চলব, একদিন তাতে জল ছিল... চল হে, এবার চৌকোটা মেপে গোঁজ দিয়ে চিহ্ন করে দিই। তোমার টেপলাইন কোথায়?'

'টেপলাইন না থাকলে কিছু এসে যাবে না, চীফ। ফুট দিয়েই কাজ চালিয়ে নেব। পরে জরীপ করলেই হবে। এত মজুর যখন আছে তখন আর কৃপণতা কেন।'

'ঠিক আছে,' উৎসাহী সহকর্মীর দিকে তাকিয়ে দাভিদভ হেসে বললেন, 'চল তবে, সোজা ঐ ছোট পাহাড়টায় যাওয়া যাক। অধ্যাপক শাত্রভকে একটা টেলিগ্রাম করতে হবে।'

বারদিন আগে ওয়ার্মউডে ঢাকা যে বন্ধুর স্তেপটায় দাভিদভ আর স্তারোজিলভ মাপজোঁক করেছিলেন আজ সেখানে তিরিশ ফুট গভীর গর্ত খোঁড়া হয়ে গেছে। মসৃণ জমাট বাঁধা শুকনো চুন বালিতে ঘূর্ণি বাতাস ধুলোর স্তম্ভকে ছুটিয়ে নিয়ে চলেছে। খোঁড়া জমিটার পূব পাড়ে হলদে থেকে ইস্পাত-ধূসর পর্যন্ত নানা রঙের খেলা। স্তারোজিলভ তার সহকারীদের কাজ পর্যবেক্ষণ করতে করতে সমানে এদিক ওদিক হেঁটে বেড়াচ্ছে। সহকারীরা মাটি খুঁড়ছে, বালি সরিয়ে কঙ্কালটাকে চেঁছে পরিষ্কার করছে। মস্কোতে তাঁর ইনস্টিটিউট থেকে সমস্ত ল্যাবরেটরীর কর্মীদের সবাইকে দাভিদভ আনিয়েছেন। তাছাড়া চারজন স্নাতকোত্তর ছাত্র। তার উপর ২ নং

নির্মাণকার্যের জীবাশ্মবিদও আছেন। তিরিশ জন মজুর আর দশ জন বৈজ্ঞানিক ওভারসিয়র কঙ্কাল সম্বলিত বালির স্তর খুঁড়ে চলেছে। ধীরে ধীরে পৌঁছচ্ছে ধূসর বালির আস্তরে, যেখানে রয়েছে কেবল হাড়ের টুকরো আর প্রস্তরীভূত সরলবর্গীয় গাছের গুঁড়ি।

জ্বলন্ত বালির উপর সূর্য আগুন ঢেলে চলেছে। কিন্তু সকলে এতই কাজে মত্ত যে সেদিকে কারো কোন নজর নেই।

দাভিদভ খোঁড়া অংশটিতে নামলেন। দু সপ্তাহ আগে কন্‌স্ট্রাকশন গর্তে পাওয়া বিরাট হাড়ের স্তূপটার কাছে থেমে গেলেন। স্তূপটার মধ্যে ছটা ডাইনোসরের কঙ্কাল মেশান রয়েছে। সেখান থেকে দু'শ ফিট দূরে একটা বিরাট মাংসাশী ডাইনোসরের কঙ্কাল পাওয়া গেছে। মুখটা হাঁ করে খোলা, ভয়ংকর দাঁত। যেখান থেকে নদীর বালি সুরু হয়েছে সেই জায়গাটায় একলা পড়েছিল। তার কাছেই পাওয়া গেছে তিনটে হিংস্র সরীসৃপ, ধেড়ে কুকুরের চেয়ে বড় হবে না।

খোঁড়া মাটির যে কোণটি এখনও পরীক্ষা করা হয়নি দাভিদভের ব্যগ্রদৃষ্টি সেদিকেই নিবদ্ধ — ঐটেই তাঁর শেষ আশা।

'ইলিয়া আন্দ্রেয়েভিচ! একবার এখানে আসুন!' জেনিয়া জোরে ডাকল, 'আমরা একটা কচ্ছপ পেয়েছি।'

দাভিদভ ঘুরে আস্তে আস্তে জেনিয়ার দিকে এগিয়ে চললেন। মিখাইলের সঙ্গে সঙ্গে এই মেয়েটিও গত দুদিন ধরে মাংসাশী ডাইনোসরের প্রকাণ্ড মাথাটা নিয়ে কাজ করে চলেছে।

দাভিদভকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য জেনিয়া গর্তটা ছেড়ে বেরিয়ে এল। পাদুটো তার অসাড় হয়ে গেছে। কিন্তু ফূর্তির হাসিতে তার মুখখানি ভরা। কষ্টের কোন অভিব্যক্তিই তাতে নেই। মুখখানা ঘিরে সাদা রুমাল বাঁধায় তার জ্বলজ্বলে মুখের রোদে পোড়া ভাবটা আরও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'ঐখানে একটা কচ্ছপ রয়েছে।' ডাইনোসরটার খুলি ঘিরে যে মাটি রয়েছে ছুরি দিয়ে সেটা দেখিয়ে জেনিয়া বলল, 'খুলিটার নিচে। নেমে আসুন, তবে নিজেই দেখতে পাবেন।' জেনিয়া হালকা পায়ে লাফিয়ে গর্তে নামল। 'ওপরের খোলস থেকে মাটি চেঁছে সরিয়ে দিয়েছি।' জেনিয়া বলে

চলল, 'কচ্ছপটা অদ্ভুত জাতের, গায়ে ঝিনুকের মতো চমক, চেহারাটাও অসাধারণ।'

সরু, ঠাসা জায়গাটায় দাভিদভ তাঁর বিরাট বপুখানা নুইয়ে ডাইনোসরের খুলির নিচটা দেখতে চেষ্টা করলেন। একটা ছোট ডোম, ব্যাস তার হবে কুড়ি সেণ্টিমিটার, কালো স্যাঁতসেঁতে বালি থেকে উঁকি মারছে। গা তার ছোট ছোট গর্ত আর ফাটলে ভরা, তার ফলে দাভিদভ স্পষ্ট দেখতে পেলেন ডোমটার পিঠে অরীয় রেখার নক্সা সৃষ্টি হয়েছে। হাড়ের রং গাঢ় বেগুনি, প্রায় কালো-ডাইনোসরের সাদা খুলিটার পাশে রংটা আরও অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে। ঝিনুকের মতো চমকটাও সাধারণত চোখে পড়ে না। অদ্ভুত হাড়টা এত মসৃণ যে মনে হয় কেউ যেন পালিশ করে রেখেছে। গর্তটার গভীরে কালো রহস্যপূর্ণ আলো ছড়িয়ে চকচক করছে।

দাভিদভের চোখের সামনে সব কিছু আবছা হয়ে নেচে বেড়াতে থাকল। জোরে নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে দাভিদভ অতি সাবধানে বালি সরিয়ে আঙুলের ডগা দিয়ে হাড়টা ছুঁলেন। আলাদা আলাদা হাড়ের পাত জোড়ের একটি মুখ আর ডোমের উপর দিয়ে আড়াআড়ি যাওয়া আরেকটি জোড়ে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ।

'স্তারোজিলভকে এখুনি ডাক!' হাঁপাতে হাঁপাতে মুখ তুলে দাভিদভ বললেন। রক্তের ঝলকে তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠেছে। 'মজুরদেরও।'

দাভিদভের উত্তেজনা সংক্রামক। জেনিয়ার ডাক ডাইনোসরটার কবরের উপর প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল।

দাভিদভের মুগ্ধ দৃষ্টি রহস্যজনক বস্তুটার উপর নিবদ্ধ। স্তারোজিলভও তার উপর ঝুঁকে পড়ল।

আলতো করে, ধীরে ধীরে, অসীম ধৈর্যসহকারে দাভিদভ আর তাঁর সহকারী গাঢ় বেগুনি ডোমটার চারপাশ থেকে বালি সরাতে সুরু করলেন। বালি সরিয়ে দেখা গেল জিনিসটা পাশে বাড়েনি। দেওয়ালটা খাড়া উঠে অসমান আর কিছু চেপটা গোলার্ধের আকার ধারণ করেছে। দাভিদভ দেখলেন তাঁর প্রিপেরেশন নিডলের ফলাটা হঠাৎ নরম বালির মধ্যে বসে গেল। হাড়টা তার মানে আর বেশি দূর যায়নি। দাভিদভ সাবধানে ছুরিটা এক মুহূর্ত ধরে রইলেন — তারপর ভাবলেন যা হয় হোক, ঝুঁকি নিতেই

হবে। ছুরিটা দু'চার বার ঘুরিয়ে হাড়ের তলার মাটিটা আলগা করে ফেললেন। একটা নরম বুরুশ দিয়ে সাবধানে বালি সরিয়ে দেখলেন হাড়ের তলার দিকটা গোল, আর ঠেলে বেরিয়ে আছে। সেই গোলের উপর দুটো চওড়া চক্র কেটে বসান।

দাভিদভের বন্দুকের নলের মতো বুক থেকে একটা প্রচণ্ড চীৎকার বেরিয়ে এল। সে চীৎকারে চারপাশের সকলের রক্ত হিম হয়ে গেল।

'খুলি, খুলি, একটা খুলি পাওয়া গেছে!' দাভিদভ প্রাণপণে ছুরি দিয়ে খুঁড়তে খুঁড়তে চীৎকার করতে লাগলেন।

সত্যিই, এবার বালি সরাতে দেখা গেল দুটো চোখের কোটর আর উঁচু কপাল। সবার কাছেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেল। ডোমটা আর কিছুই নয় একটা খুলির উপরের অংশ। মানুষের খুলির সঙ্গে খুবই সাদৃশ্য রয়েছে, কিন্তু সাধারণ মাথার চেয়ে আকারে বড়।

'শেষ পর্যন্ত পেলে যা হোক, স্বর্গের জীব না মানুষ, কে জানে!' দাভিদভ উঠে দাঁড়িয়ে রগে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন। কথার সুরে খুশীর ভাব স্পষ্ট।

দাভিদভের মাথাটা হঠাৎ ঘুরে উঠল। গর্তের দেওয়ালের গায়ে টলে পড়লেন। স্তারোজিলভ তাড়াতাড়ি তাঁর কনুইটা ধরতে নিজেকে ছাড়িয়ে নিলেন।

'এবার যাও, একটা বড় বাক্স, প্রচুর তুলো আর গঁদ নিয়ে এস। যত তাড়াতাড়ি পার খুলিটা খুঁড়ে বের কর। মনে হচ্ছে খুলিটা বেশ শক্ত। কিন্তু সাবধানে কাজ করো, খুলিটার তলে কঙ্কালটার বাকি অংশটুকুও পাওয়া উচিত। মজুরদের বল যেন একটার পর একটা বালির আস্তর সাবধানে সরায়। দেরী না করে ডাইনোসরটাকে তুলে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও। এই এলাকার প্রতি ইঞ্চি মাটি দেখে সমস্ত বালি চেলে ফেল।'

শাত্রভ হুড়মুড় করে ইনস্টিটিউটের লম্বা করিডর বেয়ে যাচ্ছিলেন, সহকর্মীদের সম্ভাষণ সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে। অবশেষে পেঁাছলেন দরজার কাছে, দু'বছর আগে এই দরজার সামনেই তিনি তাও লির বাক্স হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এবার আর থামলেন না। তাঁর অপ্রত্যাশিত আগমনে বন্ধুর

বিস্ময়ে তাঁর মুখে বাঁকা দুষ্টু হাসি দেখা গেল না। মুখ তাঁর তখন কঠোর, গম্ভীর। হুড়মুড় করে দাভিদভের ঘরে ঢুকে পড়লেন।

অংক আর হিসাবপত্তরের কাগজের স্তূপটা দাভিদভ ঠেলে পাশে সরিয়ে দিলেন।

'আলেক্সেই পেত্রভিচ! তুমি দেখছি রাজদূতের মতোই চটপটে! এত তাড়া তোমায় মানায় না। চিঠিটা তুমি কখন পেয়েছ?'

'কাল সকালে। পাঁচটা বাজতেই আমি বেরিয়ে পড়েছি। কিন্তু সত্যি বলতে কি, তোমার উপর আমি অসম্ভব চটেছি। চিঠি মারফৎ এ বিষয় জানানর অর্থ কী? আগে তুমি পাগলের মতো দাবী জানালে আমি যেন খুব তাড়াতাড়ি তারা-মানুষদের একটা বর্ণনা তোমায় পাঠাই। আর তারপর যখন তাদের খুঁজে পেলে তখন একেবারে চুপ। যতক্ষণ না খোঁড়া শেষ হল কোন উচ্চবাচ্য নেই।'

শাত্রভ রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে লম্বা লম্বা পায়ে এদিক থেকে ওদিক পায়চারি করতে লাগলেন।

'আরে শোন, শোন আলেক্সেই পেত্রভিচ। হঠাৎ খবর দিয়ে লোককে অবাক করে দিতে আমার বড় ভাল লাগে। দু সপ্তাহ আগে কথাটা তোমায় জানালে কী বা লাভ হত। লেনিনগ্রাদে বসে তুমি ভেবে ভেবে সারা হতে।'

'প্লেনে করে চলে যেতাম!' শাত্রভ চীৎকার করে বললেন।

'প্লেনে করে যেতে!' দাভিদভ তোতলাতে থাকেন, 'ঐ খোঁড়ার জায়গায়? হ্যাঁ, তা অবশ্য ঠিক। তুমি দেখছি অনেক বদলে গেছ, একেবারে অন্যমানুষ।'

শাত্রভ দাভিদভের ডেস্কের কাছে এসে মুচকি হাসলেন।

'চমৎকার। পুরস্কার হিসেবে ঐ নক্ষত্র-বাসীটি তোমায় দেখিয়ে দেব।' দাভিদভ আলমারির কাছে গিয়ে হাতলটা ধরলেন। উচ্ছ্বসিত বিজয়ীর ভাব সুস্পষ্ট। আলমারির দরজাটা আস্তে খুলে গেল।

'থাম, থাম ইলিয়া আন্দ্রেয়েভিচ,' শাত্রভ হঠাৎ জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন, 'একটু দাঁড়াও, আলমারির কপাটটা বন্ধ কর।'

দাভিদভ কথা মতো কাজটি করে হতভম্ব হয়ে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

'আমার অনুমান তোমার কাছে পাঠানর সময় পাইনি,' শাত্রভ বলে চললেন, 'সেগুলি তোমায় এখনই জানিয়ে দিই, নক্ষত্র-বাসীর সঙ্গে মোলাকাত না হয় দুচার মিনিট পরেই হবে। কিন্তু অনুমানটা ঠিক হয়েছে কিনা দেখা যাক। দেখা যাক বুদ্ধির দৌড় কত দূর। বোঝা যাবে আমাদের গ্রহের নিয়মাবলীর ভিত্তিতে গড়ে তোলা উপমা-পদ্ধতি অন্য গ্রহেও খাটবে কি না?'

'চমৎকার আইডিয়া। তবে সুরু কর।'

আইডিয়াটা দাভিদভের এতই মনে লেগেছে যে ডেস্কে ফিরে যাবার আগে আলমারিতে ভদ্রলোক তালাই লাগিয়ে ফেললেন। শাত্রভ বিরাট বড় কাগজের একটা বাণ্ডিল বের করলেন, পরিষ্কার হাতের লেখায় কাগজগুলি ঠাসা।

'সবটা আমি পড়ব না। আলমারির মধ্যে কী আছে দেখার জন্যই আমি ব্যস্ত। আমার সাধারণ অনুমানগুলি আরেকবার ঝালিয়ে নিই। আশা করি মনে আছে আমরা স্বীকার করে নিয়েছিলাম যে এ্যালবুমিনাস অণু আর অক্সিজেনের শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত জীবনধারার রূপ সমগ্র বিশ্বেই এক। একথাও আমরা মেনে নিয়েছিলাম, জীব গঠিত হয়েছে নির্দিষ্ট কতগুলি বস্তু দিয়ে। কোন দৈব কারণে নয়, বস্তুগুলির সর্বদাস্থায়ী কতগুলি গুণ আর রাসায়নিক গুণাবলীর সংযোগে। এ বিষয়েও আমরা একমত ছিলাম যে জীবনের পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল ও উপযোগী অবস্থা সম্পন্ন যে কোন গ্রহপরিবারের সঙ্গে আমাদের গ্রহের মিল থাকা সম্ভব। কিন্তু কোন্ কোন্ বিষয়ে মিল?

'প্রথম, গ্রহটির সূর্য যদি আমাদের সূর্যের চেয়ে বড় আর বেশি উজ্জ্বল হয় তবে গ্রহটি সূর্য থেকে আমাদের চেয়েও দূরে থাকবে। তার সূর্য যদি ছোট আর ঠাণ্ডা হয় তবে কাছে থাকবে, যাতে পৃথিবীর সমান তাপীয় শক্তি সে পেতে পারে।

'দ্বিতীয়ত, গ্রহটি যথেষ্ট বড় হওয়া চাই যাতে শক্তিশালী বায়ুমণ্ডলকে সে টেনে রাখতে পারে। সেই বায়ুমণ্ডলই তো তাকে মহাশূন্যের শীত আর মহাজাগতিক বিকিরণ থেকে রক্ষা করবে। আবার খুব বেশি বড় হলেও চলবে না। নইলে অস্তিত্বের প্রথম পর্বে — যখন গ্রহটি সামান্য একটি আগুনের

গোলা মাত্র তখন যথেষ্ট পরিমাণ গ্যাস বেরিয়ে যেতে পারবে না। এই গ্যাসের পরমাণুগুলি মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়া চাই। নয়ত গ্রহটির বায়ুমণ্ডল বিষাক্ত গ্যাসে এত ঘন হয়ে ভরে উঠবে যে সূর্য কিরণের প্রবেশ অসম্ভব হবে।

'তৃতীয়ত, গ্রহটি যে গতিতে তার অক্ষের চারপাশে ঘুরে চলেছে তার সঙ্গে পৃথিবীর গতির মিল থাকা চাই। গতি বেশি মন্থর হলে একদিক যাবে পুড়ে অন্য দিক জমে। কাজেই প্রাণের আশা থাকবে না। যদি বেশি দ্রুত হয় তবে স্থিতির পক্ষে প্রয়োজনীয় অবস্থা রক্ষা করতে পারবে না। বায়ুমণ্ডলও থাকবে না। কাজেই চেপটা হয়ে ফেটে বেরিয়ে যাবে।

'সুতরাং গ্রহটির বায়ুমণ্ডলের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, তাপ, চাপের সঙ্গে পৃথিবীর বর্তমান অবস্থার অনেকটা মিল থাকা চাই।

'এগুলি হল প্রধান অনুমান। এখন আমাদের কাজ হল প্রধান বিবর্তনের ধারাটি, যার ফলে বুদ্ধির দীপ জ্বলে ওঠে, সেটি বের করা। অন্যজগতের বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণীটির চেহারাটা কেমন? বড় মস্তিষ্ক, স্বাধীন কর্মক্ষমতা, চিন্তাশক্তির বিকাশের জন্য কী কী তার প্রয়োজন?

'প্রথম প্রয়োজন হল শক্তিশালী ইন্দ্রিয়ের বিকাশ। সর্বপ্রথম দৃষ্টি — দুটো চোখ তার থাকা চাইই চাই। তাতে থাকবে স্টিরিওস্কোপিক দৃষ্টি, যার ফলে সে চারদিক বেড়ে দেখতে সক্ষম হবে, বুঝতে পারবে কোথায় কী কী আছে। জিনিসের চেহারা আর অবস্থান সম্পর্কে তবেই জন্মাবে তার সঠিক ধারণা। বলাই বাহুল্য মাথাটা থাকবে শরীরের উপরের দিকে আর সামনে। ইন্দ্রিয়গুলি তার কাছাকাছি, যাতে সবচেয়ে কম সময়ে স্নায়ুর উত্তেজনা পরিবাহিত হতে পারে।

'বুদ্ধিসম্পন্ন জীবের থাকা চাই চলাফেরার ক্ষমতা, অতি উন্নত কর্মক্ষম পেশী। কারণ কাজের মধ্যে দিয়েই জীব তার পারিপার্শ্বিককে বুঝতে পারে আর মানুষে বিবর্তিত হয়। বুদ্ধিসম্পন্ন জীবের আকৃতি কখনো অত্যন্ত ছোট হতে পারে না। শক্তিশালী মস্তিষ্কের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তিসঞ্চয় ছোট্ট প্রাণীর দেহে থাকতে পারে না। তাছাড়া খুব ছোট প্রাণীকে অতি সহজেই মেরে ফেলা যায়। গ্রহের মধ্যে যে কোন সামান্য অসুবিধা — যেমন বাতাস, বৃষ্টি ইত্যাদি তার পক্ষে মারাত্মক। আর

পৃথিবীর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হলে তাকে প্রকৃতির শক্তির সম্পূর্ণ অধীনে থাকলেও চলবে না।

'বুদ্ধিসম্পন্ন জীবকে তাই চলতে হবে। হতে হবে প্রয়োজনীয় আকারের। আর কিছু শক্তিও রাখা চাই — সুতরাং মেরুদণ্ডী প্রাণীর মতো তার দেহের ভিতরে একটি কঙ্কাল থাকা চাই। আকারে বিরাট বড় হলে চলবে না। কারণ জীবটির বিরাট বাড়তি দায়িত্ব মস্তিষ্কটিকে রক্ষা করার জন্য যে কর্মক্ষমতা ও সৌষ্ঠবের চরম অনুকূল অবস্থার দরকার বিরাট শরীরে তা সম্ভব নয়।

'বোধহয় বেশি গভীরে চলে যাচ্ছি। এক কথায়, বুদ্ধিসম্পন্ন জীব হবে মেরুদণ্ডী, তার মাথাটা হবে আকারে আমাদের মতোই, মানুষের এই অঙ্গসৌষ্ঠব আকস্মিক বলে মনে কোর না। মস্তিষ্ক তখনই বিকাশ লাভ করে যখন মাথাটা আর শিং, দাঁত ও শক্তিশালী চোয়ালওয়ালা অস্ত্র মাত্র থাকে না। তখন তাকে শিং দিয়ে মাটি খুঁড়তে হয় না বা ঘায়েল করতে হয় না শিকারকে। প্রকৃতিতে যথেষ্ট নিরামিষ আহারের জোগান থাকলে এই বিকাশ অবধারিত। পৃথিবীর অধিবাসীদের পক্ষে ফলগাছ বিশেষ প্রয়োজনীয়। তার ফলে সারাক্ষণ গাছপালা খাওয়ার হাত থেকে আমরা রেহাই পেয়েছি। শাকাহারী প্রাণী আমাদের আর হতে হয়নি। সেইসঙ্গে মাংসাশী প্রাণীর মতো সারাক্ষণ জ্যান্ত শিকার জোগাড়ে ব্যস্ত থাকতে হয়নি। মাংসাশী প্রাণী অবশ্য স্বাস্থ্যকর মাংস খেয়ে জীবনধারণ করে সত্যি। কিন্তু আক্রমণ করা বা হনন করার জন্য তার অস্ত্র থাকা চাই। এর ফলেই মস্তিষ্কের বিকাশ ব্যহত হয়। ফল থাকলে চোয়াল অপেক্ষাকৃত কমজোর হলেও চলে, খুলিটা একটা বিরাট ডোমের আকার গ্রহণ করে মুখাবয়ব চালনা করতে পারে।

'অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কী আকার নেবে সেবিষয়ে এখানে অনেক কিছু বলা যায়। কিন্তু বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, তাদের আকৃতি এমন হবে যাতে হাতপা নাড়া সম্ভব হয়। যন্ত্রপাতি ধরা, ব্যবহার করা, তৈরী করায় সুবিধা হয়। শেষত, অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোর বিভিন্ন কাজ থাকা চাই। পায়ের কাজ হল জীবটিকে বিভিন্ন জায়গায় বয়ে নিয়ে যাওয়া। হাত জিনিস নেবে, ধরবে ... মাথাটাকে মাটি থেকে তোলা যাবে। সেটা বসান থাকবে শরীরের উপর নয়ত চারপাশের জগৎ যথেষ্ট ব্যাপকভাবে দেখা সম্ভব হবে না।

'অতঃপর আমি এই সিদ্ধান্তে পেঁছেছি যে সুবিকশিত, চিন্তাক্ষম মস্তিষ্কসম্পন্ন জীবের যা কিছু প্রয়োজন, পৃথিবীর মানুষের চেহারা তার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করেছে। প্রাণের প্রতি বিরূপ মহাজাগতিক শক্তির ভিতর প্রাণ সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ থাকে। এই সীমারেখা একটা বিশেষ নির্দিষ্ট ধরা বাঁধা ছাঁচে জীবন গড়ে তোলে। কাজেই যে কোন বুদ্ধিসম্পন্ন জীবের চেহারায় মানুষের সঙ্গে মিল থাকবেই। বিশেষত তার খুলি আর মানুষের মাথার খুলি অনেকটা এক রকম হতে বাধ্য। সংক্ষেপে এই হল আমার অনুমান।'

শাত্রভ চুপ করলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর উত্তেজনা কাটিয়ে বললেন, 'নাও, এবার তোমার নক্ষত্র-বাসীকে বের কর, চটপট।'

'ঠিক হ্যায়।' আলমারির কাছে গিয়ে দাভিদভ একটু থামলেন, 'আলেক্সেই পেত্রভিচ, তুমি ঠিক জায়গাটিতেই ঘা দিয়েছ। আশ্চর্য! বিজ্ঞানের শক্তি আর মানুষের বুদ্ধি সম্বন্ধে এর আগে কোন দিন এত অসম্ভব আস্থা আমার জন্মায়নি!'

'সে যাচাই এখনও বাকি আছে। আগে লোকটাকে তো দেখি।'

দাভিদভ আলমারির ভিতর থেকে একটা চওড়া ট্রে বের করলেন।

গর্ত আর খাঁজে সজ্জিত অদ্ভুত গাঢ় বেগুনি খুলিটার দিকে শাত্রভ একদৃষ্টে তাকিয়ে। হাড়ের গভীর গর্তওয়ালা ডোমটা, যার মধ্যে একদিন নক্ষত্র-বাসীর মস্তিষ্ক ছিল, একেবারে হুবহু মানুষের খুলির মতো। বিরাট অক্ষিকোটরটাও একরকম, সোজা চলে গিয়ে একটা সরু হাড়ের বাধায় ভাগ হয়ে গেছে। খাড়া গোল মাথার পিছন দিকটা, বড় কপালের তলে বসে যাওয়া মুখের অংশটা হুবহু এক। কেবল নাকের হাড়ের বদলে একটা ছোট তেকোণা গর্ত। উপরের চোয়ালের হাড়টা পাখীর ঠোঁটের ডগার মতো নিচের দিকে বাঁকান। নাকের গর্তের কাছ থেকে সেটা ছুঁচোলভাবে বেরিয়ে আছে। নিচের চোয়ালের হাড়টার গঠনও একই রকম। সেখানেও উপরের মতো দাঁতের কোন চিহ্ন নেই। দুটো হাড় যেখানে জোড়া লাগে সে জায়গাটা গোল হয়ে যায়। সেইরকম গোলচে অংশগুলো আড়াআড়িভাবে কতগুলো কোটরে ঢুকে গেছে। চওড়া হয়ে ফুলে উঠে সে জায়গাদুটো ক্রমে নিচের দিকে চলে গেছে;

কোটরগুলো রয়েছে তারই প্রান্তে। তাদের পিছনে কপালের রগের নিচে দুটো মস্ত ফুটো।

'হাড়টা ভাল অবস্থায় আছে তো?' শাত্রভ চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন। তারপর দাভিদভকে মাথা ঝাঁকাতে দেখে খুলিটা হাতে তুলে নিলেন।

'ও, এটার নিশ্চয়ই দাঁতের বদলে কচ্ছপের মতো ধারাল চোয়াল ছিল; তুমি কী বল?' দাভিদভের জবাবের জন্য অপেক্ষা না করেই শাত্রভ বলে চললেন, 'চোয়াল, নাক আর শ্রবণ ইন্দ্রিয়টা কিছু আদিম। হাড়ের মধ্যে এই গর্ত আর এর গঠন দেখে বোঝা যায় যে চামড়াটা হাড়ের খুব কাছে ছিল। হাড় আর চামড়ার মাঝে মাংসপেশীর কোন স্তর ছিল না। ঐ জাতীয় চামড়ায় লোম না থাকার সম্ভাবনাই বেশি। আর আলাদা আলাদা হাড়গুলি ... এবিষয়ে ভেবে দেখা প্রয়োজন ... কিন্তু দেখ, চোয়ালটা দুটো হাড় দিয়ে তৈরী। এটাও বিকাশের আদিম পর্বের চিহ্ন।'

'তার মানে বোধহয় ওদের বুদ্ধিবিকাশের পদ্ধতিটা আমাদের চেয়ে সংক্ষিপ্ত।' দাভিদভ মন্তব্য করলেন।

'ঠিক ধরেছ! ওদের গ্রহের প্রাকৃতিক অবস্থা আমাদের চেয়ে আলাদা। নিশ্চয়ই মাটির গঠনের ধারা আর প্রাকৃতিক নির্বাচনের অবস্থায় তফাৎ আছে। আচ্ছা, হাড়টার গঠন বিষয়ে কিছু অনুসন্ধান করেছ?'

'ব্যাপারটা বেশি তলিয়ে দেখিনি। কিন্তু একথা জানি যে মূলত এটা মানুষের খুলির মতো ক্যালসিয়ম ফসফেট দিয়ে তৈরী নয়, কিন্তু ...'

'সিলিকন দিয়ে তৈরী।' শাত্রভ দাভিদভকে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন।

'হ্যাঁ, আর তাতে বিস্মিত হবার কিছু নেই — কারণ সিলিকনের রাসায়নিক ফল অনেক সময় কার্বনের মতোই হয়। আর জৈবিক প্রক্রিয়াতেও কাজে লাগান যেতে পারে।'

'কিন্তু কঙ্কালটা? এছাড়া আর কিছু পাওনি?'

'এইটুকুই কেবল ...' দাভিদভ আরেকটা ট্রে টেনে বের করলেন, 'আর এইটুকু পাওয়া গেছে।'

শাত্রভের সামনে রয়েছে দুটো ছোট ধাতুর টুকরো আর একটা পাঁচ ইঞ্চি বেড়ের চাকতি। ধাতুর টুকরোদুটোর তলটা একেবারে একরকম, দেখতে মোটামুটি সাতকোণা প্রিজমের মতো।

ধাতুটা সীসের মতো ভারী, কিন্তু তার চেয়ে শক্ত আর রংটাও হলদেটে সাদা।

'এটা কী?' দাভিদভ ভারী ধাতুর টুকরোটাকে হাতের তালুর উপর নাচাতে নাচাতে জিজ্ঞেস করলেন।

'সেটা তো, আমার জানবার কথা নয়,' শাত্রভ বিড়বিড় করে বলে চললেন, 'এ্যালয় জাতীয় কিছু হবে। তবে তুমি জিজ্ঞেস করছ বলে মনে হচ্ছে জিনিসটা সাধারণত চোখে পড়ে না।'

'ঠিক বলেছ, এটা গার্ফিনিয়ম। এর প্রাকৃতিক আর রাসায়নিক গুণ অনেকটা তামার মতো, কিন্তু আরও বেশি শক্ত। সহজে গলে না। এর একটি বিশেষ গুণ হল বেশি উত্তপ্ত হলে ইলেকট্রন ত্যাগ করে। এবার এই আয়নাটার দিকে তাকাও।'

শাত্রভ ধাতুর চাকতিটা তুলে নিলেন। সেটাও বেশ ভারী। প্রান্তটা ভোঁতা আর তাতে সমান করে ছড়ান এগারটা খাঁজ। একটা দিক সামান্য চাপা। খুব শক্ত আর চকচকে অবতল। উপরের আস্তরটা কাঁচের মতো স্বচ্ছ। তার নিচে খাঁটি রুপো রঙের ধাতু। একটা ধার যেন ধূসর মরচে ধরে ক্ষয়ে গেছে। স্বচ্ছ আস্তরটা ঘিরে শক্ত ধূসর-নীল রঙের ধাতুর বেড়। চাকতিটার বাকি অংশটুকু এই ধাতু দিয়েই তৈরী। উল্টো দিকে, ঠিক মাঝখানে ঐ একই স্বচ্ছ জিনিসের একটা বৃত্ত। আর উপরে অস্বচ্ছ উত্তল আস্তর। এর বেড় আড়াই ইঞ্চির বেশি হবে না। বৃত্তটি ঘিরে ঐ একই ধূসর-নীল ধাতুর বেড়। তার উপর তারার খোদাই ছাপ রয়েছে। প্রত্যেকটি তারার রশ্মিরেখার সংখ্যা আলাদা। তিন থেকে এগার পর্যন্ত নানা রকম আছে। এই ভাগের মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে কোন নিয়ম ধরা পড়ে না। কিন্তু প্রতি জোড়ার মাঝে মাঝে ঘুরে ঘুরে চলে গেছে পরস্পর জড়ান রেখা।

'চাকতিটা ট্যাণ্টেলম দিয়ে তৈরী। ট্যাণ্টেলম অসম্ভব শক্ত আর অস্বাভাবিক রকম টেঁকসই। উপরের আস্তরটা আমাদের অজ্ঞাত রাসায়নিক সংযোগে তৈরী। এর গুণাগুণ সম্পর্কে একটা প্রাথমিক বিশ্লেষণ করেছিলাম কিন্তু কোন ফল পাইনি। জটিল কোন পরীক্ষা এখনো করা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু তলের ধাতুটি সত্যিই অপূর্ব। ওটা হল ইণ্ডিয়ম।'

'কী হিসেবে অপূর্ব, শুনি?' শাত্রভ ধাঁ করে জিজ্ঞেস করে বসলেন।

'আমাদের যন্ত্রপাতিতে নিউট্রন বিচ্ছুরণ হচ্ছে কিনা এই ধাতু তার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য নির্দেশক। আর ওটা যে ইণ্ডিয়ম তাতে কোন সন্দেহ নেই। একটু ঝুঁকি নিয়েই বিশ্লেষণের নমুনার জন্য একটা ফুটো করে দেখেছিলাম।'

'এই তারাগুলি তবে বোধহয় ওদের বর্ণমালার অংশ?' শাত্রভ উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করলেন।

'হতে পারে, কিন্তু এবিষয়ে নিশ্চয় করে জানা বোধহয় সম্ভব হবে না।'

'ব্যস্, আর কিছু নেই?'

'এই সব! কেন, এতে বুঝি তোমার তৃপ্তি হচ্ছে না, আচ্ছা লোভী তো! তোমার হাতে যা জিনিস আছে, সারা পৃথিবী জুড়ে চাঞ্চল্যের বন্যা বইয়ে দেয়ার পক্ষে তা যথেষ্ট!'

'সারা এলাকাটা খুঁড়ে দেখেছ তো?' শাত্রভ খোঁচাতে লাগলেন, 'খুলি শুদ্ধ কঙ্কাল কেন পাওয়া গেল না? আমি বিশ্বাস করি না যে ...'

'নিশ্চয়ই একটা কঙ্কাল তো ছিলই। ধড়ের হাড়ছাড়া একটা জীবের তো আর খুলি থাকতে পারে না। কিন্তু কঙ্কালটা যে ওখানেই ছিল, একথা আমি বিশ্বাস করি না।'

'এত সুনিশ্চিত হয়ে বলছ কী করে, ইলিয়া আন্দ্রেয়েভিচ? কিসের উপর ভরসা ...?'

'ব্যাপারটা অত্যন্ত সরল। সাত কোটি বছর আগে একটা বিপর্যয় ঘটেছিল। আমরা হঠাৎ তার হদিস পেয়ে গেছি। কোন বিপর্যয় না ঘটলে মৃত ডাইনোসর ছাড়া অন্য কোন কিছুর খুলিটুলি পাওয়া অসম্ভব হত। ভবিষ্যতে এ জাতীয় জিনিস আরও পাওয়া যাবে। এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে নক্ষত্র-বাসী ...,' তারা-মানুষের চোখের শূন্য কোটরদুটো দুই বন্ধুর দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে; দাভিদভ খুলিটাকে দেখিয়ে বলে চললেন, 'পৃথিবীর বুকে বেশিদিন ও ছিল না, বড় জোর নিজেদের গ্রহে ফিরে যাবার আগে কয়েকবছর কাটিয়েছিল। পরে বলব এ অনুমান কেন করছি। এবার দেখ ...,' দাভিদভ একটা বিরাট মানচিত্র খুলে ধরলেন, 'এই হল আমাদের খোঁড়াখুঁড়ির নক্সা। নক্ষত্র-বাসীটি নদীতীরে এইখানেই কোথাও তার যন্ত্রপাতি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল — স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে

অস্ত্রগুলি তার ছিল পারমাণবিক। পারমাণবিক শক্তির সঙ্গে তাদের যে কেবল পরিচয় ছিল তা নয় তার ব্যবহারও তারা জানত — পৃথিবীতে তাদের আগমনের ব্যাখ্যা এ থেকেই পাওয়া যায়। তারা-মানুষটি বেশ দূর থেকে তার অস্ত্র দিয়ে একটা ডাইনোসরকে মারে। ডাইনোসরগুলো বোধহয় তাদের বেশ জ্বালিয়েছিল। তারপর সে তার নিজের কাজে চলে যায়। কী কাজ তাতে কিছু আসে যায় না। সে যখন কাজ করছে সেই সময় কোন একটা হিংস্র সরীসৃপ তাকে আক্রমণ করে। তারপর যে কী ঘটেছিল তা বলা মুশকিল — হয়ত তারা-মানুষ তার অস্ত্র ব্যবহার করতে দেরি করে ফেলেছিল, হয়ত অস্ত্রটিই বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। তবে একটা কথা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, বিরাট দৈত্যটা তার খুব কাছেই মারা পড়ে। আর পড়বার সময় তারা-মানুষের দেহ দেয় গুঁড়িয়ে। ফলে ওর অস্ত্রশস্ত্র নিশ্চয়ই বিধ্বস্ত হয়ে বিস্ফোরণ ঘটে। ঐ বিস্ফোরণের ফলে কিছুটা জায়গা জুড়ে মারাত্মক রশ্মি বিচ্ছুরিত হতে থাকে আর আশেপাশে যত ডাইনোসর ছিল সব মারা পড়ে — এই কঙ্কালের স্তূপ তারই চিহ্ন। এই বিধ্বস্ত এলাকাটা দক্ষিণে বেশি দূর যায়নি, হয়ত রশ্মির তেজ সেখানে কম ছিল। কাজেই ছোট ছোট কোন মাংসাশী প্রাণী নক্ষত্র-বাসীর দেহের হাড়গোড় গুঁড়িয়ে দিতে পেরেছে। খুলিটা বেঁচে গেছে; হয়ত বেশি বড় ছিল বলে, নয়ত চাপা ছিল ডাইনোসরটার মাথার নিচে। কতগুলি ছোট ছোট মাংসাশী জন্তুও মরেছিল — এই দেখ তিনটে কঙ্কাল। এই করুণ ঘটনাটি নদীর বালি ঢাকা পাড়েই ঘটেছিল, বাতাস তাড়াতাড়ি সব চিহ্ন দিয়েছিল ঢেকে।'

শাত্রভ অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে মুখ বেঁকিয়ে বললেন, 'কিন্তু যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র কোথায় যাবে?'

'মনে রেখ যে কটা টুকরো পাওয়া গেছে সেগুলি অসম্ভব রকম টেঁকসই ধাতুর তৈরী। বিস্ফোরণের পরেও বাকি যা ছিল সেগুলি মরচে পড়ে গুঁড়ো হয়ে, শত লক্ষ কোটি বছর ধরে ক্রমে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। ধাতু তো আর হাড় নয়। একথা তুমি নিশ্চয়ই জান যে ধাতু হাড়ের মতো জীবাশ্মে পরিণত হতে পারে না, খনিজ পদার্থে ক্রমে ভরে উঠে চারপাশের পদার্থের গায়ে গেঁথে যেতেও পারে না। তা ছাড়া, বিস্ফোরণের পর হয়ত অস্ত্রশস্ত্রের সামান্য অংশই টিঁকে ছিল।'

'হ্যাঁ, মন্দ আঁচ করনি,' শাত্রভ হাল ছেড়ে দিলেন, 'এখন আমাদের কাজ হল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খুলিটা পরীক্ষা করে হাড়ের মৌলিক পদার্থ থেকে বিবর্তন ধারার যে পরিচয় পাওয়া সম্ভব সেটি বিশ্লেষণ করে তোমার খসড়াটি ছাপাখানায় পাঠান। ব্যাপারটা একেবারে বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো হবে!' শাত্রভের হাল্‌কা বড়বড় চোখদুটো কে যেন নক্ষত্র-বাসীর খুলিটার সঙ্গে আঠা দিয়ে সেঁটে দিয়েছে।

দাভিদভ বন্ধুর কাঁধের উপর একটা হাত রেখে তাকে নাড়া দিয়ে বললেন, 'এ লেখা আমি কোনদিন ছাপাব না।'

শাত্রভ কী যেন বলতে সুরু করতেই দাভিদভ তাঁকে এতজোর চেপে ধরলেন যে তাঁর কথা সেখানেই বন্ধ হয়ে গেল। 'লেখাটা তুমি তৈরী করবে, আর তোমার নামেই ছাপা হবে। হ্যাঁ, এর উপর তোমারই পূর্ণ অধিকার। কোন আপত্তি চলবে না!' দাভিদভ গম্ভীর গলায় গর্জন করে উঠলেন, 'জান না আমার গণ্ডারের গোঁ?'

'কিন্তু... কি... ন্তু...' শাত্রভ কথা খুঁজে পেলেন না।

'তোমার কিন্তু টিন্তু রাখ। খোঁড়ার কাজের উপর আমার ভূবৈজ্ঞানিক রিপোর্ট তৈরী করা হয়ে গেছে। নক্ষত্র-বাসীর মৃত্যু সম্পর্কে আমার ধারণা, আমার সব সহকর্মীদের নাম তাতে আছে। সুরু করেছি যে মেয়েটি সত্যিই খুলিটা খুঁজে পেয়েছে তার নাম দিয়ে। এই নাও। আমার নাম দিয়ে ছাপাতে পার। এটাই ন্যায্য, তাই না, আলেক্সেই পেত্রভিচ?' দাভিদভ চিন্তামগ্নভাবে মৃদুস্বরে বললেন, 'আপাতত এখুনি আমার হাতে আরেকটি বিশেষ প্রয়োজনীয় কাজ আছে। মনে আছে, খুব লাগসই একটা কথা বলেছিলে, একটি অবিশ্বাস্য ধারণা যখন অন্য অবিশ্বাস্য ধারণাকে সমর্থন করে তখন সেটা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে। নক্ষত্র-বাসীর খুলিটাই যথেষ্ট সত্যি, তাই না? কিন্তু এই সত্য আবার এমন কতগুলি জিনিস নির্দেশ করে যেগুলি অসত্য বলে মনে হয়। এই ভাবে অনুমানের ফিরিস্তি বেড়েই চলে। আর আমি চাই প্রতিটি গ্রন্থি একের পর এক খুলতে।'

'কী বলছ, ঠিক বুঝতে পারছি না। আশা করি যা বলছ তার অর্থ তুমি নিজেও জান। কিন্তু এ হল সম্পূর্ণ আত্মত্যাগের কথা। এ প্রস্তাবে আমি কিছুতেই রাজি হতে পারি না...'

'তা মোটেই নয়, আলেক্সেই পেত্রভিচ, আমায় বিশ্বাস কর! আমি সত্যিই অন্তর থেকে কথাটা বলছি। একসঙ্গে কাজ করার সময় প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আমরা দুজনে সংগ্রহ করেছি, তাই না? পরে বুঝবে এবারের ব্যাপারটাও হুবহু আগের কাজের মতোই। সমস্ত কাজটা একা আমি সামলাব, এ আশা নিশ্চয়ই তুমি কর না। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী এক, আর সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কথা হল বিজ্ঞানের উন্নতি ঘটান।'

কথাটা শাত্রভের মর্মস্পর্শ করল, মাথা নীচু করে শাত্রভ দাঁড়িয়ে রইলেন। আবেগ প্রকাশ করার লোক তিনি নন। আবেগ যত গভীর হয় শাত্রভ তত অপ্রস্তুত বোধ করেন। শাত্রভ নির্বাক হয়ে বন্ধুর পাশে দাঁড়িয়ে। তাঁর দিকে তাকিয়ে দাভিদভ প্রশ্রয়ের ভঙ্গীতে মৃদু হাসছেন। আপনা থেকেই শাত্রভ নক্ষত্র-বাসীটির খুলিটা ছুঁয়ে ফেললেন। নক্ষত্র-বাসীর তারার জাহাজটি মহাশূন্যে অসীম অনন্ত পথে চলেছিল, কোন যন্ত্র কোন শক্তি তার নাগাল পায়নি। আজ এখানে পড়ে আছে খুলিটা, একদিন এটা ছিল একান্ত তারই। এই খুলিটাই প্রাণের অনিবার্য বিবর্তনের অবিনশ্বর সাক্ষ্য, সুকঠোর অনন্ত পথে প্রাণের অনিবার্য নিখুঁত প্রকাশের প্রমাণ। এই বিকাশই প্রাণের নিয়ম, প্রাণের অস্তিত্বের পক্ষে প্রয়োজনীয় নিয়ম। যদি কোন মহাজাগতিক বিপর্যয়ের ফলে এই প্রাণ হঠাৎ লুপ্ত না হয়, তবে নিশ্চয়ই জন্ম নেবে চিন্তাশক্তি আর মানুষ। সেই সঙ্গে তার সমাজ, তার প্রয়োগবিদ্যা আর বিশ্বের অন্ধ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই। সেই সংগ্রামের ক্ষেত্রও বিভিন্ন হতে পারে — অজানা পৃথিবীর অতিথিও তার মধ্যে পড়বে। তারা যে অতকাল আগে আমাদের পৃথিবীতে এসেছিল সেটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। তারা আমাদের বহু নতুন জ্ঞান দিতে পারত।

শাত্রভ শান্তভাবে তার বন্ধুর দিকে ফিরে দাঁড়ালেন, 'তোমার প্রস্তাব... মেনে নিলাম। তুমি যা বলছ তাই হবে। লেনিনগ্রাদে ফিরে গিয়ে আমায় ছুটির ব্যবস্থা করে আসতে হবে। সোজা ফিরে আসব। কাজ আমাকে এখানেই করতে হবে, কারণ এই অমূল্য সম্পদ মস্কোর বাইরে নিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি নেওয়াটা উচিত নয়।'

শাত্রভ একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু তুমি এখন কী করবে, ইলিয়া আন্দ্রেয়েভিচ?'

'কেন, বললাম যে। এই সূত্রটার অন্য প্রান্ত ধরে আমি কাজ সুরু করব। ভূবিদ্যাগত পদ্ধতির উপর পারমাণবিক শক্তির বিক্রিয়ার ফল নিয়ে আমি বহুদিন ধরেই ভাবছিলাম। আমাদের এই অত্যাশ্চর্য আবিষ্কার পুরনো অন্ধকূপ থেকে আমায় টেনে বের করে এনেছে। সামনে নতুন চিন্তার দ্বার গেছে খুলে। আমার সাহস বেড়েছে, দৃষ্টি হয়েছে উদার। আমি প্রমাণ করতে চেষ্টা করব, ভূপৃষ্ঠে যে পারমাণবিক শক্তির বিপুল সঞ্চয় রয়েছে তা কাজে যোগান সম্ভব। ভূগর্ভবিদ্যার নতুন দিক খুলে দেব, তাকে বাস্তব কার্যকরী ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করব। আর তোমার কাজ হবে প্রাণ ও চিন্তাশক্তির বিবর্তন নিয়ে। কেবল পৃথিবীর নয়, সারা বিশ্বের। তুমি সেই ধারাটি উন্মোচন করবে, মানুষকে দেখিয়ে দেবে তার বিরাট সুযোগের ঐশ্বর্য। মিনমিনে অবিশ্বাসী আর দুর্বল চিত্ত প্রতিক্রিয়াশীল লোকদের তোমায় বিধ্বস্ত করতে হবে। বিজ্ঞানের জগতে সে জাতের লোক এখনও প্রচুর!'

দাভিদভ চুপ করলেন। শাত্রভ একদৃষ্টে বন্ধুর দিকে তাকিয়ে আছেন, যেন আগে কোনদিন তাঁকে দেখেননি।

'একটু বসা যাক, কেমন?' দাভিদভ শেষপর্যন্ত মুখ খুললেন, 'একটু মাথা ঠাণ্ডা করে নেওয়া যাক, একেবারে হাল্লাক হয়ে গেছি।'

বৈজ্ঞানিক দুজন বসলেন, সিগারেট ধরিয়ে একসঙ্গে নক্ষত্র-বাসীটির খুলির দিকে চেয়ে রইলেন।

ঘরটা অনেকক্ষণ পর্যন্ত নিস্তব্ধ রইল।

ছোট ছোট গর্তওয়ালা, ঠেলে বেরিয়ে থাকা কপালের দিকে দাভিদভের দৃষ্টি নিবদ্ধ। বহু যুগ আগে এরই আড়ালে বিরাট একটা মস্তিষ্ক কাজ করে চলেছিল। পৃথিবীর কোন্ ধারণা, কোন্ জ্ঞানে সে ভাণ্ডার পূর্ণ ছিল? তার নিজের গ্রহের কোন্ স্মৃতি সে সঞ্চয় করে রেখেছিল? দেশের জন্যে কি তার মন খারাপ হত না? চিরন্তন সত্য জানার আগ্রহ তার ছিল কি? সৌন্দর্যের অনুভূতি? তারার জাহাজ বেয়ে এসে যে অতিথি এই গ্রহেই বরাবর থেকে গেল, সে কি স্ত্রী না পুরুষ? তাদের জগতে মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক কেমন? সামাজিক ব্যবস্থা কী ধরনের? সমাজ ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠতম পর্যায়ে তারা কি পেঁাছেছিল যেখানে সমগ্র সমাজ একটি বিরাট কর্মরত পরিবারের অন্তর্গত, শোষণ বা অত্যাচার যেখানে লুপ্ত, যেখানে

অপরিচিত অর্থহীন বর্বর যুদ্ধ যার ফলে মানুষ তার শক্তি হারায়, নষ্ট হয় গ্রহের শক্তির ভাণ্ডার।

খুলিটা অন্ধ, নির্বাক দৃষ্টি নিয়ে দাভিদভের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। নিস্তব্ধতা আর রহস্যের জ্বলন্ত পরাকাষ্ঠা। দাভিদভ মনে মনে ভাবতে লাগলেন, "এই সব প্রশ্নের উত্তর আমরা কোনদিনই পাব না। কিন্তু আমাদের আছে শক্তিশালী মস্তিষ্ক। আমাদের আন্দাজের সীমানাও বহুদূর বিস্তৃত। পৃথিবী যখন অন্ধশক্তির প্রতীক, এইসব ভয়াবহ জীবজন্তুতে ভরা ছিল, তখন তোমরা এসেছিলে আমাদের গ্রহে। ঐ সব হিংস্র জীবজন্তুর অর্থহীন রাগ, তুলনাতীত সাহস এই গ্রহটিকে বাসের পক্ষে ভয়াবহ করে তুলেছিল। সংখ্যায় তোমরা বেশি ছিলে না। এ জগতের বাইরে থেকে অল্প কয়জন মিলে এসেছিলে শক্তির উৎস সন্ধানের সাহসী কাজে। এসেছিলে তাদের মতো বুদ্ধিমান প্রাণীর খোঁজে..."

শাত্রভ উসখুস করতে লাগলেন। তাঁর সহজে উত্তেজিত স্বভাব কর্মহীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ জানাতে সুরু করল। বন্ধুর দিকে চট্ করে তাকিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে হাতে তুলে নিলেন ভারী চাকতিটি। তারপর অভিজ্ঞ গবেষকের দৃষ্টিতে চাকতিটিকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলেন। অদ্ভুত যন্ত্রটা বা যন্ত্রের অংশটা শাত্রভ বিশেষ মাইক্রোস্কোপের বালবের নীচে রেখে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন। গঠনের মধ্যে নতুন কিছু তথ্য পাওয়া যায় কিনা যা এতদিন হয়ত তাঁদের চোখ এড়িয়ে গেছে। বহুযুগ পেরিয়ে গেছে তাই বৃত্তের উপরটা হয়ে উঠেছে ক্রমে অনচ্ছ। অনচ্ছ ফিল্ম্টার তলায় চাকতির উলটো দিকের ঐ অস্বচ্ছ বৃত্তের উপরেই কী যেন একটা চোখে পড়ল। শাত্রভ নিঃশ্বাস রোধ করে চাকতিটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে লাগলেন, ব্যাপারটা কী? মনে হল দেখতে পেলেন, এক জোড়া চোখ তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে, সেটা অবশ্য কল্পনাও হতে পারে। অধ্যাপক চাপা গলায় চীৎকার করে উঠলেন। চাকতিটা ঝনঝন করে হাত থেকে টেবিলের উপর পড়ে গেল।

দাভিদভ গালাগাল দিতে দিতে লাফিয়ে উঠলেন। শাত্রভ কিন্তু ভ্রূক্ষেপও করলেন না। হঠাৎ মাথায় একটা চিন্তা খেলতেই এক মুহূর্তের জন্য তাঁর হৃৎস্পন্দন যেন থেমে গেল।

'ইলিয়া আন্দ্রেয়েভিচ,' শাত্রভ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'হাতের কাছে পালিশ করার কোন জিনিস আছে — কার্বোর‍্যান্ডাম্, ক্রোকাস ও একটুকরো শ্যাময় চামড়া?'

'নিশ্চয়ই, সবগুলোই আছে। কিন্তু সে কথা চুলোয় যাক, তোমার হল কি বল ত?'

'জলদি, জলদি কর? কোথায় সেগুলো? এমন একটা জিনিস তোমায় দেখাব যা সারা জীবনে ভুলবে না!'

দাভিদভ তাঁর বন্ধুর মতোই উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। লাফিয়ে উঠে ঘর পেরিয়ে ছুটে চললেন। পাটা কার্পেটের খাঁজে আটকে যেতে প্রচণ্ড জোরে পা ঝেড়ে ছুটে বেরিয়ে গেলেন। শাত্রভ সাবধানে চাকতিটা তুলে নিয়ে নখ দিয়ে উত্তল ছোট বৃত্তটা খুঁটতে লাগলেন।

'এই নাও!' টেবিলের উপর পাউডারের শিশি, কাপ ভর্তি জল আর এলকোহল ও একটুকরো চামড়া রেখে দাভিদভ বললেন।

শাত্রভ ভীষণ ব্যস্ত হয়ে ক্ষিপ্র হাতে পালিশ করার গুঁড়োর ঘন মিশ্রণে চামড়ার টুকরোটা চট্ করে ডুবিয়ে নিয়ে বৃত্তের উপর ঘষতে লাগলেন। দাভিদভ শাত্রভের প্রতিটি অঙ্গভঙ্গী লক্ষ্য করে চলেছেন।

'অজানা এই স্বচ্ছ জিনিসটি অসাধারণ রকম দীর্ঘস্থায়ী।' কাজ বন্ধ না করেই শাত্রভ বললেন, 'কিন্তু একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় জিনিসটা নিশ্চয়ই কাঁচের মতো স্বচ্ছ। আর উপরটাও পালিশ করা। এখন অস্বচ্ছ দেখছ, তার কারণ হাজার হাজার যুগ ধরে এটা বালিতে পড়েছিল। এই সাংঘাতিক টেঁকসই জিনিসটারও কিছু ক্ষয় হয়েছে। কিন্তু আবার নিশ্চয়ই স্বচ্ছ হয়ে উঠবে।'

'তাতে কী হল?' দাভিদভ হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'অন্য দিকটা তো স্বচ্ছই রয়েছে। বেশ দেখা যাচ্ছে — ইণ্ডিয়মের একটা আস্তর ছাড়া আর কিছুই নেই।'

'এদিকে একটা ছবি রয়েছে! এক জোড়া চোখ দেখেছি! চোখ! নিশ্চয়ই কোন নক্ষত্র-বাসীরই প্রতিকৃতি। যার খুলি পাওয়া গেছে হয়ত বা তারই। কিম্বা যন্ত্রের কোন চিহ্ন। নয়ত এটা ওদের সামাজিক কোন নিয়ম। আন্দাজ করে আর কী লাভ? আসল কথা হল নক্ষত্র-বাসীকে আমরা দেখতে পাব।

বৃত্তের আকারটা দেখ, চশমার কাঁচের মতো। বেশ চমৎকার পালিশ হচ্ছে তো!' বৃত্তটার উপর আঙুল বুলিয়ে শাত্রভ বললেন।

শাত্রভের কাঁধের উপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে দাভিদভ অধীর আগ্রহে চাকতিটার দিকে তাকিয়ে আছেন। পালিশ করার গুঁড়োর লাল রেখার তলায় তলায় চাকতিটার কাঁচের চমক ক্রমে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত শাত্রভ খুশীর নিঃশ্বাস ফেললেন। পালিশ মুছে, এলকোহল দিয়ে কাঁচটা পরিষ্কার করে শ্যাময় চামড়া দিয়ে মুছে শুকিয়ে নিলেন।

'ঠিক আছে।' কথাটা বলে শাত্রভ কাঁচটা আলোর তলে রাখলেন।

দুই বিজ্ঞানীর মিলিত দৃষ্টি আপনা থেকেই নিবদ্ধ হল কাঁচটার বুকে। স্বচ্ছ আস্তরটার গভীর তল থেকে এক রহস্যপূর্ণ অপটিকাল কৌশলে বড় হয়ে স্বাভাবিক আকারে ফুটে উঠল অদ্ভুত এক ছবি। সেটা যে মানুষের মুখ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বিরাট বড় বড় চোখদুটো সোজা সামনে চেয়ে আছে। যেন দুটি পুকুরে ছায়া পড়েছে পৃথিবীর চিরন্তন রহস্যের। দৃষ্টিতে তীক্ষ্ন বুদ্ধি আর চরম আগ্রহের ছাপ। কাঁচের জীর্ণ দেওয়াল ভেদ করে মহাশূন্যের অনন্ত পথে বেরিয়ে পড়েছে যেন দুটি জোরাল রশ্মি। সেই দৃষ্টিতে চিন্তার অসীম সাহসের দীপ্তি। বিশ্বের কঠোর নিয়মের ভয়ে তা কুণ্ঠিত নয়। জ্ঞানাহরণের কষ্ট আর আনন্দের উপভোগে তা ভরপুর।

আমাদের এই জগতের বৈজ্ঞানিকরাও তাঁদের দিকে চেয়ে থাকা কোন দূর অতীতকালের চোখদুটি দেখে মোটেই হতবাক হয়ে পড়েননি। জয়ের আনন্দে তাঁরা মশগুল। বহুদূর আর দুর্গম জগতের চিন্তাশক্তি, কাল ও দেশের ব্যাপকতায় নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যায়নি। প্রাণের অস্তিত্বই হচ্ছে বিশ্ব জগতে চিন্তাশক্তির চরম জয়ের আশ্বাস, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নানা অংশে যে বিরাট অভিব্যক্তির ধারা উন্নত পদার্থ আর চিন্তাশক্তির প্রাধান্য ক্রমে সম্ভব করে তুলছে তার প্রতীক।

তারা-মানুষের চোখ থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে শাত্রভ আর দাভিদভ তার অবয়বের অন্যান্য অংশে মনোনিবেশ করলেন।

বড় বড় চোখওয়ালা গোল মাথাটায় চুল নেই, চামড়াটা পুরু আর মসৃণ। কিন্তু অদ্ভুত বা বিশ্রী নয়। তার বড় শক্তিশালী মাথাটায় বুদ্ধি আর মনুষ্যত্বের জোরাল প্রকাশ তার চোখদুটোর মতোই মুখের নিচের অংশের

অস্বাভাবিকতার ক্ষতিপূরণ করেছে। নাক কান ওষ্ঠ অধর কিছুই তার নেই। মুখটা পাখীর ঠোঁটের মতো অদ্ভুত। কিন্তু তবু সে যে মানুষের দূর আত্মীয়, শত্রু নয় বন্ধু, সেকথা বেশ অনুভব করা যায়।

আমাদের পৃথিবীর এই অতিথির মুখে অবর্ণনীয় এমন একটা কিছু রয়েছে যাতে ফুটে উঠেছে পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে তার আত্মা আর মনীষার নৈকট্য। শাত্রভ আর দাভিদভ দুজনেই অনুভব করলেন এমন একদিন নিশ্চয়ই আসবে যখন বিভিন্ন তারা-জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে গড়ে উঠবে বন্ধুত্ব। যে মহাশূন্যের ব্যবধান বিভিন্ন জগতকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে তাকে তারা জয় করবে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের গ্রহদ্বীপ কণিকায় ছড়িয়ে আছে যে মনীষা তার সম্মেলন সম্ভব হবে। শাত্রভ আর দাভিদভ প্রাণপণে বিশ্বাস করতে চাইলেন সেদিন আর বেশি দূরে নেই, কিন্তু তাঁদের মন বলতে লাগল আমাদের জগতের সীমানাগুলোকে দূরে দূরে ছড়িয়ে দিতে হলে এখনও প্রয়োজন বহুযুগব্যাপী সৃজনশীল চিন্তাশক্তির।

আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে আপন গ্রহের মানুষদেরই বিরাট পরিবারে এক করা। অসাম্য, উৎপীড়ন আর জাতিভেদ উড়িয়ে দিয়ে গ্রহগ্রহান্তরের ঐক্যের জন্য দৃঢ়চিত্তে কাজ করে চলা। তা না হলে তারা-রাজ্যের মধ্যে যে বিরাট দুস্তর বাধা রয়েছে তা পার হওয়ার ক্ষমতা মানুষ অর্জন করতে পারবে না। কোন প্রাণী গ্রহ ছেড়ে বেরনমাত্রই তাকে মৃত্যুর ভয় দেখায় মহাজগতের করাল শক্তি। এ শক্তিকে বশে আনতে হলে পৃথিবীর মানুষকে বিভেদ ভুলে এক হতে হবে। আমাদের প্রথম লক্ষ্য হল মানুষের ঐক্য, সে লক্ষ্যে আমাদের পৌঁছতেই হবে। দেহ মন নিবেদিত করতে হবে পৃথিবীর অধিবাসীদের বিরাট ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার কাজে।

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

বিদেশী ভাষায় সাহিত্য প্রকাশালয়
২১, জুবোভ্স্কি বুলভার,
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Foreign Languages Publishing House,
21, Zubovsky Boulevard,
Moscow, Soviet Union